কবি

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সত্য ও সুন্দরের উপাসক পরম শ্রদ্ধেয়
শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার

কবি

এক

দস্তুরমত একটা বিস্ময় !

নজীর অবশ্য আছে বটে,—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ; কিন্তু সেটা ভগবৎ-লীলার অঙ্গ। মূককে যিনি বাচালে পরিণত করেন, পঙ্গু যাঁহার ইচ্ছায় গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, সেই পরমানন্দ মাধবের ইচ্ছায় দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল ; কিন্তু কুখ্যাত অপরাধপ্রবণ ডোমবংশজাত সন্তানের অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশকে ভগবৎ-লীলা বলা যায় কি না, সে বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় নজীর নাই। বলিতে গেলে গা ছম-ছম করে। সুতরাং এটাকে লোকে একটা বিস্ময় বলিয়াই মানিয়া লইল।

গ্রামের ভদ্রজনেরা সত্যই বলিল—এ একটা বিস্ময় ! রীতিমত !

অশিক্ষিত হরিজনেরা বলিল—নেতাইচরণ তাক্ লাগিয়ে দিলে রে বাবা !

যে বংশে নিতাইচরণের জন্ম, সে বংশটি হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশ, তবে শহর অঞ্চলে ডোম বলিতে যে স্তরকে বুঝায়—ইহারা সে স্তরের নয়। এ ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল—প্রাচীন কাল হইতেই বাহুবলের জন্য ডোমেরা বিখ্যাত। ইহাদের উপাধি—বীরবংশী। নবাবী পল্টনেও নাকি বীরবংশীরা বীরত্বে বিখ্যাত ছিল। কোম্পানীর আমলে নবাবী আশ্রয়চ্যুত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধব্যবসায়ীর দল পরিণত হয় ডাকাতে। পুলিসের ইতিহাস ডোমবংশের কীর্ত্তিকলাপে পরিপূর্ণ। এই গ্রামের ডোম-পরিবারগুলির প্রত্যেকের রক্তে রক্তে এখনও সেই ধারা প্রবাহিত। পুলিস কঠিন বাঁধ দিয়াছে সে প্রবাহের মুখে—লোহা দিয়া বাঁধিয়াছে—হাতকড়ি, লোহার গরাদে দেওয়া ফটক, ডাণ্ডাবেড়ীর লোহা প্রত্যক্ষ ; এ ছাড়া ফৌজদারী দণ্ডবিধির আইনও লোহার আইন। কিন্তু তবু বাছিয়া বাছিয়া ছিদ্রপথে অথবা অন্তরদেশে ফল্গুধারার মত নিঃশব্দে অধীর গতিতে আজও সে ধারা বহিয়া

চলিয়াছে। নিতাইয়ের মামা গৌর বীরবংশী—অথবা গৌর ডোম এ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাত। বৎসরখানেক পূর্ব্বেই সে পাঁচ বৎসর 'কালাপানি' অর্থাৎ আন্দামানে থাকিয়া দণ্ড ভোগ করিয়া ফিরিয়াছে।

নিতাইয়ের মাতামহ—গৌরের বাপ শম্ভু বীরবংশী আন্দামানেই দেহ রাখিয়াছে।

নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর। পিতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে। নিজের জামাইকেই নাকি সে রাত্রের অন্ধকারে পথিক হিসাবে হত্যা করিয়াছিল। জামাইমারীর মাঠ এখান হইতে ক্রোশ খানেক দূর।

ইহাদের ঊর্দ্ধতন পুরুষের ইতিহাস পুলিস-রিপোর্টে আছে, ভীতিপ্রদ রক্তাক্ত ইতিহাস।

সেই বংশের ছেলে নিতাইচরণ। খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র—নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ; দীর্ঘ সবল কঠিনপেশী দেহ, রাত্রির অন্ধকারের মত কালো রঙ। কিন্তু বড় বড় চোখের দৃষ্টি তাহার বড় বিনীত এবং সে দৃষ্টির মধ্যে একটি সকরুণ বিনয় আছে। সেই নিতাই অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। লোকে সবিস্ময়ে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল,—নিতাই গৌরবের লজ্জায় অবনত হইয়া সকরুণ দৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

ঘটনাটা এই—

এই গ্রামের প্রাচীন নাম অট্টহাস—একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাদেবী চামুণ্ডা। মাঘী পূর্ণিমায় চামুণ্ডার পূজা বিশিষ্ট একটি পর্ব্ব; এই পর্ব্ব উপলক্ষ্যে এখানে মেলা বসে। এই মেলায় কবিগানের পাল্লা হইবার কথা। নোটনদাস ও মহাদেব পাল—দুইজনে এ অঞ্চলে খ্যাতনামা কবিয়াল, ইহাদের গান এখানে বাঁধা। অপরাহ্ণ বেলা হইতেই লোকজন জমিতে সুরু করিয়া সন্ধ্যানাগাদ বেশ একটি জনতায় পরিণত হইয়াছিল—প্রায় হাজার দেড় হাজার লোকের সমাবেশ।

সন্ধ্যায় সমারোহ করিয়া আসর পাতা হইল, চারিদিকে চারিটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালা হইল, কবিয়ালদের মধ্যে মহাদেবের দল আসিয়া আসরে বসিল, কিন্তু নোটনদাসের সন্ধান মিলিল না। যে লোকটি ডাকিতে গিয়াছিল, সে বলিল—বাসাতে কেউ কোথাও নাই মশায়—লোক না—জন না—জিনিস না—সব ভোঁ-ভোঁ করছে। কেবল শতরঞ্জিটা পড়ে রয়েছে—যেটা আমরা দিয়েছিলাম।

মেলার কর্তৃপক্ষ স্তম্ভিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল।

*   *   *

নোটনদাসের দোষ নাই। গতবার হইতেই তাহার টাকা পাওনা ছিল। গতবার মেলা-তহবিলে টাকার অনটন পড়িয়াছিল, সেইজন্য চামুণ্ডার মোহন্ত তাহাদের মাথায় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—আসছে বার, বাবা সকল, আসছে বার! গাওনার আগেই আসছে বার তোমাদের দু বছরের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

নোটন এবং মহাদেব বহুদিন হইতেই এ মেলায় গাওনা করে, এককালে এ মেলার সমৃদ্ধির সময় তাহারা পাইয়াছেও যথেষ্ট, সেই কৃতজ্ঞতা বা চক্ষুলজ্জাতেই গতবার তাহারা কিছু বলিতে পারে নাই। কিন্তু এবার আসিয়া নোটন যখন মোহন্তকে প্রণাম করিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি টাকার পরিবর্ত্তে তাহার হাতে দিলেন তাজা টকটকে একটি জবা ফুল, এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন—বেঁচে থাক বাবা, মঙ্গল হোক!

বলিয়াই তিনি প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। লোক-জন অনেকেই বসিয়া ছিল—অধিকাংশই গ্রামের ভদ্রলোক, তাঁহাদের সঙ্গেই প্রসঙ্গটা আগে হইতে চলিতেছিল। নোটন প্রসঙ্গটা শেষ হইবার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। মজলিসে আলোচনা হইতেছিল—মেলার এবং মা চামুণ্ডার স্থানের আয়ব্যয়ের বিষয়ের। মোহন্ত, আয় এবং ব্যয়ের হিসাব বিস্তারে বিবৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন যে, মা চামুণ্ডার হ্যাণ্ডনোট না কাটিলে আর উপায় নাই।

পরিশেষে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—এমন খাতক আর মিলবে না বাবা। কুবের খাজাঞ্চি। ধর্ম্মের কাগজে কামনার কালিতে হ্যাণ্ডনোট লিখে অর্থ দিলে—ওপারে মোক্ষসুদ সমেত পরমার্থ কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে পাবে। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাসিল। নোটনদাসও হাসিল। তারপরেই সে মজলিস হইতে সরিয়া পড়িল।

নোটনের বাসায় তখন নূতন একটা বায়নার প্রস্তাব লইয়া লোক আসিয়া বসিয়া আছে। এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে একটা মেলা বসিতেছে, সেখানে এবার প্রচুর সমারোহ, তাহারা নোটনদাসকে চায়। অন্তত এখানকার মেলা সারিয়াও যাইতে হইবে। যদি এখানে কোনরূপে শেষের একটা দিন স্থগিত করিয়া যাইতে পারে, তবে অবশ্য বড়ই ভাল হয়।

নোটন বলিল—হুঁ। তারপর সে তাহার দোহারকে বলিল—বোতলটা দে তো! বোতল না হইলে নোটনের চলে না। বোতলের মুখেই খানিকটা পানীয় পান করিয়া নোটন গা ঝাড়া দিয়া বসিল।

লোকটি নোটনের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, সে বলিল—তা হ'লে ওস্তাদ, আমাকে একটা কথা বলে দেন। আমাকে আবার এই ট্রেনেই ফিরতে হবে। ট্রেনের আর দেরি নাই।

নোটন হাসিয়া বলিল—আমি কাল থেকে গাওনা করব।

লোকটা বিনীত হইয়া বলিল—আজ্ঞে, তা হ'লে এখানে?

নোটন বলিল—নিজে শুতে পাচ্ছিস সেই ভাল, শঙ্করার ভাবনা ভাবতে হবে না তোকে।

লোকটা বলিল—আছে বেশ। তা কবে যাবেন আপনি?

—আজই, এখুনি, তোর সঙ্গে এই ট্রেনে।

লোকটা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

—দক্ষিণে কিন্তু পনেরো টাকা রাত্রি।

—আজ্ঞে, তাই দোব। লোকটার উৎসাহের আর সীমা ছিল না।

—কিন্তু আগাম দিতে হবে।

তৎক্ষণাৎ লোকটি একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল। বলিল —এই বায়না। আর সেখানকার মাটিতে পা দিলেই বাকী টাকা কড়াক্রান্তি হিসেব ক'রে মিটিয়ে দোব।

নোটখানা ট্যাঁকে গুঁজিয়া নোটন উঠিয়া পড়িল। ঢুলী ও দোহারদের বলিল—ওঠ! লোকটাকে বলিল—টাকা মিটিয়ে নিয়ে বাসায় ঢুকব কিন্তু। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্ধকারে—মাঠে মাঠে স্টেশনে আসিয়া মুখ ঢাকিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিল।

* * *

নোটন ভাগিয়াছে শুনিয়া অপর পাল্লাদার কবি মহাদেব আসরে বসিয়া মনে মনে আপসোস করিতেছিল। আজও পর্য্যন্ত নোটনের সহিত পাল্লায় কখনও সে পরাজয় স্বীকার করে নাই, কিন্তু আজ সে সর্ব্বান্তঃকরণে নীরবে পরাজয় স্বীকার করিল—সঙ্গে সঙ্গে নোটনকে বেইমান বলিয়া গালও দিল।

আসরের জনতা ক্রমশঃ ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিতেছিল, সংবাদটা তখনও তাহাদের কাছে অজ্ঞাত। অধীর শ্রোতার দল কলরবে একেবারে হাট বাধাইয়া তুলিযাছিল। পাশেই মেলার কর্ত্তৃপক্ষ এবং গ্রাম্য জমিদারগণ নোটন-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন। মোহন্ত চিন্তিত। নোটন ভাগিয়াছে, কবিগান হইবে না—এই কথাটি একবার উচ্চারিত হইলে হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই দর্শকদল—বাঁধভাঙা জলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। জলশূন্য পুষ্করিণীর ভিজা পাঁকের মত জনশূন্য মেলাটায় থাকিবে শুধু পায়ের দাগ আর ধুলা। ওদিকে কিন্তু গ্রাম্য জমিদারগণ একেবারে খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিযাছেন। এখনি পাইক লাঠিয়াল পাঠাইয়া গলায় গামছা বাঁধিয়া নোটনকে ধরিয়া আনিয়া জুতা মারিয়া পিঠের চামড়া তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতে ক্ষতিপূরণের মামলা করিয়া হতভাগ্যের ভিটামাটি উচ্ছন্ন দিবার

ব্যবস্থা পর্য্যন্ত—নানা উত্তেজিত কল্পনায় তৃণদাহী বহ্নির মতই তাঁহারা লেলিহান হইয়া উঠিয়াছেন। জমিদারদের অন্যতম, গঞ্জিকাসেবী ভূতনাথ—নামে ভূতনাথ হইলেও দক্ষযজ্ঞনাশী বিরূপাক্ষের মতই দুর্ম্মদ দুর্দ্দান্ত; সে মালকোঁচা সাঁটিয়া বলিল—দুটো লোক, দাঠো আদমী হামরা সাথ দেও, আমি এখুনি যাব। দশ কোশ রাস্তা। দশ কোশ তো দুলকীমে চলা যায়গা। বলিয়া সে যেন দুলকী চালে চলিবার জন্য দুলিতে আরম্ভ করিল।

ঠিক এই সময়েই কে একজন কথাটা জানিয়া ফেলিয়া আসরের প্রান্ত হইতে হাঁকিয়া বলিল—উঠে আয় রে রাখহরি, উঠে আয়।

—কেনে রে? উঠে গেলে আর জায়গা থাকবে না।

—জায়গা নিয়ে ধুয়ে খাবি? উঠে আয়—বাড়ী যাই—ভাত খাই গিয়ে। নোটনদাস ভেগেছে; কবি হবে না।

—না। মিছে কথা।

—মাইরি বলছি। সত্যি।

রাখহরি রসিক ব্যক্তি, সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—বল হরি—! সমগ্র জনতা নিম্নাভিমুখী আলোড়িত জলরাশির কল্লোলের মতই কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হইয়া ধ্বনি দিয়া উঠিল—হরি বো—ল! অর্থাৎ মেলাটির শবযাত্রা ঘোষণা করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তৃণ-দাহী বহ্নি যেন ঘরে লাগিয়া গেল। জমিদারবর্গ জনতার উপরেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

—কে? কে? কে রে বেটা?

—ধর তো বেটাকে, ধর তো। হারামজাদা বজ্জাত, ধর তো বেটাকে।

ভূতনাথ ব্যাঘ্রবিক্রমে ঘুরিয়া রাখহরির বদলে যে লোকটিই সম্মুখে পাইল, তাহারই চুলের মুঠায় ধরিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল—চোপ রও শালা।

অন্য কয়েকজনে তাহাকে ক্ষান্ত করিল—হাঁ-হাঁ-হাঁ! কর কি ভূতনাথ, ছাড়, ছাড়।

ভূতনাথ তাহাকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু বীরবিক্রমে শাসন করিয়া দিল—

খবর দা—র।

একজন বিবেচক ব্যক্তি বলিল—মেলা-খেলায় ও-রকম করে মানুষ! রঙ তামাসা নিয়েই তো মেলা হে। ভোলা ময়রা কবিয়াল—জাড়া গাঁয়ে কবি করতে গিয়ে জমিদারের মুখের সামনেই ব'লেছিল—"কি ক'রে তুই বললি জগা. জাড়া গোলোক বৃন্দাবন, যেখানে বামুন রাজা চাষী প্রজা—চারিদিকেতে বাঁশের বন। কোথায় তোর শ্যামকুণ্ড কোথায় বা তোর রাধাকুণ্ড—সামনে আছে মূলকুণ্ড করগে মূলো দরশন।" তাতে তো বাবুরা রাগ করে নাই. খুশীই হয়েছিল।

ভূতনাথ এত বোঝে না, সে বক্তাকে এক কথায় নাকচ করিয়া দিল—যা-যা-যাঃ। কিসে আর কিসে—ধানে আর তুষে!

—আরে, তুষ হ'লেও তো ধানের খোসা বটে। চটলে চলবে কেন? দু'তিন মাইল থেকে সব তামাক টিকে নিয়ে এসেছে কবিগান শুনতে। এখন শুনছে—'কবিয়াল ভাগলবা'; তা ঠাট্টা ক'রে একটু হরিধ্বনি দেবে না? রেগো না।

মোহন্ত এখন গাঁজা খাইয়া ভাম হইয়া বসিয়া থাকেন বটে. কিন্তু এককালে তিনি একজন পাকা পাটোয়ার অর্থাৎ জমিদার-সেরেস্তার নায়েব ছিলেন; তিনি এতক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া চিন্তাই করিতেছিলেন, তিনি এইবার বলিলেন —আচ্ছা, আচ্ছা কবিগানই হবে। চিন্তা কি তার জন্যে? চিন্তামণি যে পাগলী বেটীর দরবারে বাঁধা, তাঁর চিনির ভাবনা। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কবিগান চিনি কি না—সে প্রশ্ন তখন কাহারও মনে উঠিবার সময় নয়, সকলে উৎসুক হইয়া মোহন্তের মুখের দিকে চাহিল, মোহন্ত বলিলেন—ডাক মহাদেবকে আর তার প্রধান দোয়ারকে। তাই হোক—গুরু-শিষ্যেই যুদ্ধ হোক। রামরাবণের যুদ্ধের চেয়ে দ্রোণ-অর্জ্জুনের যুদ্ধ কিছু কম নয়। রামায়ণ সপ্তকাণ্ড, মহাভারত হ'ল অষ্টাদশ পর্ব্ব।

শোর-গোল উঠিল—মহাদেব! মহাদেব! ও হে কবিয়াল! ওস্তাদজী হে শোন শোন।

দুই

মহাদেব অগত্যা কথাটা স্বীকার করিল।

মোহন্ত সুদুর্লভ আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে কল্পতরুর তলায় বসাইয়া দিলেন, অতঃপর স্বীকার না করিয়া উপায় কি! কিন্তু আর একজন ঢুলী দোযারের প্রযোজন। ঠিক এই সমযেই নিতাইচরণের আবির্ভাব। সে জোড়হাতে পরম বিনয়সহকারে শুদ্ধ ভাষায নিবেদন করিল—প্রভু, অধীনের একটি নিবেদন আছে—আপনাদের সি-চরণে।

অন্য কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মহাদেব কবিওয়ালাই বলিযা উঠিল—এই যে, এই যে আমাদের নেতাইচরণ রযেছে; তবে আর ভাবনা কি? নেতাই বেশ পারবে দোয়ারকি করতে।

নিতাইয়ের গুণাগুণ কবিযালরা জানিত, কবিগান যেখানেই হউক, সে গিয়া ওই দোয়ারদের দলে মিশিয়া বসিয়া পড়িত, কখনও কাঁসি বাজাইত—আর দোয়ারের কাজ তো প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত।

বাবুদের মধ্যে একজন কলিকাতায় চাকরি করেন, ময়লা কাপড়-জামার গাদার মধ্যে তিনি ধোপদুরস্ত পাট করা বস্ত্রের মতই শোভমান ছিলেন—বেশ ভারিক্কী চাল; খুব উঁচু দরের পাযাভারী পৃষ্ঠপোষকের মত করুণামিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন—বল কি, অ্যাঁ? নেতাইচরণের আমাদের এত গুণ! A poet! বাহবা, বাহবা রে নিতাই! তা লেগে যা রে বেটা, লেগে যা। আর দেরি নয়—আরম্ভ ক'রে দাও তা হ'লে। তিনি হাতঘড়িটা দেখিবার চেষ্টা করিযা বলিলেন—এখনই তো তোমার—

—দেখ তো কটা বাজল? একজন ফস করিয়া দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়া ধরিল।

ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া হাত সরাইয়া লইয়া বলিলেন—আঃ! দরকার নেই আলোর। রেডিয়ম দেওয়া আছে, অন্ধকারে দেখা যাবে।

ভূতনাথ এতসব রেডিয়ম-ফেডিয়মের ধার ধারে না, সে হি-হি করিয়া হাসিয়া নিতাইকেই বলিল—লে রে বেটা, লে, তাই কাক কেটেই আজ অমাবস্যে হোক। কাক—কাকই সই!

নিতাই মনে মনে আহত হইলেও মুখে কিছু বলিল না। ওদিকে তখন আসরে ঢোলে কাঠি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, কুড়ুতাক কুড়ুতাক কুড়ুম-কুড়ুম।

নিতাই দোয়ারকি করিতে লাগিয়া গেল।

নিতাই দোয়ারের সহিত কবিওয়ালার পাল্লা, সুতরাং প্রতিযোগিতাটা হইতেছিল আপোসমূলক—অত্যন্ত ঠাট্টা রকমের। তীব্রতা অথবা উষ্ণতা মোটেই সঞ্চারিত হইতেছিল না। শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল দুই ধরণের; যাহারা উহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহারা বলিল—দূর দূর! এই শোনে! সাঁট ক'রে পাল্লা হচ্ছে! চল বাড়ী যাই। দুই-চার জন আবার উঠিয়াও গেল।

অপর দল বলিল—মহাদেবের দোয়ারও বেশ ভাল কবিয়াল মাইরি! বেশ কবিয়াল, ভাল কবিয়াল! টকাটক জবাব দিচ্ছে।

নিতাইচরণের প্রশংসাও হইতেছিল। নিতাইচরণের গলাখানি বড় ভাল। তাহার উপর ফোড়নও দিতেছে চমৎকার। সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে—নিজে স্বাধীনভাবে দুই-চার কলি গাহিবার জন্য।

বাবুরা তাহাকে উৎসাহিত করিলেন—বলিহারি বেটা, বলিহারি!

নিতাইয়ের স্বজন ও বন্ধুজনে বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা!

এক কোণে মেয়েদের জটলা—তাহাদেরও বিস্ময়ের সীমা নাই, নিতাইয়ের পরম বন্ধু স্টেশনের পয়েন্টস্‌ম্যান রাজালাল বায়েনের বউ হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া

পড়িতেছে—ও মা গো! নেতাইয়ের প্যাটে প্যাটে এত! ও মা গো!

তাহার পাশেই বসিয়া রাজার বউয়ের বোন, ষোল-সতের বছরের মেয়েটি, পাশের গ্রামের বউ—সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছে, সে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেছে—না ভাই, খালি হাসছিস তু! শোন কেনে।

রাজা বন্ধুগৌরবে অদূরে বসিয়া ক্রমাগত দুলিতেছিল, সে হাসিয়া বলিল—দেখতা হ্যায় ঠাকুরঝি? ওস্তাদ কেয়সা গাহানা করতা হ্যায়, দেখতা?

রাজা এই শ্যালিকাটিকে বলে—ঠাকুরঝি! নিতাইও তাহাকে বলে—ঠাকুরঝি। শ্বশুর-বাড়ী অর্থাৎ পাশের গ্রাম হইতে সে নিত্য দুধ বেচিতে আসে। নিতাই নিজেও এক পোয়া করিয়া দুধের 'রোজ' লইয়া থাকে। এই কারণেই মেয়েটির বিস্ময় এত বেশী; যে লোককে মানুষ চেনে, তাহার মধ্য হইতে অকস্মাৎ এক অপরিচিত জনকে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিলে বিস্ময়ে মানুষ এমনই হতবাক হইয়া যায়।

নিতাইয়ের কিন্তু তখন এদিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর ছিল না; সে তখন প্রচণ্ড উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে, উৎসাহের প্রাবল্যে সে উটের মত নাসিকা-প্রবেশের পথে মাথা গলাইয়া দিল—নিজেই সে স্বাধীনভাবে গান আরম্ভ করিল। আ—করিয়া রাগিণী টানিয়া মহাদেবের দোয়ারের রচিত ধুয়াটাকে পর্য্যন্ত পাল্টাইয়া—সেই সুরে ছন্দে নিজেই নূতন ধুয়া ধরিয়া দিল।

মহাদেবের দোয়ার, সে-ই প্রকৃত একপক্ষের পাল্লাদার ওস্তাদ—সে আপত্তি তুলিয়া বলিয়া উঠিল—অ্যাই! ও কি? ও কি গাইছ তুমি? অ্যাই—নেতাই।

নিতাই সে কথা গ্রাহ্যই করিল না। বাঁ হাতখানিতে কান ঢাকিয়া ডান হাতখানি থুথু নিবারণের জন্য মুখের সম্মুখে ধরিয়া গান গাহিয়া চলিল। সম্মুখের দিকে অল্প একটু ঝুঁকিয়া তালে তালে মৃদু নাচিতে নাচিতে সে গাহিল—

হুজুর—ভদ্র পঞ্চজন রয়েছেন যখন
সুবিচার হবে নিশ্চয় তখন—
জানি-জানি-জানি—

বাবুরা খুব বাহবা দিলেন—বহুৎ আচ্ছা! বাহবা! বাহবা!

সাধারণ শ্রোতারা বলিল—ভাল। ভাল।

নিতাই ধাঁ করিয়া লাফ মারিয়া ঘুরিয়া ঢুলীটাকে ধমক দিল—অ্যা-ই কাটছে! সঙ্গে সঙ্গে সে তাল দেখাইয়া হাতে তালি দিয়া বাজনার বোল বলিতে আরম্ভ করিল—ধিকড় তা-তা-ধেন্‌তা,—তা-তা-ধেন্‌তা—গুড়-গুড় তা-তা-থিয়া—ধিকড :—হাঁ—! বলিয়া সে স্বরচিত ধুয়াটা গাহিল—

ক-যে কালী কপালিনী—খ-যে খপ্পরধারিণী,
গ-যে গোমাতা সুরভি--গণেশজননী—
কণ্ঠে দাও মা বাণী।

একপাশে কতকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিত ছোবরা বসিয়া ছিল—তাহারা হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল—গ-যে গরু, ছ-যে ছাগল, ভ-যে ভেড়া। বহুৎ আচ্ছা! হাস্যধ্বনির রোল উঠিয়া গেল।

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, তারপর হাস্যধ্বনি অল্প শান্ত হইতেই বলিল— বলি দোযারগণ।

মহাদেবের দোযার রাগ করিয়া বসিয়া ছিল, অপর কোন দোয়ারও ছিল না। কেহ সাড়াই দিল না। নিতাই এবারে উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই বলিল—দোয়ারগণ। গোমাতা শুনে সবাই হাসছে! বলছে গ-যে গরু, ছ-যে ছাগল, ভ-যে ভেড়া!

ঢুলীটা এবার বলিল—হ্যাঁ!

আচ্ছা।—বলিয়া সে ছড়ার সুরে আরম্ভ করিল—

গো-মাতা শুনিয়া সবে হাস্য করে।
দীন নিতাইচরণ বলছে জোড়করে—

বলিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া একবার চারিদিক ঘুরিয়া লইল। বন্ধু রাজা পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল—বহুৎ আচ্ছা ওস্তাদ।

কিন্তু নিতাই তখন চোখে স্পষ্ট করিয়া কি দেখিতেছিল না, রাজাকে সে

লক্ষ্য করিল না, সে ছড়াতেই বলিয়া গেল—অসমান মাত্রায় রচিত গ্রাম্য কবিয়ালের ছড়া—

শুনুন মহাশয় দীনের নিবেদন।
গো কিম্বা গরু তুচ্ছ নয় কখন॥
গাভী ভগবতী, ষাঁড় শিবের বাহন।
সুরভির শাপে মজে কত রাজন॥

রব উঠিল—ভাল! ভাল! ঢুলীটা ঢোলে কাঠি দিল—ডুডুম!

নিতাই বলিল—

শাস্ত্রের সার কথা আরও বলে যাই।
গো-ধন তুল্য ধন ভূ-ভারতে নাই॥
তেঁই গোলোকপতি—বিষ্ণু বনমালী।
ব্রজধামে করলেন গরুর রাখালী॥

নিতাইয়ের এই উপস্থিত জবাবে সকলে অবাক হইয়া গেল। ছন্দে বাঁধিয়া এমন ত্বরিত এবং যুক্তিসম্পন্ন জবাব দেওয়া তো সহজ কথা নয়। বন্ধু রাজা পর্য্যন্ত হতবাক; রাজার বউয়ের হাসি থামিয়া গিয়াছে; ঠাকুরঝির অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে—দেহের বেশবাসও অসম্বৃত।

নিতাইয়ের তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিল—

তা ছাড়া মশাই—আছে আরও মানে—
গো মানে পৃথিবী শুধান পণ্ডিত জনে॥

এবার বাবুরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া উঠিলেন। আসরের লোক হরিধ্বনি দিয়া উঠিল।

নিতাই বিজয়গর্ব্বে ঢুলীটাকে বলিল—বাজাও।

এতক্ষণে সকলে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, রাজা একবার ফিরিয়া স্ত্রী ও ঠাকুরঝির দিকে চাহিয়া হাসিল—অর্থাৎ, দেখ! স্ত্রী বিস্ময়ে মুগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল—তা বটে বাপু।

ঠাকুরঝির কিন্তু তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই। সে বিপুল বিস্ময়ে শিথিলচৈতন্যের মত নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া ছিল। রাজা তাহার অসম্বৃতবাস বিস্মিত ভঙ্গি দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল, রূঢ়স্বরে বলিল—অ্যাই! ও ঠাকুরঝি! মাথায় কাপড় দে।

রাজার স্ত্রী একটা ঠেলা দিয়া বলিল—মরণ, সাড় নাই মেয়ের।

ঠাকুরঝি এবার জিভ কাটিয়া কাপড় টানিয়া মাথায় দিয়া বলিল—আচ্ছা গাইছে বাপ্‌ ওস্তাদ।

ওদিকের বাবুদের মহলে সকলের বিস্ময়ের সীমা ছিল না, কলিকাতা-প্রবাসী চাকুরে বাবুটি পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন—রীতিমত একটা বিস্ময়! Son of a Dom—অ্যাঁ—He is a poet!

দুর্দ্দান্ত ভূতনাথ ক্রুদ্ধ হইলে রুদ্র, তুষ্ট হইলে আশুতোষ—মানসিক অবস্থার এই দুই দূরতম প্রান্তে অতি সহজেই সে গঞ্জিকাপ্রসাদে ব্যোমমার্গে নিমেষমধ্যেই যাওয়া-আসা করিয়া থাকে, সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল রে বাবা! রত্ন রে—একটা রত্ন—মানিকের বেটা মানিক!

মোহন্ত হাসিয়া বলিলেন—আমার পাগলী বেটীর খেয়াল বাবা; নিতাইকে বড় করতে মা আমার নোটনকে তাড়িয়েছেন।

ইহার পরই আরম্ভ হইল মহাদেবের পালা। মহাদেব পাকা প্রাচীন কবিয়াল। ব্যাপারটা দেখিয়া শুনিয়া সে ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করিয়া গান ধরিল—ব্যঙ্গে, গালি-গালাজে নিতাইকে শূলবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, রসপূর্ণ গালি-গালাজে সমস্ত আসরটা হাস্যরোলে মুখর হইয়া উঠিল। নিতাইও আসরে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইল রাজা। সে মিলিটারী মেজাজের লোক, গালি-গালাজগুলা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে আসর হইতে উঠিয়া খানিকটা মেলার মধ্যে ঘুরিবার জন্য চলিয়া গেল। রাজার স্ত্রী কিন্তু প্রচুর হাসিতেছিল। ঠাকুরঝি মেয়েটিও কিন্তু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে, সেও

এবার বিরক্তিভরে বলিল—হাসিস না দিদি। এমনি ক’রে গাল দেয় মানুষকে!

মহাদেব ছড়া বলিতেছিল—

সুবুদ্ধি ডোমের পোযের কুবুদ্ধি ধরিল।
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইল॥
ও-বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, কর্ত্তা-বাবা ঠ্যাঙাড়ে।
মাতামহ ডাকাত বেটার—দ্বীপান্তরে মরে॥
সেই বংশের ছেলে বেটা কবি করবি তুই।
ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর, চিংড়ির পোনা রুই॥

একজন ফোড়ন দিল—

অল্পজলই ভাল চিংড়ির—বেশী জলে যাস না।

দোয়ারেরা পরমোৎসাহে মহাদেবের নূতন ধুয়াটা গাহিল—

আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বর্গে যাবার আশা—গো!
ফরাৎ ক’রে উড়ল পাতা—স্বর্গে যাবার আশা গো!
হায়রে কলি—কিই বা বলি—
গরুড় হবেন মশা গো—স্বর্গে যাবার আশা গো॥

অকস্মাৎ মহাদেব বলিয়া উঠিল—আঃ, জ্বালাতন রে বাপ্! বলিয়াই সে আপনার পায়ে একটা চড় মারিয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই গাহিল—

পায়েতে কামড়ায় মশা—মারিলাম চাপড়।
গোলকেতে বিষ্ণু কাঁদেন—চড়িবেন কার উপর!

মহাদেবের দোয়ার—যাহাকে নাকচ করিয়া নিতাই কবিয়াল হইয়াছে—সে-ই এবার ফোড়ন দিয়া উঠিল—চটাৎ চড়ের সয় না ভর, স্বর্গে যাবার আশা গো।

ইহার পর রাত্রি যত অগ্রসর হইল, মহাদেবের তাণ্ডব ততই বাড়িয়া গেল। শ্লীল-অশ্লীল গালিগালাজে নিতাইকে সে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। মহাদেবের এই শূল-প্রতিরোধের ক্ষমতা নিতাইয়ের ছিল না। কিন্তু তাহার বাহাদুরি এই

যে জর্জ্জব ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সে ধরাশায়ী হইল না। খাড়া থাকিয়া হাসিমুখেই সব সহ্য করিল। সে গালিগালাজের উত্তরে একটা ছড়া কাটিয়া বলিল—

ওস্তাদ তুমি বাপের সমান তোমাকে করি মান্য।
তুমি আমাকে দিচ্ছ গাল, ধন্য হে তুমি ধন্য॥
তোমার হয়েছে ভীমরতি—আমার কিন্তু আছে ভক্তি তোমার চরণে।
ডঙ্কা মেরেই জবাব দিব—কোনই ভয় করি না মনে॥

লোকের কিন্তু তখন এ বিনীত মিষ্ট রস উপভোগ করিবার মত অবস্থা নয়, মহাদেব গালিগালাজের মত্তরসে আসরকে মাতাল করিয়া দিয়া গিয়াছে, এবং মহাদেবের তুলনায় নিতাই সত্যই নিষ্প্রভ। সুতরাং তাহার হার হইল। তাহাতে কিন্তু নিতাইয়ের কোন গ্লানি ছিল না। বরং সে অকস্মাৎ নিজেকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াই অনুভব করিল।

পাল্লার শেষে সে বাবুদের প্রণাম করিয়া করজোড়ে সবিনয়ে বলিল—হুজুরগণ, অধীন মুখ্যু ছোট নোক—

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বাবুরা বলিলেন—না না। খুব ভাল, ভাল গেয়েছিস তুই। বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা!

প্রচণ্ড উৎসাহে তাহার পিঠে কয়েকটা সাংঘাতিক চপেটাঘাত করিয়া ভূতনাথ বলিল,—জিতা রহো, জিতা রহো রে বেটা।

ঠাকুরে বাবু করুণামিশ্রিত প্রশংসার হাসি হাসিয়া বলিলেন—ইউ আর এ পোয়েট, অ্যাঁ!

কথাটার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নিতাই বিনীত সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল—আজ্ঞে?

বাবু বলিলেন—তুই তো একজন কবি রে।

নিতাই লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সে মহাদেবকে বলিল—মার্জ্জনা করবেন ওস্তাদ। আমি অধম। বলতে গেলে আমি মশকই বটে।

মহাদেব অবশ্য এ কথায় লজ্জিত হইল না, সে বরং নিতাইয়ের বিনয়ে খুশী হইয়াই বলিল—আমার দলে তুমি দোয়ারকি কর। তারপর নিজেই দল বাঁধতে পারবে।

নিতাই মনে মনে একটু রূঢ় অথচ রসিকতাসম্মত জবাব খুঁজিতেছিল; মহাদেবের গালিগালাজের মধ্যে জাতি তুলিয়া এবং বাপ-পিতামহ তুলিয়া গালিগালাজগুলি তাহার বুকে কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল। কিন্তু কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পিছন হইতে দশ-বিশজন ডাকিল—নেতাইচরণ, নেতাইচরণ! ওহে!

ডাক শুনিয়া নিতাইচরণ পুলকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, আজই সে—'নিতে' 'নেতা' 'নিতো' 'নেতাই' হইতে নিতাইচরণ হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা ডাকিতেছিল, তাহারা অদূরবর্ত্তী বাবুদের দেখাইয়া বলিল—বাবুরা ডাকছেন। মোহন্ত ডাকছেন।

মোহন্তজী চণ্ডীর প্রসাদী একগাছি সিন্দুরলিপ্ত বেলপাতার মালা তাহার মাথায় আলগোছে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—বাঃ বাঃ, খুব ভাল। মা তোমার উন্নতি করবেন। মায়ের মেলায় একরাত্রি গাওনা তোমার বাঁধা বরাদ্দ রইল।

চাকুরে বাবু নিতাইয়ের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—একটা মেডেল তোকে দেওয়া হবে! তারপর হাসিয়া আবার বলিলেন—You are a poet। অ্যাঁ! এ একটা বিস্ময়!

নিতাই দিশাহারা হইয়া গেল। কি করিবে, কি বলিবে, কিছুই ঠাওর করিতে পারিল না। বাবু বলিলেন—কিন্তু খবরদার, আপন গুষ্টির মত চুরি-ডাকাতি করবি না। তুই বেটা কবি—a poet!

হাতজোড় করিয়া এবার নিতাই বলিল—আজ্ঞে প্রভু! চুরি জীবনে আমি করি নাই। মিছে কথাও আমি বলি না হুজুর, নেশা পর্য্যন্ত আমি করি না। জাত-জ্ঞাত-মা-ভাইয়ের সঙ্গেও এইজন্যে বনে না আমার; আমি ঘর তো ঘর, পাড়া পর্য্যন্ত ত্যাজ্য করেছি। আমি থাকি ইষ্টিশানে রাজন পয়েণ্টম্যানের কাছে। কুলিগিরি ক'রে খাই।

এ গ্রামের সমস্ত কিছুই ভূতনাথের নখদর্পণে, সে নিতাইকে সমর্থন করিয়া বলিল—তা বটে বাপু! সাচ্চা সাধু আদমী নিতাই।

নিতাই আবার বলিল—এই মা-চণ্ডীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছি। মিছে বলি তো বজ্রাঘাত হবে আমার মাথায়।

তিন

নিতাই মিথ্যা শপথ করে নাই। নিতাই জীবনে কখনও চুরি করে নাই। তাহার আত্মীয়স্বজন, গভীর রাত্রে নিঃশব্দপদসঞ্চারে নির্ভয় বিচরণের মধ্যে যে উদ্বেগময় উল্লাস অনুভব করে, সে উল্লাসের আস্বাদ সত্যই নিতাইয়ের রক্তকণিকাগুলির কাছে অজ্ঞাত। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের সম্মুখীন থ্রেসিয়ান দস্যুর মত ন্যায়ের তর্কও বীরবংশীরা জানে না বটে, কিন্তু নীতি ও ধর্ম্মের কথা শুনিয়া তাহারা হাসে। নিতাইয়ের এই চৌর্য্যবৃত্তি-বিমুখতার জন্য তাহারা তাকে ঘৃণা করে।

কেমন করিয়া এমন হইল, সে ইতিহাস অজ্ঞাত। তাচ্ছিল্যভরে কেহ লক্ষ্য করে নাই বলিয়াই অলক্ষ্যে হারাইয়া গিয়াছে। তবে একটি ঘটনা লোকের চোখে পড়িয়াছিল। স্থানীয় জমিদারের মায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নৈশ-বিদ্যালয়ে নিতাই পড়াশুনা করিয়াছিল। ডোমপাড়ার অনেকগুলি ছেলেই পড়িত। ছাত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্যে জমিদার একখানা করিয়া কাপড় দিবার ঘোষণার ফলেই বীরবংশীর দল ছেলেদের পাঠশালায় আনিয়া ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও আসিয়াছিল। বৎসরের শেষে কাপড় লইয়া দ্বিতীয় ভাগের চোর বেণীর গল্প পড়িবার পূর্ব্বেই ডোমেদের ছেলেগুলি পাঠশালা হইতে সরিয়া পড়িল, কেবল নিতাই-ই থাকিয়া গেল। নিতাই পরীক্ষায় ফার্স্ট হইয়াছিল বলিয়া কাপড়ের সঙ্গে একটা জামা ও একখানা গামছা পাইয়াছিল। ছেলে

কাপড়, গামছা, জামা তিন দফা পাওয়াতে নিতাইয়ের মা আপত্তি তো করেই নাই বরং খানিকটা গৌরবই অনুভব করিয়াছিল। বংশধারা-বিরোধী একটি অভিনব গৌরবের আস্বাদও বোধ করি নিতাই পাইয়াছিল। ইহার পর আরও বৎসর দুয়েক নিতাই পাঠশালায় পড়িয়াছিল। এই দুই বৎসরে পুরস্কার হিসাবে কাপড়, জামা, গামছা ছাড়াও নিতাই পাইয়াছিল খান কয়েক বই—শিশুবোধ রামায়ণ, মহাভারতের কথা, জানোয়ারের গল্প। সেগুলি নিতাইয়ের কণ্ঠস্থ। নিতাই আরও পড়িত, কিন্তু একমাত্র নিতাই ছাড়া পাঠশালায় আর দ্বিতীয় ছাত্র না থাকায় পাঠশালা উঠিয়া গেল; অগত্যা নিতাই পাঠশালা ছাড়িতে বাধ্য হইল। ততদিনে সে কবিগানের মস্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার অশিক্ষিত সম্প্রদায় কবিগানের ভক্ত। কিন্তু সে প্রীতি তাহাদের অশ্লীল রসিকতার প্রতি আসক্তি। নিতাইয়ের আসক্তি অন্যরূপ। পুরাণ-কাহিনী, আর কবিতা তাহার ভাল লাগে।

মামাতো মাসতুতো ভাইয়েরা নিতাইকে ব্যঙ্গ করিয়া এতদিন বলিত—পণ্ডিত মাশায়! এইবার তাহারা তাহাকে দলে লইয়া দীক্ষা দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

মামা গৌরচরণ সদ্য পাঁচ বৎসর জেল খাটিয়া ঘরে ফিরিয়াছে, সে বোনকে ডাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—নিতাইকে এবার বেরুতে বল। লেকাপড়া তো হ'ল।

গৌরচরণের গম্ভীর ভাবের কথার অর্থ—তাহার আদেশ। নিতাইয়ের মা আসিয়া ছেলেকে বলিল—তোর মামা বলছে, এইবার দলের সঙ্গে যেতে হবে তোকে।

নিতাই মায়ের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—ছি! ছি! ছি! গর্ভধারিণী জননী হয়ে এই কথা তু বলছিস আমাকে!

নিতাইয়ের মা হতভম্ব হইয়া গেল।

নিতাইয়ের মামা চোখ লাল করিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—কি

বলেছিস মাকে? হচ্ছে কি?

নিতাই তখন পুরানো খাতাটায় রামায়ণ দেখিয়া হাতের লেখা অভ্যাস করিতেছিল। সে নির্ভয়ে বলিল—লিখছি।

—লিকছিস? গৌর আসিয়া খাতাটা ও বইখানা টান মারিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। নিতাইও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে মামাকে অতিক্রম করিয়া সে খাতা ও বই কুড়াইয়া লইয়া নিজেদের পাড়া পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। গ্রাম খুঁজিয়া সেইদিনই সে ঘনশ্যাম গোসাঁইয়ের বাড়ীতে মাহিন্দারী চাকুরিতে বাহাল হইল।

গোসাঁইজী বৈষ্ণব মানুষ, ঘরে সন্তানহীনা স্থূলকায়া গৃহিণী, উভয়েরই দুগ্ধপ্রীতি মার্জ্জারের মত। ঘরে দুইটি গাই আছে, গাই দুইটি এতদিন রাত্রে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া প্রভাতে ঘরে আসিয়া দুধ দিত। কিন্তু ইদানীং কলিকাল অকস্মাৎ যেন পরিপূর্ণ কলিত্ব লাভ করিয়াছে, গ্রামের লোকের গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহার গাভী দুইটিকে গত দুই মাসে পনেরো বার লোকে খোঁয়াড়ে দিয়াছে। সেই কারণে বাধ্য হইয়া গোসাঁইজী গাভীপরিচর্য্যার জন্য লোক বাহাল করিলেন। নিতাইয়ের সহিত সর্ত্ত হইল, সে গাভীর পরিচর্য্যা করিবে, বাসন মাজিবে, প্রয়োজনমত খানে ওখানে যাইবে, রাত্রে বাড়ীতে প্রহরা দিবে। গোসাঁইজীর সুদী কারবারে মূল এক শত মণ ধান এখন সাত শত মণে পরিণত হইয়াছে। ঘরের উঠানেও একটি ধানের স্তূপ। গোসাঁইজী স্ফীতোদর মরাই ও নিজের বিশীর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া নিয়তই চিন্তায় পীড়িত হইতেছিলেন। বলিষ্ঠ যুবক নিতাইকে পাইয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। নিতাই গোসাঁইজীর বাড়ীতেই বসবাস আরম্ভ করিল।

দিন কয়েক পরেই, সেদিন ছিল ঘন অন্ধকার রাত্রি। গভীর রাত্রে গোসাঁই ডাকিলেন—নিতাই!

বাহিরে খুটখাট শব্দে নিতাইয়ের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, সে জাগিয়াই ছিল, সে ফিসফিস করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমি শুনেছি।

—গোলমাল করিস না, উঠে আয়। গোসাঁইজী অগ্রসর হইলেন। নিতাই শীর্ণকায় গোসাঁইজীর অকুতোভয়তা দেখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিল। গোসাঁই আসিয়া নিঃশব্দে বাহিরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইলেন। বাহিরে চারজন লোক, তাহাদের মাথায় বোঝাইকরা চারিটা বস্তা। ভারে উত্তেজনায় লোকগুলি হাঁপাইতেছে এবং থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দরজা খুলিতেই নিঃশব্দে লোক চারিজন ঘরে ঢুকিয়া উঠানের ধানের গাদায় বস্তা চারিটা ঢালিয়া দিল। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেও নিতাই ধানের সোনার মত রং প্রত্যক্ষ করিল। লোকগুলি-কেও সে চিনিল, প্রত্যেকেই খ্যাতনামা ধানচোর।

সকালবেলাতেই জোড়হাত করিয়া গোসাঁইজীকে বলিল—প্রভু, আমি মাশায় কাজ করতে পারব না!

—পারবি না!

—আজ্ঞে না।

—এক পয়সা মাইনে আমি দেব না কিন্তু।

নিতাই কথার উত্তর করিল না। তাহার কাপড় ও দপ্তর লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। আসিয়া উঠিল গ্রামের স্টেশনে।

স্টেশনের পয়েণ্টস্‌ম্যান রাজা মুচি তাহার বন্ধু। রাজালাল একটু অদ্ভুত ধরণের লোক। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তাহার ছিল তরুণ বয়স, সে ঘটনাচক্রে কুলি হিসাবে গিয়া পড়িয়াছিল মেসোপটেমিয়ায়। ফিরিয়া আসিয়া কাজ করিতেছে এই লাইট রেলওয়েতে। প্রাণখোলা দিলদরিয়া লোক, অনর্গল ভুল হিন্দী বলে, ঘড়ির কাঁটার মত ডিউটি করে, বার ছয়-সাত চা খায়, প্রচুর মদ খায়, ভীষণ চীৎকার করে, স্ত্রীপুত্রকে ধরিয়া ঠেঙায়। বিবাহ তাহার অনেক। এখানে আসিয়াই নূতন বিবাহ করিয়াছে। রাজার সঙ্গে নিতাইয়ের আলাপ অনেক দিনের, অর্থাৎ রাজার এখানে আসিবার পর হইতেই আলাপ সে প্রায় তিন বৎসরের ঘটনা।

নিতাই সেদিনও স্টেশনে বেড়াইতে আসিয়াছিল, রাজার ছেলেটা ট্রেন আসিবার ঘণ্টা হইতেই হাঁকিতেছিল—হট যাও! হট যাও! লাইনের ধারসে হট যাও!

নিতাইয়ের ভারি ভাল লাগিয়াছিল, সে প্রশ্ন করিয়াছিল—বাহা রে! কাদের ছেলে হে তুমি?

—আমি রাজার ছেলে।

—রাজার ছেলে? কেয়াবাৎ! তবে তো তুমি 'যোবরাজ'!

রাজা ছিল কাছেই, সে নিতাইয়ের কথা শুনিয়া হাসিয়াই সারা। সঙ্গে সঙ্গে সে নিতাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিল। ট্রেন চলিয়া যাইতেই রাজা নিতাইকে ধরিয়া লইয়া একেবারে তাহার কোয়াটারে হাজির করিয়াছিল। স্ত্রীকে বলিল—আমার বন্ধুনোক! উমদা আদমী! ফটকেটাকে বলে—রাজার বেটা যোবরাজ। বলিয়া সে কি তাহার হা-হা করিয়া হাসি।

নিতাই উৎসাহভরে কবিয়ালদের নকল করিয়া গালে হাত দিয়া, মুখের সম্মুখে অপর হাতটি রাখিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া রামায়ণ স্মরণ করিয়া গান ধরিয়াছিল—

রাজার বেটা যোবরাজা, তেজার বেটা মহা তেজা
খায় সে খাস্তা খাজা গজা
বিদিত ভো-মণ্ডলে!

রাজা লাফ দিয়া ঘরের ভিতর হইতে তার পৈতৃক ঢোল ও তাহার নিজের কাঁসি বাহির করিয়া আনিয়া নিজে লইয়াছিল ঢোলটা—ছেলেটার হাতে দিয়াছিল কাঁসিটা। ওই কাঁসিটা রাজার বাবা রাজাকে কিনিয়া দিয়াছিল মহেশপুরের মেলায়। সেদিন দ্বিপ্রহরেই কবিগান জমিয়া উঠিয়াছিল রাজার ঘরে। নিতাই রাজার ছেলেকে 'যোবরাজ' বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, রাজার পরিবারের দিকে ফিরিয়া গাহিয়াছিল—

রাজার ঘরের ঘরণী যিনি—তিনি মহামান্যা রাণী—
তিনি খান বড় বড় ফেণী—
সর্বলোকে বলে।

ঠিক এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল আর একজন। পনের-ষোল বছরের একটি কিশোরী মেয়ে। মেয়েটির রং কালো, কিন্তু দীঘল দেহভঙ্গিতে ভুঁইচাপার বুজ সরল ডাঁটার মত একটি অপরূপ শ্রী। মেয়েটির মাথায় কাপড়ের বিড়ার উপর তকতকে মাজা একটি বড় ঘটী, হাতে একটি ছোট গেলাস; পরনে দেশী তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড়। মোটা সুতার খাটো কাপডখানির আঁটোসাঁটো বেষ্টনীর মধ্যে তাহার ছিপছিপে দীঘল কালো দেহখানি মানায় বড় চমৎকার। মেয়েটি রাজার শ্যালিকা, পাশের গ্রামের বধূ। সে এই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামখানিতে প্রত্যহ দুধের যোগান দিতে আসে, রাজার স্টেশনে গাড়ী আসে ঘড়ির কাঁটা ধরিযা, আর এই মেয়েটি আসে—পশ্চিমসমীপবর্তী দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের অগ্রগামিনী ছাযার মত। মেয়েটি সরল ভীরু দৃষ্টিতে বিস্মষ যেন কালো জলের স্বচ্ছতার মত সহজাত। সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া অকস্মাৎ মেয়েটি হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল—অসঙ্কোচ খিলখিল হাসি।

রাজার স্ত্রী কিন্তু কঠিন মেয়ে, সে বোনকে ধমক দিযাছিল—হাসিস না ফ্যাক ফ্যাক ক'রে। বেহাযা কোথাকার!

মুহূর্তে মেয়েটির হাসি বন্ধ হইযা গিযাছিল। কিন্তু সে রাগ করে নাই বা দুঃখিত হয় নাই, স্বচ্ছন্দে শাসন মানিযা লওযার মত বেত্রলতাসুলভ একটি নমনীযতা তাহার স্বভাবজাত গুণ। দেহখানিই শুধু লতার মত নয, মনও যেন তাহার দীঘল দেহের অনুরূপ।

নিতাইও থামিয়া গিয়াছিল। ধরতার সময পার হইযা গেল, তবু নিতাই আর গান ধরিল না দেখিয়া রাজা বাজনা বন্ধ করিল। সে মেয়েটিকে বলিল—দেখতা কেয়া ঠাকুরঝি? হামারা মিতা। ওস্তাদ আদমী। হামারা নাম হ্যায় রাজা তো—ফটকেকো নাম দিযা যোবরাজা, তোমরা দিদিকো নাম দিয়া

রাণী।—বলিয়াই অট্টহাসি।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঝিরও আবার আরম্ভ হইযা গিয়াছিল সেই হাসি। হাসিতে হাসিতে মাথার অবগুণ্ঠন খসিয়া গিযাছিল, চোখ দিয়া টপটপ ঝরিযা জল ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তবু তাহার সে হাসি থামে নাই।

হাসি থামাইয়া রাজা বলিযাছিল—ওস্তাদ! ই কালকুট হামারা ঠাকুরঝি হ্যায়। ইস্‌কো কেযা নাম দেগা ভাই?

নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিতেছিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে কচিপাতার মত যে একটি কোমল ঘনশ্যাম শ্রী আছে, তাহা দেখিয়া তাহাকে লইয়া রহস্য করিতে নিতাইয়ের প্রবৃত্তি হয় নাই। সে বলিয়াছিল—ঠাকুরঝি ভাই ঠাকুরঝি, ওর আর কোন... নাম হয় না। আমার ঠাকুরঝিও ঠাকুরঝি, রাজার ঠাকুরঝিও ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝি আমাদের সবারই ঠাকুরঝি। কেমন ভাই ঠাকুরঝি!

রাজা নিতাইযের তর্ক যুক্তিতে অবাক হইযা গিয়াছিল। গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া সে স্বীকার করিযাছিল—হাঁ, হাঁ, ঠিক, ঠিক।

তাহার পর রাজা পাড়িয়াছিল মদের বোতল—আও ভাই ওস্তাদ!

নিতাই জোড়হাত করিযা বলিয়াছিল—মাফ কর ভাই রাজন। ও দব্য আমি ছুঁই না।

—তব্? তব্ তুমি কি খাযেগা ভাই?

ঠাকুরঝি বলিযাছিল—দুধ খাবা, দুধ? বলিয়া আবার সেই খিল-খিল হাসি।

নিতাই হাসিয়াছিল—তা খেতে পারি। এমন দব্য কি আছে ভো-মণ্ডলে? দেবদুল্লভ।

ঠাকুরঝি সত্যই বড় ঘটী হইতে মাপের গেলাসে পরিপূর্ণ এক গ্লাস দুধ ঢালিয়া নিতাইয়ের সম্মুখে নামাইয়া দিযা তাহার অভ্যস্ত দ্রুতগমনে প্রায় পলাইয়া গিয়াছিল। এ সব পুরানো কথা।

রাজা এখন তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গুণমুগ্ধ ভক্ত।

গোসাঁইজীর চাকরিতে জবাব দিয়া নিতাই আসিয়া উঠিল স্টেশনে। সমস্ত শুনিযা রাজা বলিল—ঠিক কিযা ওস্তাদ। বহুৎ ঠিক কিয়া ভাই।

—আমাকে কিন্তু তোমার এইখানে একটু জায়গা দিতে হবে।

—আলবৎ দেগা। জরুর দেগা।

—এইখ'নে থাকব, আর ইস্টিশানে মোট বইব। তাতেই আমার একটা পেট চ'লে যাবে।

রেলওয়ে কনস্ট্রাকশনের সময় এই স্টেশনটি একটি প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল, সে সময় প্রয়োজনে অনেক ঘরবাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল, সেগুলি এখন পড়িয়াই আছে। তাহারই একটাতে রাজা ওস্তাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। নিতাই এখন স্টেশনে কুলিগিরি করে, ভদ্রলোকজনের মোট তুলিয়া দেয, নামাইয়া লয়, গ্রামান্তরেও মোট বহিয়া লইযা যায়, উপার্জ্জন তাহার ভালই হয়। স্টেশনে মাল নামাইতে-চড়াইতে মজুরি দুই পয়সা, এই গ্রামের মধ্যে যাইতে হইলে চার পযসা, গ্রামান্তরে হইলে রেট দূরত্ব অনুযায়ী। অন্য কুলিদের অপেক্ষা নিতায়ের উপার্জ্জন বেশী। তাহার সহায় স্বয়ং রাজা।

স্টেশন-স্টলটি তাহাদের একটি আড্ডা ; স্টলের ভেণ্ডার 'বেনে মামা' রহস্য করিয়া নিতাইকে বলে—রাজ-বয়স্য।

মামার দোকানে সজীব-বিজ্ঞাপন বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট বিপ্রপদ বলে—বয়স্য কি রে বেটা, বয়স্য কি ? সভাকবি, রাজার সভাকবি।

নিতাই বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া 'সুপ' শব্দ করিয়া মুখে দেয়, ভারি খুশী হইয়া উঠে। বিপ্রপদকে বড় ভাল লাগে তাহার। এত যন্ত্রণাদায়ক অসুখের মধ্যেও এমন আনন্দময় লোক দেখা যায় না। বাতব্যাধিগ্রস্ত বিপ্রপদ সকালে উঠিয়াই কোনমতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্টেশনে আসিয়া আড্ডা লয মামার দোকানে, অনর্গল বকে, লোকজনকে চা খাইতে উৎসাহিত করে। দেহ তাহার যত আড়ষ্ট, মুখ তদপেক্ষা অনেক সক্রিয়। রসিক ব্যক্তি, 'বসুধৈব কুটুম্বকম'। সকালবেলায় আসিয়া বিপ্রপদ বেলা বারোটায় বাড়ী ফিরে খাইতে। আবার

খানিকটা ঘুমাইযা, বেলা তিনটায খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্টেশনে আসিয়া বসে, যায রাত্রি সাড়ে দশটার ট্রেন পার করিয়া তবে। বিপ্রপদর সঙ্গে নিতাইযের জমে ভাল। নিতাই পদধূলি লইলে, বিপ্রপদ স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে আশীর্ব্বাদ করে—

ভব কপি, মহাকপি দগ্ধানন সলাঙ্গুল—

হাত জোড় করিযা নিতাই বলে—প্রভু, কপি মানে আমি জানি।

বিপ্রপদ হাসিযা ভুল স্বীকার করিযা বলে—ও—। কপি নয, কপি নয়, কবি, কবি। আমারই ভুল। আচ্ছা, কবি তো তুই বটিস, কই বল দেখি—'শকুনি খেললে পাশা, রাজ্য পেলে দুর্য্যোধন, বাকী রাখলে যুধিষ্ঠির কিন্তু ভীমের বেগ ঘটোৎকচ মরল কোন্ পাপে?'

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে উঠিযা দাঁড়াইযা কবিগান আরম্ভ করিযা দেয। বাঁ হাত গালে চাপিযা মুখের সম্মুখে ডান হাত আড়াল দিযা ঈষৎ ঝুঁকিযা সুর ধরিয়া আরম্ভ করে—আহা—আ হা রে—

রাজা ভাবে, ঢোলকটা পাড়িযা আনিবে না কি? কিন্তু সে আর হইযা উঠে না। বারোটার ট্রেনের ঘণ্টা পড়ে।

দূরান্তরের যাত্রী অধিকাংশই পায নিতাই। স্টেশনের জমাদার রাজার সুপারিশে যাত্রীরা নিতাইকে লইযা থাকে। নিতাইয়ের ব্যবহারও তাহারা পছন্দ করে।

মজুরির দরদস্তুর করিতে নিতাই সবিনযে বলে—প্রভু, গগনপানে দিষ্টি করেন একবার। গ্রীষ্মকাল হইলে বলে—দিনমণির কিরণটা একবার বিবেচনা করেন। বর্ষায বলে—কিষ্কবন্ন মেঘের একবার আড়ম্বরটা দেখেন কর্ত্তা। শীতে বলে—শৈত্যের কথাটা একবার ভাবেন বাবু।

মামার দোকানে বসিযা বিপ্রপদ নিতাইকে সমর্থন করে, বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের তো সব দোশালা আছে। ওর যে এক শালাও নাই। ওর কষ্টের কথা বিবেচনা করুন একবার।

কবি

দ্বিপ্রহরে বাহিরে যাইতে হইলে নিতাই রাজাকে বলিয়া যায়—রাজন, ঠাকুরঝি এলে দুধটা নিয়ে রেখো।

এখানে থাকিলে বারোটার ট্রেনটি চলিয়া গেলেই নিতাই একটু আগাইয়া গিয়া পয়েণ্টের কাছে অথবা লাইনের কাছে কৃষ্ণচূড়াগাছটির ছায়ায় গিয়া দাঁড়ায়। রোদ পড়িয়া লোহার লাইনের উপরের ঘষা অংশটা সুদীর্ঘ রেখায় ঝকমক করে, নিতাই নিবিষ্ট মনে যেখানে লাইনটা বাঁক ঘুরিয়াছে সেইখানে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। সহসা শুভ্র একটি চলন্ত রেখার মত রেখা দেখা যায়, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবর্ণ বিন্দু। ক্রমশ সেটি পরিণত হয় একটি মানুষে। তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড়খানি আঁটসাঁট করিয়া পরা একটি কালো দীর্ঘাঙ্গ মেয়ে। তাহার মাথায় একটি তক-তকে মাজা সোনার বর্ণের পিতলের ঘটী। ঘটীটি সে ধরে না—একহাতে মাপের গেলাস, অন্য হাতটি দোলে, সে দ্রুতপদে অবলীলাক্রমে চলিয়া আসে। মেয়েটি চলে দ্রুত ভঙ্গিতে, কথাও বলে দ্রুত ভঙ্গিতে। মেয়েটি সেই ঠাকুরঝি।

নিতাই নেশা করে না; কিন্তু দুধ তার প্রিয়বস্তু। চায়েও আসক্তি তাহার ক্রমশ বাড়িতেছে। ঠাকুরঝির কাছে সে নিত্য একপোয়া করিয়া দুধের যোগান লইয়া থাকে। দুধ আসিলেই চায়ের জল চড়াইয়া দেয়।

স্টেশনে নিত্য নানা স্থানের লোকজনের আনাগোনা। আশপাশের খবর স্টেশনে বসিয়াই পাওয়া যায়। খবরের মধ্যে কবিগানের খবর থাকিলে নিতাই উল্লসিত হইয়া উঠে। সেদিন সন্ধ্যাতেই লালপেড়ে পরিষ্কার ধুতি ও হাতকাটা জামাটি পরিয়া, মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া সাজে এবং গুন-গুন করিয়া কবিগান গাহিতে গাহিতে রাজাকে আসিয়া তাগাদা দেয়। মিলিটারী রাজা সাড়ে দশটার ট্রেন পার করিয়াই বলে—ফাইভ মিনিট ওস্তাদ।

পাঁচ মিনিটও তাহার লাগে না, তিন মিনিটের মধ্যেই রেলওয়ে কোম্পানির দেওয়া নীল কোর্ত্তাটা চড়াইয়া স্টেশনের একমুখো বাতি ও লাঠি হাতে বাহির হইয়া পড়ে। ভোর হইবার পূর্ব্বেই আবার ফিরিয়া আসে। শুধু কবিগানই

নয়, যাত্রাগান, মেলা—এ সবই নিতাইয়ের ভাল লাগে। আলোকোজ্জ্বল উৎসবমুখর রাত্রির মধ্যেই যদি সমস্ত জীবনটা নিতাইয়ের কাটিয়া যায়, তবে বড় ভাল হয়।

হঠাৎ চণ্ডীমায়ের মেলাতে নিতাই সত্য সত্যই কবিয়াল হইয়া উঠিল।

চার

কবিগানের পাল্লার পর চণ্ডীমায়ের প্রসাদী সিন্দুরলিপ্ত শুকনো বেলপাতার মালা গলায় দিয়া নিতাই ফিরিল—সেকালের দিগ্বিজয়ী কবিদের মত। মনে মনে সে বেশ অনুভব করিতেছিল—সে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সে কবি।

সমস্ত পথটা তাহার আত্মীয়স্বজন, যাহারা এতদিন কোন সম্পর্কই রাখে নাই, তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া কলরব করিতেছিল। সে সব কিন্তু কিছুই তাহার কানে আসিল না। রাজা ছিল তাহার গা-ঘেঁষিয়া। নিতাইয়ের গৌরবে বুক তাহার ফুলিয়া উঠিয়াছে, সে পথ চলিতেছিল সভাকবির গৌরবতৃপ্ত রাজার মতই। অনর্গল সে লোকজনকে সাবধান করিতেছিল—হট যাও, হট যাও। এতনা নগিচমে কেঁও আতা হ্যায়? হট যাও। উৎসাহের প্রাবল্যে আজ তাহার ভুল-হিন্দী বলার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে। রাজার স্ত্রী ও ঠাকুরঝি একটু পিছনে আসিতেছিল। নিতাইয়ের আত্মীয়দের সহিত রাজার বউ গলগল করিয়া বকিতেছিল—তোমরা তো মা তাড়িয়ে দিয়েছিলে। এই তো ইস্টিশান তোমাদের বাড়ীর দুয়োর থেকে দেখা যায়, কই, কোন দিন নিতাইয়ের খোঁজ করেছ?

ঠাকুরঝি মেয়েটি অন্ধকারের মধ্যে ভীরু দৃষ্টি মেলিয়া যে যখন কথা বলিতেছিল, তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল। পাশের গ্রামে তাহার শ্বশুর-বাড়ী, মেলা উপলক্ষে সে আজ দিদির বাড়ী আসিয়াছে, রাত্রে এইখানে থাকিবে,

ভোরে উঠিয়া চলিয়া যাইবে। তাহার বড় ইচ্ছা হইতেছিল ওস্তাদকে কয়টি কথা বলিতে—তুমি এত সব কি ক'রে শিখলে? দিদির ঘরে গাযেন করতে, আমরা হাসতাম। বাবা, এত নোকের ছামুতে—ওই এত বড় কবিয়ালের সঙ্গে—বাবা! কল্পনামাত্রেই রাত্রির অন্ধকার আবরণের মধ্যে অপরের অজ্ঞাতে মধ্যে মধ্যে তাহার দৃষ্টি বিস্ময়ে বড হইয়া উঠিতেছিল।

চণ্ডীতলা হইতে ডোমপাড়ার ভিতর দিযাই স্টেশনের পথ। নিতাইয়ের কযেকজন আত্মীয আজ তাহাকে আহ্বান করিল—বাড়ী আয।

নিতাইযের মা এখানে আর থাকে না, সে তাহার কন্যাকে আশ্রয করিযা গ্রামান্তরে জামাইয়ের বাড়ীতে থাকে। জামাই এ অঞ্চলের বিখ্যাত দাঙ্গাবাজ লাঠিযাল, রাত্রে ডাকাতি করে, গোপনে মদ চোলাই করিয়া বিক্রয করে, ভাঙ্গা ঘরে বসিযা পাকী মদ খায, ও সের দরুনে মাছ কেনে। নিতাইযের মা শুধু ভাতের জন্য নয—ওই পাকী মদ ও মাছের প্রলোভনেই সেখানে এখন বাস করিতেছে। নিতাই একবার নিজের ভাঙ্গা ঘরটার দিকে চাহিযা একটু হাসিল, বলিল,—না, আমি বাসাতেই যাই।

ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতেই একটা রূঢ় কণ্ঠের কঠিন কঠিন বাক্য অতর্কিতে, নিষ্ঠুর হাতের ছোঁড়া পাথরের টুকরার মত নিতাইকে আসিয়া আঘাত করিল,—এই শূয়ার—যাবি কোথা? দাঁড়া!

এ তাহার মামার কণ্ঠস্বর। মামা এখানকার কুলাধিপতি। তাহাদের স্বজাতিদের নৈশাভিযানের দলপতি। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ।

নিতাই চমকিযা উঠিল।

পাড়ার গলিমুখ হইতে মামা নামিয়া আসিযা তাহার সামনে দাঁড়াইল—প্রহ্লাদের সম্মুখে হিরণ্যকশিপুর মত। এবং খপ করিয়া তাহার টুঁটি টিপিযা ধরিয়া বলিল—তোর বাবাকে দাদাকে গাল খাওযালি খাওয়ালি—আমার বাবাকে দাদাকে গাল খাওযালি ক্যানে আসরের মধ্যিখানে? শূয়ারের বাচ্চা শূযার।

একমুহূর্ত্তে হতভম্ব হইয়া গেল সকলে। রাজন পর্য্যন্ত। নিতাইয়ের মামার হাত সাঁড়াশীর চেয়েও শক্ত। লোহার তালা ওই হাতের মোচড়ে মট করিয়া ভাঙিয়া যায়। নিতাইয়ের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সে কবিগান করিলেও ওই মামারই ভাগিনেয়। দেহে শক্তি তারও কম নয়। তার উপর প্রথম জোয়ান বয়স। সে দুই হাত দিয়া মামার হাতখানা টানিয়া ধরিল। পর মুহূর্ত্তে রাজন আগাইয়া আসিল—ছোড়ো—!

মামার হত্যা করিবার সঙ্কল্প ছিল না! ইচ্ছা ছিল শাসনের। তাই নিতাইয়ের গলা ছাড়িয়া দিয়া বলিল—যাঃ। আর এ-পাড়ার পথ মাড়াবি না। মহাদেব কবিয়াল ওই একটো কথা ঠিক বলেছে। আস্তাকুঁড়ের অঁটো (এঁটো) পাতার স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!—বলিয়া সে যেমন আসিয়াছিল অতর্কিতে—তেমনিই হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সমবেত লোকগুলি স্তব্ধ হইয়াই ছিল—স্তব্ধ হইয়াই রহিল। রাজন শুধু চীৎকার করিতে চেষ্টা করিল—ই ক্যা হ্যায়? ই ক্যা বাত? আঁঃ। মগকে মুল্লুক হ্যায়?

পাড়ার ভিতর হইতে আর একটা হুঙ্কার আসিল—যাঃ—যাঃ, চেঁচাস না রে বেটা কুলী!—

—রাজন চুপ কর। চল। ই আমার পাপ্য ভাই। চল। বলিয়া হাসিয়া বলিল—আজ থেকে অকূলে ভাসলাম। সে অকূলে তুমিই আমার ভেলা।

রাজন তাহার হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—তুম সাচ্চা আদমী ওস্তাদ!

নিতাই আবার একটু হাসিল। পেছনে ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতেছিল ঠাকুরঝি। নিতাইয়ের স্ত্রী বলিল—মরণ! কানছিস ক্যানে লো!

ভিড় তখন কমিয়া গিয়াছে। সঙ্গের লোকজন আপন আপন বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, নিতাই ও রাজার পরিবারবর্গ কেবল স্টেশনের পথে চলিয়াছে। কোয়ার্টারে আসিয়া রাজা বলিল—কুছ খা লেও ভাই ওস্তাদ।

আপনার আলোটি জালিতে জালিতে নিতাই সংক্ষেপে বলিল—না। সে সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় গড়াইয়া পড়িল। অনেক কথা। মামার হাতে লাঞ্ছনার কথাটা তাহার কাছে খুব বড় নয়। মামার কাছে অনেক লাঞ্ছনাই সে ভোগ করিয়াছে। ওটা তাহার অঙ্গের ভূষণ। ও ছাপাইয়া সে ভাবিতেছিল কবি-গানের কথা। বিশেষ করিয়া এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কবিয়াল তারণ মণ্ডলের কথা। তারণ কবি যে-আসরে গান করিয়াছে, সে কি লোক! হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে। সে যেবার প্রথম তারণ কবির গান শোনে সেবারকার সে ছবি এখনও তাহার মনে জলজল করিতেছে। এই চণ্ডীমায়ের মেলাতেই, সে কি জনতা, আর সে কি গোলমাল! তখন মেলারও সে কি জাঁকজমক! চার-পাঁচটা চাপরাসীই তখন মেলার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বাহাল করা হইত। তাহাদের সঙ্গে থাকিত বাবুদের দারোয়ান এবং দুই চারিজন বাবু। তবু সে কি গোলমাল। নিতাইয়ের স্পষ্ট মনে পড়িল কলরবমুখর জনতা মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল, আলোকোজ্জ্বল আসরের মধ্যে তখন তারণ কবি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই লম্বা মানুষটি, পাকা চুল, পাকা গোঁফ, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, বুকে সারি-সারি মেডেল, লাল চোখ; তারণ কবির আবির্ভাবেই সব চুপ হইয়া গিয়াছিল। আসরের একদিকে বেঞ্চ পাতিয়া গ্রামের বাবুরা বসিয়া ছিল, তাহারা পর্য্যন্ত চুপ করিয়া ছিল। আর সে কি গান! তারপর হইতে আশেপাশে যখন যেখানে তারণ কবির গান হইয়াছে, সেইখানেই সে গিয়াছে। একবার ভিড়ের মধ্যে হাত বাড়াইয়া সে তারণ কবির পায়ের ধুলাও লইয়াছিল। তখন হইতেই তাহার সাধ, কবিয়াল হইবে। ইচ্ছা ছিল, তারণ কবির দলে দোয়ারকি করিয়া সে কবিগান শিখিবে। কিন্তু তারণ মরিয়া গেল। মদ খাইয়াই নাকি তারণ মরিয়াছে। তারণ কবির ওই একটা বড় দোষ ছিল, ভীষণ মদ খাইত। আসরেই তাহার বোতল গেলাস থাকিত, সকলের সম্মুখেই সে মধ্যে মধ্যে জল বলিয়া মদ খাইত। ওই তারণ কবি সেদিন গানে গাহিয়াছিল—

কবি

"তোমার লাথি আমার বুকে পরম আশীষ শোন দশানন,
বিভীষণের রাক্ষস জন্মের হল শাপমোচন,
খালাস, খালাস, খালাস আমি খালাস পেলাম রে।"

সেদিন পাল্লাতে তারণ হইয়াছিল বিভীষণ এবং প্রতিপক্ষ বিষ্ণু সিং হইয়াছিল রাবণ। সেই কথাটাই আজ বারবার করিয়া মনে পড়িতেছে। সে আজ খালাস।

তারণ কবি তাহারই কপালদোষে মরিয়া গেল। এমন গুরু না হইলে কি ভাল কবি হওয়া যায়। শাস্ত্রের কি অন্ত আছে? পড়িয়া শুনিয়া সে সব শিখিতে গেলে এ জীবনে আর কবিয়াল হওয়া হইয়া উঠিবে না। রামায়ণ মহাভারত—। সহসা তাহার মনে হইল, মহাদেব আজ রামায়ণ হইতে যে প্রশ্নটা লইয়া তাহাকে অপদস্থ করিয়াছে, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া বসিল। ছোট একটি চৌকির উপর যত্নের সহিত রঙিন কাপড়ে বাঁধিয়া সে তাহার পুঁথিগুলি রাখিয়া থাকে। দপ্তর খুলিয়া সে বাহির করিল রামায়ণ। দপ্তরের মধ্যে এক গাদা বই, পাঠশালা হইতে আজ পর্য্যন্ত সংগৃহীত বইগুলি সবই তাহার আছে। পথে-ঘাটে উড়িয়া বেড়ায় যে সমস্ত ছেঁড়া কাগজ ও বইয়ের পাতা, তাহারও অনেক সংগ্রহ নিত্যই করিয়াছে। কাগজ দেখিলেই সে কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে চেষ্টা করে। যাহা ভাল লাগে তাহাই সে সযত্নে রাখিয়া দেয়। বইয়ের সংগ্রহও তাহার কম না—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কৃষ্ণের শতনাম, শনির পাঁচালী, মনসার ভাসান, গঙ্গামাহাত্ম্য, স্থানীয় থিয়েটার-ক্লাবের ফেলিয়া-দেওয়া কয়েকখানা ছেঁড়া নাটক; ইহা ছাড়া তাহার পাঠশালার বইগুলি—প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকখানি আছে। আর আছে খান দুইয়েক খাতা, ভাঙা স্লেট-পেন্সিল, একটা লেড-পেন্সিল, ছোট একটুকরা লাল-নীল পেন্সিল।

সেই রাত্রেই সে নিবিষ্ট মনে রামায়ণের পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিল। ঠিক, মহাদেব তাহাকে ধাপ্পা মারিয়াই হার মানাইয়াছে। ভুল তাহার নয়,

মহাদেবই ভুলকে সত্য করিয়াছে মুখের জোরে। হাসিয়া সে মহাদেবের প্রশ্নের উত্তরের ঠাঁইটা বন্ধ করিয়া রাবণ ও বিভীষণের বিতণ্ডার অধ্যায়টা খুলিল। পড়িয়া বই বন্ধ করিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসে না' রগের শিরা দুইটা দপ দপ করিয়া লাফাইতেছে, কানের পাশে এখন যেন ঢোল কাঁসির শব্দ উঠিতেছে।

মিলিটারী রাজা রাত্রি জাগিয়াও ঠিক সকাল ছয়টায় উঠিয়াছে। সাতটায় ফার্স্ট ট্রেন এ স্টেশন অতিক্রম করিবে। যুদ্ধ-ফেরত রাজা চা খায়, চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া স্টেশনে ঝাড়ু দিয়া আসিয়া ওস্তাদকে ডাকিল— ওস্তাদ! ওস্তাদ!

ওস্তাদ না হইলে চা খাইয়া সুখ হয় না। বউটা এখনও ঘুমাইতেছে। ঠাকুরঝি কিন্তু ঠিক আছে, সে রাজার পূর্ব্বেই উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরঝির ননদটা বড় দজ্জাল। এমন মেয়েটিকে বড় কষ্ট দেয়। রাজা মনে মনে এখন আপসোস করে,—বউটাকে কেন সে বিবাহ করিল! ঠাকুরঝিকে বিবাহ করিলেই ভাল হইত; ছিপছিপে দ্রুতগামিনী দ্রুতহাসিনী মিষ্টস্বভাবের ঠাররঝি তাহার মুখরা দিদির চেয়ে অনেক ভাল।

নিতাইয়ের সাড়া না পাইয়া রাজা আবার ডাকিল—হো ওস্তাদ!

এবার নিতাই জড়িত স্বরে উত্তর দিল—উঁহু।

—চা হো গেয়া ভেইয়া!

—উঁহু।

—আরে ট্রেন আতা হ্যায় ভেইয়া!

—উঁহু।

রাজা নিরুপায় হইয়া চলিয়া গেল। আর ডাকিল না। কাল রাত্রে ওস্তাদের বড়ই খাটুনি গিয়াছে, আজ বেচারার একটু ঘুম দরকার।

*　　*　　*　　*

বেলা নয়টা নাগাদ নিতাই উঠিল।

কবি

গত রাত্রের কথা স্মরণ করিয়া একটু মৃদু হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। কলিকাতার চাকুরে বাবুটি তাহাকে দেখিলেই বলিবেন—তুই একজন কবি, অ্যাঁ! তাহার পর ইংরেজিতে কি-একটা!

ভূতনাথবাবু তারিফ করিবেন—বাহবা রে নিতাই, বাহবা।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রামের লোকেরই সপ্রশংস বিস্মিত দৃষ্টি তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। বিপ্রপদ ঠাকুর একেবারে কোলাহল জুড়িয়া দিবে। স্টেশনে গিয়া বসিলেই হয়। এই সাড়ে নটার ট্রেনেই বিপ্রপদর মারফৎ তাহার কবিখ্যাতি একেবারে কাটোয়া পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। বাসি দুধ চা চিনি ঘরেই আছে, তবু সে ঘরে চা তৈয়ারী করিল না। চায়ের মগটি হাতে করিয়া শিথিল মন্থর পদক্ষেপে স্টেশন-স্টলে আসিয়া উপস্থিত হইল, মুখে সেই মৃদু হাসি!

বিপ্রপদ হৈ-হৈ করিয়া উঠিল—এই! এই! চোপ, সব চোপ! তারপর তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিল—বলিহার বেটা বলিহার! জয় রামচন্দ্র! কাল নাকি সত্যি সত্যিই লঙ্কাকাণ্ড করে দিয়েছিস শুনলাম। ভ্যালা রে বাপ কপিবর!

আশ্চর্য্যের কথা, বিপ্রপদর রসিকতায় নিতাই আজ অত্যন্ত আঘাত অনুভব করিল, মুহূর্ত্তে সে গম্ভীর হইয়া গেল।

বিপ্রপদর সেদিকে খেয়াল নাই, সে উত্তর না পাইয়া আবার ব ল—ধুয়ো কি ধরেছিলি বল দেখি? 'উঁপ! উঁপ! খ্যাকোর—খ্যাকোর উঁপ! চুপ রে বেটা মহাদেবা চুপ!' না কি? বলি া সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

নিতাই এবার হাত জোড় করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—আজ্ঞে প্রভু, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, ছোট জাত; বাঁদর, উল্লুক, হনুমান, জাম্বুবান যা বলেন তা-ই সত্যি। বলিয়াই সে আপনার মগটি বাড়াইয়া ভেণ্ডার বেনে মামাকে বলিল—কই গো, দোকানী মাশায়, চা দেন দেখি! সঙ্গে সঙ্গে সে পয়সার খুঁট খুলিতে আরম্ভ করিল।

দোকানী বেনে মামা মগে চা ঢালিয়া দিয়া বলিল—মাতুল না ব'লে

দোকানী বল্‌ছিস, সম্বন্ধ ছাড়ছিস নাকি নিতাই ?

নিতাই কথার উত্তর দিল না। বেনে মামাই বলিল—নাঃ, কাল নেতাই আমাদের আচ্ছা গান করেছে, ভাল গান করেছে।

বিপ্রপদ তাড়াতাড়ি একটা ঘুঁটে লইয়া একটা ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি পরাইতে পরাইতে বলিল—আজ কপিবরকে একটা মেডেল দোব।

কিন্তু তাহাকে সে অবসর না দিয়াই নিতাই চায়ের মগটি হাতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ওদিকে সাড়ে নয়টার ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া পড়িয়াছে। বিপ্রপদ ও বেনে মামা মনে করিল নিতাই বোধ হয় মোটের সন্ধানে গেল। কিন্তু প্লাটফর্ম্ম হইতে রাজা হাঁকিতেছিল—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

সাড়া না পাইয়া রাজা নিজেই ছুটিয়া আসিল। বেনে মামা বলিল—এই তো উঠে গেল। প্ল্যাটফর্ম্মে নাই ?

এদিক ওদিক চাহিয়া রাজার নজরে পড়িল, গাছপালার আড়ালে আড়ালে দেখিল—নিতাই চলিয়াছে বাসার দিকে। সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল।

—গাঁওকে একঠো মোট হ্যায় ভেইয়া, একঠো বেগ আওর ছোটাসে একঠো বিস্তারা।

নিতাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না।

—আরে, বড়বাবুকে জামাই। উমদা বকশিশ মিলে গা। দো আনা তো জরুর।

—না।

—কেয়া, তবিয়ৎ কুছ খারাপ হ্যায় ?

—না।

—তব্ ? রাজা বিস্মিত হইয়া গেল।

নিতাই গম্ভীরভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল—কুলিগিরি আর করব না রাজন।

রাজা এবারে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল।

পাঁচ

নিতাই বাসায় আসিয়া হঠাৎ রামায়ণখানা খুলিয়া বসিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে বইখানি খুলিল। বিপ্রপদর কথায় সে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়াছে। সে বার বার ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে—ব্রাহ্মণবংশের মূর্খ কি বুঝিবে! কিন্তু কিছুতেই তাহার মন শান্ত হয় নাই। তাই সে রামায়ণখানা টানিয়া লইয়া বসিল। বইখানা খুলিয়া সে বাহির করিল দস্যু রত্নাকরের কাহিনী। বহুবার সে এ কাহিনী পড়িয়াছে, কিন্তু আজ এ কাহিনী নূতন রূপ নূতন অর্থ লইয়া তাহার মনের মধ্যে সাড়া তুলিয়াছে। বই হইতে পড়িবার পূর্ব্বেই জানা কাহিনী তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল আসিল। চোখ মুছিয়া সে পড়িতে আরম্ভ করিল।—

"রামনাম ব্রহ্মাস্থানে পেয়ে রত্নাকর।'
সেই নাম জপে ষাট হাজার বৎসর॥"

বাহির হইতে রাজা তাহাকে ডাকিল—ওস্তাদ।

উদাসভাবেই মুখ তুলিয়া নিতাই তাহাকে আহ্বান করিল—এস, রাজন এস।

রাজা আসিয়া বসিয়াই তাহাকে প্রশ্ন করিল—কেয়া হুয়া ভাই তুমারা? কাম কেঁও নেহি করেগা?

নিতাই হাসিয়া বলিল—শোন, আগে এই কাহিনীটা শোন।

রাজা বলিল—দূ-রো, ওহি লিখাপঢ়ি তুমারা মাথা বিগড় দিয়া।

নিতাই তখন পড়া শুরু করিয়া দিয়াছে। রাজা অগত্যা একটা বিড়ি ধরাইয়া শুনিতে বসিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তন্ময় হইয়া গেল।

"বর দিয়া ব্রহ্মা গেলা আপন ভবন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥

পড়া শেষ করিয়া নিতাই রাজার মুখের দিকে চাহিল। রাজা তখন গলিয়া

গিয়াছে। সে হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—সীযারাম। সীযারাম! তারপর নিতাইয়ের তারিফ আরম্ভ হইল—আচ্ছা পঢ়তা হ্যায় তুম ওস্তাদ! বহুৎ আচ্ছা!

নিতাই এব.ার গম্ভীরভাবে বলিল—রাজন, এইবার তুমিই বিবেচনা ক'বে দেখ।

রাজা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কি?

জানালা দিয়া রেললাইনের রেখা ধরিয়া দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিতাই বলিল—রত্নাকর, ধর কবি হলেন, তারপর কি তোমার তিনি ডাকাতি করতেন, না, মানুষ মারতেন?

রাজা বলিয়া উঠিল—আরে বাপ রে, বাপ রে! এইসা কভি হোতা হায় ওস্তাদ!

—তা হ'লে? কাল রাত্রির কথাটা একবার স্মরণ ক'রে দেখ। চারিদিকে তো র'টে গেল কবিয়াল ব'লে!

—আলবৎ! জরুর!

—তবে? আর কি আমার মস্তকে করে মোট বহন করা উচিত হবে? বাল্মীকি মুনির কথা ছেড়ে দাও! কার সঙ্গে কার তুলনা! ভগবানের অংশ, দেবতা ওঁরা। কিন্তু আমিও তো কবি।

রাজা এইবার সমস্তটা বুঝিল। সে শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে নিতাইয়ের মুখের দিকে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

—বল রাজন, আর কি আমার কুলিগিরি করা শোভন হবে? লোকে বলবে—কবি মোট বহন করছে।

—হাঁ, ই বাত ঠিক হ্যায়। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তিত হইয়া রাজা বলিল—লেকিন একঠো বাত ওস্তাদ—

—বল? রাজার মুখের দিকে চাহিয়া নিতাই প্রশ্ন করিল।

—লেকিন রোজগার তো চাহিয়ে ভাই; খানে তো হোগা ভেইয়া!

বার বার ঘাড় নাড়িয়া নিতাই বলিল—সে আমি ভাবি না রাজন। দুবেলা না হয়, একবেলা খেয়েই থাকব, তাও যেদিন না জুটবে, সে দিন না হয় উপবাসীই থাকব। অতঃপর অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কণ্ঠস্বরে বিপুল গুরুত্ব আরোপ করিয়া সে বলিল—তা ব'লে ভগবান যখন আমাকে কবি করেছেন, তখন—। নিতাই বার বার অস্বীকারের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িল, অর্থাৎ না—না—না। তখন সে মাথায় করিয়া মোট আর ব'হবে না।

রাজাও গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছিল, সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া এবার পরিষ্কার বাংলায় বলিল—না ওস্তাদ, ছোট কাজ আর তোমার করা হবে না উঁ-হুঁ। নাঃ।

রাজার ... নিতাইয়ের প্রীতির আর সীমা রহিল না। গভীর আবেগের সহিত সে বলিল—তুমি আমার সত্যকার মিত্র রাজন।

—ধন্য হোগেয়া ওস্তাদ, তুমারা মিতা হোয়কে হাম ধন্য হোগেয়া। রাজনেরও আবেগের অবধি ছিল না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই এবার বলিল, আজ বড় দুঃখ পেয়েছি রাজন।

—দুখ? কৌন দুখ দিয়া ভাই?

—ওই তোমার বিপ্রপদ ঠাকুর। আমাকে বললে কি না— পিবর, মানে তোমার হনুমান!

রাজা মুহূর্ত্তে সোজা হইয়া বসিল। তাহার মিলিটারী মেজাজ মাথা-চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, সে ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিল নিতাইকে—জবাব কেঁও নেহি দিয়া তোম?

—জবাব জিহ্বার অগ্রভাগে এসেছিল রাজন, কিন্তু সামলে নিলাম। ব্রাহ্মণ বংশের মূর্খ বলীবর্দ্দ অপেক্ষা, কপি অনেক ভাল রাজন।

—জরুর। আলবৎ।

নিতাই এবার নিজেই রচনা করিয়া বলিল—

কবি

"সংসারে যে সহ্ব করে সেই মহাশয়।
ক্ষমার সমান ধর্ম্ম কোন ধর্ম্ম নয়॥"

কবিতা আওড়াইয়া নিতাই বলিল—বুঝলে রাজন, ক্ষমা করেছি আমি। একে ব্রাহ্মণ, তায় বোগা লোক, তার উপর মূর্খ; ওকে আমি ক্ষমা করেছি।

রাজন মুগ্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—সাদা বাংলায় বলিল—ভালই করেছ ওস্তাদ। তারপরই সে আবার বলিল—তাহ'লে কি করবে ওস্তাদ? একটা কিছু করা তো চাই ভাই। পেটের তুল্য অনবুঝ তো নাই সংসারে।

—আমি একটা দোকান করব ওস্তাদ।

—দোকান?

—হ্যাঁ, দোকান। বিড়ির দোকান, নিজেই বিড়ি বাঁধব, আর ইস্টিশানের বটতলায় বসে বেচব। দু-এক বাক্স সিগারেটও রাখব।

রাজন উৎসাহিত হইয়া উঠিল—বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা হোগা ওস্তাদ।

নিতাই কিন্তু এবার একটু ম্লানভাবেই বলিল—বণিক মাতুল একটু রুষ্ট হবে আমার ওপর। কিন্তু—

—কেয়া কিন্তু? উ গোসা করনেসে কেয়া হোগা? জাস্তি ভাত খায়েগা আপনা ঘরমে!

—না রাজন। কারও ক্ষতি করতে আমার ইচ্ছা নাই। বলিতে বলিতেই সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।—আচ্ছা রাজন, বাঁশ কিনে যদি মোড়া সাজি বেশ শৌখান করে তৈরি করি, তাহ'লে কেমন হয়?

—উ সব্‌সে আচ্ছা!

—কিন্তু বিপ্রপদ বলবে কি জানো? ডোমবৃত্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে—বেটা ডোম!

দাঁতে দাঁত ঘসিয়া রাজন বলিল—একদিন ঠেসে কান দুটো মলে দেবো বেটা বামুনের।

—না। হাজার হ'লেও ব্রাহ্মণ! রাজন "ব্রাহ্মণ সামান্য নয়, ব্রাহ্মণে করিলে ক্রোধ হইবে প্রলয়।" শাস্ত্রের কথা ভ ই। তা ছাড়া—নিতাই এবার বেশ হাসিয়াই বলি ল—দল . .ডাম, ডোমেরই ছেলে যখন, তখন ডোম বললে রাগ্‌লে চলবে ..'

—বাস— ব স! কেয়া হরজ্। বোলনে দেও ডোম! রাজনেরও আর কোন ' ছিল না!—বহুৎ আচ্ছা কাম, দোকান লাগাও, আওর একঠো সাদী করো ওস্তাদ! সন ার পাতাও।

তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট উল্টাইয়া নিতাই বলিল—দূর।

—দূর কেঁও ভাই? উ হাম নেহি শুনেগা।

—আচ্ছা তার আগে একটা কাহিনী বলি শোন।

কাহিনীতে রাজনের পরম অনুরাগ, সে বিড়ি ধরাইয়া জাঁকিয়া বসিল; নিতাই আরম্ভ করি. লেজকাটা শেয়ালের গল্প। গল্প শেষ করিয়া নিতাই বলিল—তুমি লেজ কেটেছ ব'লে আমি লেজ কাটছি না রাজন।

রাজা প্রথমে অবশ্য খানিকটা হাসিল, তারপর কিন্তু বলিল—উবাত তুমারা ঠিক নেহি হ্যায়। সন্‌সারমে আযকে সাদী নেহি করেগা তো কেয়া করেগা?

নিতাই এবার বলিল—তুমি ক্ষেপেছ রাজন. বিয়ে ক'রে বিপদে পড়ব শেষে। আমাদের জাতের মেয়ে কখনও বিয়ের মর্ম্ম বোঝে? বে ়ই খ্যাচ-খ্যাচ করবে দিনরাত। তা ছাড়া ধরগা তোমার—; কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিতাই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ভ্রূ নাচাইয়া রাজা প্রশ্ন করিল—উ কেয়া বাত ওস্তাদ?

—ধরগা তোমার, তেমন মনে-ধরা কনেই বা কোথায় হে? বেশ মৃদু হাসিয়া নিতাই বলিল—আমরা হলাম কবিয়াল লোক। আমাদের চোখ তো যাতে-তাতে ধরবে না রাজন!

রাজা এবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। রাজার উচ্চহাসি উৎকট এবং বিকট। রাজার সে হাসি কিন্তু অকস্মাৎ আবার বন্ধ হইয়া গেল। গম্ভীর হইয়া সে বার

বার ঘাড় নাড়িয়া যেন এই সত্যকে স্বীকার করিযাই বলিল—ঠিক বাত ওস্তাদ, ঠিক বাত বোলা হ্যায় ভাই। লড়াইমে গিযা দেখা, আ-হা-হা একদম ফুলকে মাফিক জেনানা। ইরাণী দেখা হ্যায় ওস্তাদ, ইরাণী? ওইসা, লেকিন উস্‌সে তাজা। রাজার কথা ফুরাইযা গেল, কিন্তু স্মৃতির ছবি ফুরাইল না; সে উদাস দৃষ্টিতে জানালা। ভিতর দিযা চাহিযা বহিল বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রের দিকে। যেন বস্‌রার সেই রূপসীদের শোভা—ওই ধু ধু-করা কৃষিক্ষেত্রে ভাসিযা উঠিযাছে। নিতাইও চাহিযা ছিল জানালার ভিতর দিয়া, রেললাইন দুইটিব সমান্তরাল শাণিত দীপ্তি দুইটি বাঁকের মুখে যেখানে একটি বিন্দুতে এক হইযা মিলিযাছে, সেই বিন্দুব দিকে। সহসা এক সময সেই বিন্দুটির উপব জাগিযা উঠিল চলন্ত সাদা কাশফুলের মত একটি রেখা, বেখাটির মাথায একটি স্বর্ণবিন্দু যেন ঝকমক করিযা উঠিতেছে মুহূর্তে মুহূর্তে!

তাহাদের এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল রাজার স্ত্রীর তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠ। রাজার স্ত্রী চীৎকার কবিতেছে। রাজা এখানে বসিয়া আড্ডা দিতেছে, তাই সে আপনার অদৃষ্টকে উপলক্ষ্য রাখিযা রাজাকে লক্ষ্য করিযা বাছিযা বাছিযা শাণিত বাক্যবাণ নিক্ষেপ কারতেছে।

—ছি বে, ছি রে আমার অদেষ্ট। সকালবেলা থেকে বেলা দোপর পর্যন্ত মানুষের ঘর ব'লে মনে থাকে না। অদেষ্টে আমার আগুন লাগুক, পাথর মেরে এমন নেকাকে ভেঙে কুচিকুচি করি আমি।

বাজার মুখখানা ভীষণ হইযা উঠিল, সে উঠিযা পড়িল। নিতাই শঙ্কিত হইযা বলিল—কোথা যাচ্ছ?

—আতা হ্যায। আভি আতা হ্যায। সে চলিয়া গেল।

—রাজন। রাজন! নিতাই পিছন পিছন আসিযা দুযারে দাঁডাইযা রহিল। কিছুক্ষণ পরই রাজা ফিরিল সেই উচ্চহাসি হাসিতে হাসিতে। হাসিযা সে মাটির উপর শুইযা পড়িল। নিতাই প্রশ্ন করিল—হ'ল কি?

রাজার হাসিতে মুহূর্তের জন্যও ছেদ পড়ে না, এমন হাসির মধ্যেও কথাও

বলা যায় না। তবুও বহুকষ্টে রাজা বলিল—ভাগা হ্যায়। মাঠে মাঠে—। সঙ্গে সঙ্গে সেই উৎকট উচ্চহাসি। নিতাই বুঝিল, গালিগালাজ-মুখরা রাজার স্ত্রী রুদ্র মূর্ত্তিতে রাজাকে আসিতে দেখিযাই বিপরীত দিকের দরজা দিযা বাহির হইয়া ছুটিযা পলাইযাছে। রাজা উঠিবা দাঁড়াইযা, ফিরিযা দেখাব অভিনয করিযা বলিল, এইসা করকে দেখতা; হাম এক পাও গিযা তো ফিন দৌড লাগাযা। অর্থাৎ রাজাকে এক পা অগ্রসর হইতে দেখিলেই সে দৌড দিযাছে, আবার কিছুদূর গিযা ফিরিযা দেখিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজার হাসি আবার উথলিযা উঠিল।

এই মুহূর্ত্তটিতেই বাড়ীর মধ্যে আসিযা প্রবেশ করিল সেই ঠাকুরঝি। পরনে ক্ষারে ধো[illegible] মোটা স্[illegible]ার খাটো কাপড়, মাথায পরিচ্ছন্ন মাজা পিতলের ঘটী। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সেটি সোনার মত ঝকঝক করিতেছে।

নিতাই সাদরে আহ্বান ক বল—এস ঠাকুরঝি, এস।

ঠাকুরঝি রাজাকে এমনভাবে হাসিতে দেখিযা বিপুল কৌতুক অনুভব করিল। সকৌতুকে সে রাজার দিকে আঙুল দেখাইযা নিতাইকে প্রশ্ন করিল তাহার স্বভাবগত বাচন ভঙ্গিতে—জামাই এত হাসছে কেনে?

—শুধাও ভাই জামাইকে। নিতাই হাসিল।

—অই! অই। ই কি হাসি গো। এমন ক'রে হাসছ কেনে গো জামাই?

সঙ্গে সঙ্গে হাসির ছোযাচ তাহাকেও লাগিযা গেল। সেও হাসিতে আরম্ভ করিল—হি-হি-হি! হি-হি-হি! অত্যন্ত দ্রুত মৃদু ধাতব ঝঙ্কারের মত হাসি।

রাজার হাসি অকস্মাৎ থামিযা গেল। তাহার দিকে আঙুল দেখাইযা হাসার জন্য সে ভীষণ চটিযা উঠিযাছে। তাহার মনে হইল মেযেটা তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। ভীষণ চটিযা রাজা ধমক দিযা উঠিল—অ্যাও!

ধমক খাইযা মেয়েটির হাসি বাড়িযা গেল।

রাজা বলিল—আলকাতরার মত রঙ, সাদা দাঁত বের ক'রে হাসছে দেখ! লজ্জা নাই তোর?

এবার মেয়েটি যেন মার খাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া সে বলিল—লাও বাপু, দুধ লাও। আমার দেরি হয়ে গেল। গেরস্ততে বকবে।

রাজা বলিল—তোকেও একদিন ঠ্যাঙানি দিতে হবে দেখছি। দিদির মত মাঠে মাঠে— আবার সে হাসিতে আরম্ভ করিল।

ঠাকুরঝি কিন্তু এবার হাসিল না। সে নীরবে নতমুখে ঘটী হইতে মাপের গ্লাসে দুধ ঢালিয়া গ্লাসটি পরিপূর্ণ করিয়া ধরিয়া আবার তাগাদা দিল—কই গো, কড়াই পাত।

নিতাই ব্যস্ত হইয়া দুধের কড়াটি পাতিয়া দিয়া বলিল—রাগ করলে ঠাকুরঝি? না না, রাগ ক'রো না।

ঠাকুরঝি উত্তর দিল না, মাপা দুধ ঢালিয়া দিয়া সে নীরবেই চলিয়া গেল। পিছন হইতে রাজা এবার রসিকতা করিয়া বলিল—ওঃ, ঠাকুরঝির আমার ডাকগাড়ি গেল। বাবা রে, বাবা রে, ছুটেছে! পোঁ—ভস-ভস ভস-ভস। বাবা রে।

ঠাকুরঝি কিন্তু ফিরিয়াও চাহিল না।

নিতাই বলিল—না রাজন, এ-পোকার বাক্য বলা তোমার উচিত হ'ল না।

কিন্তু রাজা সে কথা স্বীকার করিল না। কিসের অনুচিত? সে ফুৎকারে আপনার অন্যায় উড়াইয়া দিল—ধে—ৎ! সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠিয়া পড়িল। দেড়টার গাড়ীর ঘণ্টা দিতে হইবে। এই সময়টি নির্ণয়ে ঠাকুরঝি তাহার সিগনাল। ঠাকুরঝি দুধ দিয়া গ্রামে গেলেই সে স্টেশনের দিকে রওনা হয়. মধ্যপথেই শুনিতে পায় মাস্টার হাঁকিতেছে—রাজা!

রাজা নিত্য সাড়া দেয়, আজও দিল—হাজির হ্যায় হুজুর।

ঠাকুরঝি এবং রাজন দুজনেই চলিয়া গেল। নিতাই একটু বিষণ্ণ হইয়াই বসিয়া রহিল। না-না, এমন ভাবে ওই মিষ্টি মেয়েটিকে রাজনের এমন কটু কথা

বলা উচিত হয় নাই। সংসারে সুখ ভালবাসায়, মিষ্টি কথায়। কাল রাত্রের আসরে গাওয়া গানখানি আবার তাহার মনে পড়িয়া গেল।

"আমি ভালোবেসে এই বুঝেছি—
সুখের সার সে চোখের জলে রে!"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরঝি দুধ দিয়া গিয়াছে: চা খাইতে হইবে। সে উনান ধরাইতে বসিল। দোকানী বণিক মাতুলের মাপা চায়ে তাহার নেশা হয় না। তা ছাড়া শরীরটাও আজ ভাল নাই। গত রাত্রির পরিশ্রমে, উত্তেজনায়, অনিদ্রায়—আজ অবসাদে দেহ যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। মাথা ঝিমঝিম করিতেছে। কানের মধ্যে এখনও যেন ঢোল-কাঁসির শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে; আর একটু চা না হইলে জুৎ হইবে না।

উনান ধরাইয়া কেত্‌লির বিকল্প একটি মাটির হাঁড়িতে সে জল চড়াইয়া দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মন আবার উদাস হইয়া উঠিল। নাঃ, রাজনের এমন কটু কথা বলা ভাল হয় নাই। ঠাকুরঝি মেয়েটি বড় ভাল। আজ সে অনেক কথা অনর্গল বলিত। বলিবার ছিল যে! গত রাত্রির কবিগান শুনিয়া ঠাকুরঝি সবিস্ময়ে কত কথা বলিত। মেয়েটি অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছে, তাই সে কথাগুলি না বলিয়াই চলিয়া গেল। 'আলকাতরার মত রঙ'—। ছি, ওই কথাই কি বলে? কালো? ওই মেয়ে কালো? রাজনের চোখ নাই। তা ছাড়া কালো কি মন্দ! কৃষ্ণ কালো, কোকিল কালো, চুল কালো—আহা-হা! আহা-হা! বড় সুন্দর, বড় ভাল একটি কলি মনে আসিয়া গিয়াছে রে! হায়, হায়, হায়!

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?"

ছয়

বড় ভাল কলি হইযাছে। নিতাইয়ের নিজেরই নেশা ধরিয়া গেল।—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?"

ওদিকে চায়ের জল টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া নিতাই ফুটন্ত জলের হাঁড়িটা নামাইয়া চা ফেলিয়া দিয়া একটা কলাই-করা লোহার থালা চাপা দিল। 'ফুটন্ত জলে প্রত্যেক জনের জন্য এক চামচ চা দিয়া পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন'—বেনে মামার স্টলে নিতাই চা প্রস্তুত করিবার বিজ্ঞাপন দেখিয়াছে। চা দিয়া আবার সে আপন মনে কলিটা ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় কলি আর মনোমত হইতেছে না। সে জানালা দিয়া বাহিরের যাবতীয় কালো বস্তুর দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তবু পছন্দসই দ্বিতীয় কলি আসিল না। অন্য দিন সে গরম জলে চা দিয়া মনে মনে এক হইতে ষাট পর্য্যন্ত পাঁচবার গনিয়া যায়, তারপর দুধ চিনি দেয়। আজ আর সে হইয়া উঠিল না, কেবলই কলিটা গুনগুন করিয়া ভাঁজিয়া মনে মনে দ্বিতীয় কলি খুঁজিয়া ফিরিল। অকস্মাৎ তাহার চায়ের কথা মনে হইতেই সে দুধ চিনি দিয়া চা ছাঁকিয়া লইল। কলাই-করা লোহার মগে চা লইয়া বাকিটা রাজার জন্য ঢাকা দিয়া রাখিয়া সে বসিল কৃষ্ণচূড়াগাছটির তলায়। এটি তাহার বড় প্রিয় স্থান। ঘন কালো সরু সরু পাতায় ছাতার মত গাছটি; নিতাই বলে—'চিরোল-চিরোল পাতা'। তাহার উপর যখন চৈত্রের শেষ হইতে থোপা-থোপা লাল ফুলে ভরিয়া উঠে, তখন নিতাই প্রায় অহরহই গাছটির তলায় বসিয়া থাকে। ফুলের লোভে ছেলের দল আসে, নিতাই তাহাদিগকে ঝরা ফুল দিয়া বিদায় করে, গাছে চড়িয়া ফুল তুলিতে দেয় না।

স্টেশন হইতে বাজার হাঁক-ডাক আসিতেছে। এই ট্রেনটার সঙ্গে মালগাড়ী থাকে, এখানকার মাল থাকিলে গাড়ী কাটিয়া দিয়া যায়—সেই গাড়ী শান্টিং হইতেছে। নিতাইও নিয়মিত অন্য কুলিদের সঙ্গে মালগাড়ী ঠেলিত। সহসা

তাহার মনের গান চাপা দিয়া জাগিয়া উঠিল জীবিকার ভাবনা। কুলিগিরি সে আর করিবে না, সে কবিয়াল। কিন্তু অন্ন জুটিবে কেমন করিয়া?

লঘু দ্রুত গমনে ঘন ঘন পা ফেলিয়া ধপধপে মোটা কাপড় পরিয়া হাল্কা কাশফুলের মত চলিয়াছে ঠাকুরঝি; মাথায় সোনার টোপরের মত ঝকঝকে পিতলের ঘটি। ঠাকুরঝির কথাও যেমন দ্রুত, চলেও সে তেমনি ক্ষিপ্র গতিতে। ঢ্যাঙা নয়, অথচ সরস কাঁচা বাঁশের পর্ব্বের মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিতে বেশ একটি চোখজুড়ানো লম্বা টান আছে। ওই দীঘল ভঙ্গিটি নিতাইয়ের সব চেয়ে ভাল লাগে। আর ভাল লাগে তাহার কালো কোমল শ্রী। ঠাকুরঝি আজ অত্যন্ত দ্রুত চলিয়াছে; নিতাই মনে মনে একটু হাসিল—তাহাকে দেখিয়াই ঠাকুরঝি এমন হনহন করিয়া চলিয়াছে। শক্তি থাকিলে ঠাকুরঝি নিশ্চয় মাটি কাঁপাইয়া পথ চলিত। কিন্তু রাজনের এমন কড়া কথা বলা ভাল হয় নাই। আলকা-তরার মত রঙ হইলেও ঠাকুরঝি তো মন্দ দেখিতে নয়! মন্দ কেন, ভালই। কালো রঙে কি আসে যায়!

'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?'

নিতাই ডাকিল—ঠাকুরঝি! অ ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি গ্রাহ্য করিল না, সে হনহন করিয়াই চলিয়াছে।

—আমার দিব্যি! নিতাই হাঁকিয়া বলিল।

ঠাকুরঝি থমকিয়া দাঁড়াইল।

মিঠা সরু আওয়াজে দ্রুতভঙ্গিতে মেয়েটি বলিল—না, আমার দেরি হয়ে যাবে।

—একটা কথা। শোন শোন।

—না। ওইখান থেকে বল তুমি।

—আমার দিব্যি।

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঠাকুরঝি এবার আগাইয়া আসিয়া নিতাইয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—তোমার দিব্যি যদি আমি না মানি?

—না মানলে মনে বেথা পাব, আর কি ঠাকুরঝি। নিতাই ছলনা করিয়া বলিল না, আন্তরিকতাব সহিতই বলিল।

অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরেই এবার মেয়েটি বলিল—লাও কি বলছ, বল।

তাহাব মুখের দিকে চাহিয়া মিষ্ট হাসি হাসিয়া নিতাই বলিল—রাগ কবেছ?

মুহূর্ত্তে ভীরু চকিত দৃষ্টি ভবা চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—কালো আছি, আমি আপনার ঘরে আছি। কেউ তো আমাকে খেতে পরতে দেয় না!

নিতাই হাসিয়া বলিল—আমি কিন্তু কালো ভালবাসি ঠাকুবঝি। ঠাকুরঝির মুখের কালো বঙে লাল-আভা দেখা যায না, তবু তাহার লজ্জাব গাঢত্ব বোঝা যায। নিতাই কিন্তু গ্রাহ্য করিল না, সে গালে হাত দিযা মৃদু স্বরে গান ধবিযা দিল—

কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে।

লজ্জিতা ঠাকুবঝি এবাব সবিস্ময়ে শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টিতে নিতাইযেব দিকে চাহিল, বলিল—কাল তুমি বাপু ভারি গান কবেছ।

—ভাল লেগেছে তোমার?

—খুব ভাল।

—এস, এস, একটুকুন চা আছে—খাবে এস।

—না না। ঠাকুবঝিব চা খাইতে বেশ ভাল লাগে, কিন্তু মেযেদেব ভাল লাগার কথা বলিতে নাই। ছি!

নিতাই দিব্যি দিল—আমার দিব্যি। নিতাই বাসার দিকে ফিবিল। রাজনের জন্য যে চা ছাঁকিয়া রাখিযাছিল, সেটা উনানের উপরে বসানোই ছিল, নিতাই সেটা দুইটা পাত্রে ঢালিযা একটা ঠাকুরঝিকে আগাইযা দিল। মেযেটি আবার সলজ্জ ভাবে বলিল—না, না, তুমি খাও।

—না, তা হবে না। তাহ'লে বুঝব, তুমি এখনও কোধ করে আছ।

বাটিটা টানিযা লইযা সকৌতুক বিস্ময়ে ঠাকুরঝি বলিল—কোধ কি গো?

—রাগ। 'ক্রোধ' মানে হ'ল তোমার রাগ! কয়ে রফলা 'ও'কার ধ, ক্রোধ। 'হিংসা ক্রোধ অতি মন্দ কভু নহে ভাল'। বুঝলে ঠাকুরঝি, এই কারুর হিংসে করো না, আর ক্রোধ করো না। ক্রোধের নাম হ'ল চণ্ডাল।

গভীর বিস্ময়ে মেয়েটি নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, তুমি এত সব কি ক'রে শিখলে?

গম্ভীরভাবে নিতাই উপরের দিকে চাহিয়া পরম-তত্ত্বজ্ঞের মতই বলিল—ভগবানের ছলনা ঠাকুরঝি। নইলে কবিয়াল ক'রেও তিনি আমাকে 'ডোম'-কুলে পাঠালেন কেনে, বল?

নীবর বিস্ময়ে মূর্তিমতী শ্রদ্ধার মত মেয়েটি কবিয়ালের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার চোখের উপর ভাসিতেছিল—শত শত লোকের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে এই লোকটি মুখে মুখে ছড়া বাঁধিয়া গান গাহিতেছে!

অকস্মাৎ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—সবই তাঁর লীলা। না হলে আমাকে ঠাট্টা ক'রে কপিবর, মানে হনুমান বলে!

চকিত উত্তেজনায় ঠাকুরঝির ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে প্রশ্ন করিল—কে? কে বটে, কে?

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—সে শুনে কি করবে বল? লাও, চা খাও। জুড়িয়ে গেল।

ঠাকুরঝি এবার পিছন ফিরিয়া বসিল, জামাই বা নিতাইয়ের দিকে মুখ রাখিয়া সে কখনও কিছু খায় না। পিছন ফিরিয়া বসিয়া চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া সে বলিল—না, বলতে হবে তোমাকে। কে বটে, কে সে? জামাই বুঝি? জামাই অর্থে রাজন।

—না না, ঠাকুরঝি, রাজন আমার পরম বন্ধু, বড় ভাল নোক।

—হ্যাঁ, ভাল নোক না ছাই। যে কটুকটে কথা!

—না, না। আজ তোমাকে ওটা পরিহাস ক'রে বলেছে। তুমি শালী, পরিহাসের সম্বন্ধ।

—পরিহাস কি গো ?

—ঠাট্টা ঠাট্টা। তোমার সঙ্গে তো ঠাট্টার সম্বন্ধ।

ঠাকুরঝি চুপ করিয়া রহিল, নিতাইয়ের কথাটা সে মনে মনে স্বীকার করিয়া লইতেছিল। াকুরঝির কোমল কালো আকৃতিব সঙ্গে তাহার প্রকৃতিব একটি ঘনিষ্ট মিল আছে, সঙ্গীত ও সঙ্গতের মত। কযেকমুহূর্ত্ত পরেই সে বলিল—তা বটে। জামাই আমাদের রাগীদার হোক, নোক ভাল।

—ভারি ভাল নোক।

—কিন্তু তোমাকে উ কথা কে বললে, বলতে হবে। সে মুখপোড়া কে বটে, কে ?

গাল দিযো না ঠাকুরঝি, জাতে বাম্ভণ ওই যে বণিক মাতুলের দোকানে 'বক' মুনির মত বসে থাকে আর ফরফর করে বকে ? ওই বিপ্রপদ ঠাকুর।

—কেন উ কথা বলবে ?

—ছেড়ে দাও কথা। জাতে বাম্ভণ, আমি ছোট জাত—তা বলে বলুক।

—আঃ ভারি আমার বাম্ভণ। কই, এমনি মুখে মুখে বেঁধে গান করুক দেখি, একবার দেখি! উত্তেজনায ঠাকুরঝির মাথার কাপড় খসিয়া গেল।

নিতাই মুগ্ধ কণ্ঠে বলিযা উঠিল, বা-বা-বা! ভারি মানিযাছে তো ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝির রুক্ষ কালো চুলের এলো খোঁপায একটি টকটকে রাঙা জবাফুল। লজ্জায় মেযেটি সচকিতা হরিণীর মত ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে খসিযা-পড়া ঘোমটাখানি মাথায় তুলিযা দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নিতাই একটা কাণ্ড করিযা বসিল, সে খপ করিযা হাতখানি ধরিয়া বাধা দিযা বলিল—দেখি! দেখি! বা-বা-বা!

মেয়েটি লজ্জায় কাঁদ কাঁদ হইয়া গেল, বলিল—ছাড়ো।

মুহূর্ত্তে নিতাইয়ের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে তাহাকে ছাড়িযা দিল। ছাডা পাইযা সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি চায়ের বাটিটা হাতে নতমুখে ছুটিয়া পলাইযা গেল—বাটিটা ধুইবার অজুহাতে। নিতাই লজ্জিত স্তব্ধ হইযা নতমুখে বসিয়া রহিল! ছি! ছি! ছি! চুপ করিয়াই সে বসিয়াছিল, সহসা ঠং শব্দে সে মুখ

তুলিযা দেখিল—ঠাকুরঝি বাটিটা নামাইয়া দিয়া আপনার ঘটীটি তুলিযা লইযা চলিযা যাইতেছে। সে মুখ ফিরাইযা চাহিল। সলজ্জ হাসিতে ঠাকুরঝির কাঁচা মুখখানি রৌদ্রের ছটায কচি পাতার মত ঝলমলে হইযা উঠিযাছে। চোখোচোখি হইতেই ঠাকুরঝি চট্ করিযা মুখ ফিরাইযা লইল, সেই বেগে তাহার আবার মাথার ঘোমটা খসিযা গেল। ঠাকুরঝি এবার ছুটিযা পলাইযা গেল, ঘোমটা তুলিযা না দিযাই ;—তাহার রুক্ষ কালো চুলে লাল জবা পরিপূর্ণ গৌরবে আকাশের তারার মত জ্বলিতেছে !

নাঃ, ঠাকুরঝি রাগ করে নাই। ওই যে, যাইতে যাইতে আবার ফিরিযা চাহিযা দেখিতেছে। কিন্তু কালো চুলে রাঙা জবা বড চমৎকার মানাইযাছে।

ঠাকুরঝি ক্রমে ক্রমে স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুলের মত ছোট হইযা পথের বাঁকে মিলাইযা গেল। নিতাই বসিযা আপন মনেই ঘাড় নাডিতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় কলিটাও তাহার মনে আসিযাছে।

"কালো কেশে রাঙা কোসম (কুসুম) হেরেছ কি নয়নে ?"

সাত

কালো কেশে রাঙা কুসুমের শোভা দেখিযা গান রচনা করিযা কবি হওযা চলে, কিন্তু ও শোভা দেখিতে দেখিতে পথ চলা চলে না। নিতাই সত্য সত্যই একবার হুঁচোট খাইল—বিষম হুঁচোট। পাযের বুডো আঙুলের নখটার চারিপাশ ফাটিযা রক্ত বাহির হইযা পডিল। সে ওই গানখানা ভাঁজিতে ভাঁজিতে চণ্ডীতলায চলিযাছিল ; নির্জ্জন পথ—বাঁ হাতখানি গালের উপর রাখিযা নিতাই বেশ উচ্চ কণ্ঠেই গান ধরিযা চলিযাছিল—মধ্যে মধ্যে ডান হাতের তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া যেন 'কালো চুলে রাঙা কুসুমের' শোভাটি দেখাইয়া দিতেছিল ; যেন দ্রুতপদে ঠাকুরঝি তাহার আগে আগেই চলিযাছে এবং তাহার রুক্ষ কালো চুলে রাঙা

জবাটি ঝকমক করিতেছে।

হঠাৎ আঙুলে হুঁচোট খাইয়া বেচারী বসিয়া পড়িল। দুর্ব্বল শরীরে চোট খাইয়া মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। এ কয়দিন নিতাই এখন একবেলা খাইতেছে। উপার্জ্জন নাই, পূর্ব্বের সঞ্চয় যাহা আছে, সে অতি সামান্য; সে সঞ্চয় হইতে আবার দোকান করিতে হইবে। সেই জন্য নিতাই একবেলা খাওয়া বন্ধ করিয়াছে; একেবারে অপরাহ্ণ বেলায় সে এখন কোনদিন রাঁধে পায়েস, কোনদিন খিচুড়ী। কথাটা সে রাজাকেও বলে নাই, ঠাকুরঝিকেও না। তাহারা জানিলে বিষম আপত্তি তুলিবে। রাজা হয়ত পাঁচ-সাতটা টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিবে—চালাও পানসী—বানাও খানা—ফিন্ দরকার হোনেসে দেগা। রাজার মত বন্ধু আর হয় না। এদিকে রাজা সত্য-সত্যই রাজা। বিপ্রপদ যে-সব নাম তাহাকে দিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি এখন নিতাইকে পীড়া দেয়, কেবল একটি ছাড়া—সে নামটি হইল সভাকবি, রাজার সভাকবি। রাজার কাছে কোন লজ্জাই তাহার নাই; কিন্তু রাজার স্ত্রী রাণী নয়, সে রাক্ষুসী। বাপ রে! মেয়েটার জিবে কি বিষ! সর্ব্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরাইয়া দেয়। মিলিটারী রাজা কঞ্চির আঘাতে মেয়েটার পিঠখানা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয়—তবু তাহার জিব বিষ ছড়াইতে ছাড়ে না; সে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদে আর অবিরাম গাল দিয়া চলে; মর্ম্মচ্ছেদী জ্বালা-ধরানো নিষ্ঠুর গালি-গালাজ। পৃথিবীর উপরেই তাহার আক্রোশ, মধ্যে মধ্যে ট্রেনকেও সে অভিসম্পাত দেয়; ট্রেনের সময় রাজা ডিউটি দিতে গেলে যদি তাহার রাজাকে প্রয়োজন হয়, তবে সে স্টেশন-মাস্টার হইতে গার্ড, ট্রেন, সকলকেই গালিগালাজ দিতে আরম্ভ করে। সেই গালিগালাজগুলি স্মরণ করিয়া নিতাই দুঃখের মধ্যেও হাসিয়া ফেলিল। রাজার বউয়ের গালিগালাজের বাঁধুনী বড় চমৎকার, কবিয়ালেরাও এমন চমৎকার বাঁধুনী বাঁধিয়া গালিগালাজ দিতে পারে না। কালই ট্রেনখানাকে অভিসম্পাত দিতেছিল—পুল ভেঙে প'ড়ে যমের বাড়ী যাও; যে আগুনের আঁচে 'হাঁকিড়ে' চলছ—এই আগুনের আঁচে অঙ্গ তোমার

গ'লে গ'লে পড়ুক! যে চাকায় গড়গড়িয়ে চলো সেই চাকা মড়মড়িয়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাক—যে চোঙার গলায় চিলের মত চেঁচাও সেই গলা চিরে চৌচির হোক। তুমি উল্‌টিয়ে পড়, পাল্‌টিয়ে পড়; নরকে যাও। বলিহারী বলিহারী! মহাদেবের আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাতা কোথায় লাগে ইহার কাছে!

রাজা অবসর পাইলেই নিতাইয়ের কাছে আসিয়া বসে, তাই তাহার আক্রোশ নিতাইয়ের উপর কিছু বেশী। রাজার অনুপস্থিতে নিতাইকে শুনাইয়া কোন অনামা ব্যক্তিকে গালিগালাজ করে। সে হাসে। রাজার আর্থিক সাহায্য আর কিছুতেই লওয়া চলিবে না। রাণী জানিতে পারিবেই, আর জানিতে পারিলে আর রক্ষা থাকিবে না। কালই একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, ঠাকুরঝির চা খাওয়া রাণী দেখিয়াছে। চা খাইতে খাইতে নিতাইয়ের রসিকতায় ঠাকুরঝি খিলখিল করিয়া হাসিতেছিল। রাজার বউ বোধ হয় কোথাও যাইতেছিল, হাসির শব্দে সে উঁকি মারিয়া দুইজনকে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গেই মুখ সরাইয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঠাকুরঝি বেচারী মুহূর্তে যেন শুকাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সঙ্গে নিতাইও। পরমুহূর্তেই বাড়ীর বাহিরে রাজার স্ত্রীর শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিয়াছিল—

"হাসিস্ না লো কালামুখী—আর হাসিস্ না,
লাজে মরি গলায় দড়ি—লাজ বাসিস্ না!"

ঠাকুরঝির আর চা খাওয়া হয় নাই, চা জুড়াইয়া গিয়াছিল, জুড়ানো চা রাখিয়া সে এক ঘটী ঠাণ্ডা জল খাইয়া তবে সে বাড়ী ফিরিয়াছিল।

হুঁচোটের ধাক্কাটা সামলাইয়া নিতাই কোনমতে চণ্ডীতলায় আসিয়া উঠিল। চণ্ডীমাকে প্রণাম করিয়া সে মোহন্তের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল।

মোহন্ত সস্নেহেই বলিলেন—এস, কবিয়াল নিতাইচরণ এস।

নিতাই কৃতার্থ হইয়া গেল। সে মোহন্তকে প্রণাম করিল।

—জয়োস্তু! তারপর, সংবাদ কি?

—আজ্ঞে প্রভু, আমাকে মেডেল দোব বলেছিলেন।

—মেডেল!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা, সে হবে। পাবে। মোহন্ত অকস্মাৎ উদাসীন হইয়া উঠিলেন। সহসা চণ্ডীদেবতার মহিমা উপলব্ধি করিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া উঠিলেন—কালী কৈবল্যদায়িনী মা!

নিতাই চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল; এমন ভাবাবেশের মধ্যে মোহন্তকে আর বিরক্ত করিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পর ওদিকে চণ্ডীর দাওয়ার উপর একটা শব্দ উঠিল—ঠং।

মোহন্ত মুহূর্তে উঠিয়া পড়িলেন। ওদিকে চণ্ডীমায়ের মন্দিরে যাত্রী আসিয়াছে, পয়সা কি টাকা কিছু প্রণামী ছুঁড়িয়াছে।

মোহন্ত ফিরিয়া আসিতেই নিতাই সুযোগ পাইয়া আবার হাত জোড় করিয়া বলিল—বাবা!

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া মোহন্ত বলিলেন—বলেছি তো, পরে হবে। আসছে বার মেলার সময়, সমস্ত লোকের সামনে মেডেল দেওয়া হবে।

নিতাই অত্যন্ত বিনয় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, বিদায় কিছু দেবেন না?

—বিদায়! টাকা?

—আজ্ঞে।

মোহন্ত সকৌতুকে কিছুক্ষণ নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সে দৃষ্টির সম্মুখে নিতাইয়ের অস্বস্তির আর সীমা রহিল না। অকস্মাৎ মোহন্ত কথা বলিলেন—ভালা রে ময়না; ভাল বুলি শিখেছিস তো! টাকা! মায়ের স্থানে টাকা! গান গাইতে পেয়েছিস সেইটে ভাগ্যি মানিস না!

মোহন্তের কণ্ঠস্বরে যেন চাবুকের ধার ছিল; সে আঘাতে নিতাই চমকিয়া উঠিল। লজ্জার আর সীমা রহিল না তার। সত্যই তো—গান গাহিতে পাইয়া সে-ই তো ধন্য হইয়া গিয়াছে। আবার টাকা চায় কোন্ মুখে!

কোন কথা না বলিয়া সে একরকম ছুটিয়া পলাইয়া আসিল। ফিরিবার পথে কিন্তু অকস্মাৎ তাহার চোখে জল আসিল। মহাদেব কবিয়ালের ছড়াটা মনে পড়িল—সেদিন গানের আসরে মহাদেব বলিয়াছিল, 'আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!' ঠিক কথা, কবিয়াল,—আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা স্বর্গে যায় না, যাইতে পারে না। কবিয়াল মহাদেব হাজার হইলেও গুণী লোক, সে ঠিক কথাই বলিয়াছে। তাহার কবি হওয়ার আশা আর আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতার স্বর্গে যাইবার আশা—এ দুই-ই সমান।

অকস্মাৎ আপন মনেই সে পরিস্ফুট কণ্ঠে বলিযা উঠিল—দূ-রো! অর্থাৎ কবিযালত্বকে সে দূর করিয়া দিল। আবার সে এই বারোটার ট্রেন হইতেই 'মোটবহন' আরম্ভ করিবে, বিপ্রপদ ঠাট্টা করিবে, তা করুক। কবিযাল হইয়া তাহার প্রযোজন নাই। সে মনকে বেশ খোলসা করিযাই সকৌতুকে গান ধরিল, মহাদেবের সেই গানটি—

আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!
ফরাৎ ক'রে উড়ল পাতা—স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!
হায়রে কলি—কিই বা বলি—গরুড় হবেন মশা গো।

খানিকটা আসিয়াই তাহার কানে আসিযা ঢুকিল একটা শব্দ। ট্রেন আসিতেছে, নয়? হ্যাঁ! সঙ্গে সঙ্গে চলার গতি সে দ্রুততর করিল। রাজা এতক্ষণে স্টেশনে গিয়া হাজির হইয়াছে। সিগন্যাল ফেলিবে, ট্রেনের ঘণ্টা দিবে। ঠাকুরঝি বোধ হয—তালাবন্ধ ঘরের সম্মুখে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! সে তো আজ কিছুতেই রাজার বাড়ী যাইবে না। কাল ছড়ার মধ্যে যে কুৎসিত ইঙ্গিত রাজার স্ত্রী করিয়াছে! সে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে যখন স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, ট্রেনখানা তখন বিসর্পিল গতিতে সবে স্টেশন হইতে বাহির হইযা যাইতেছে। নিতাই হতাশ হইয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিযা দাঁড়াইযা গেল। রোজগার ফসকাইয়া গেল, ঠাকুরঝি চলিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ কানে আসিল কাহার ডাক—নিতাই।

স্টেশনের স্টলে দাঁড়াইয়া বণিক মাতুল তাহাকে দেখিয়া উৎসুক হইয়া ডাকিতেছে—নিতাই, নিতাই!

বাতে ব 'ড়ষ্ট বিপ্রপদ বহুকষ্টে দেহসমেত ঘাড়খানা ঘুরাইয়া হাসিতেছে,—সেও ডাকিতেছে,—কপিবর, কপিবর!

নিতাই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। একটা কঠিন উত্তর দিবার জন্যই সে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বণিক মাতুল কিন্তু বেশ খানিকটা খুশী সুরেই বলিল—নাঃ, সত্যিকারের গুণীন আমাদের নিতাই। ওরে তোর কাছে যে লোক পাঠিয়েছে মহাদেব কবিয়াল। বায়না আছে কোথায়! গাওনা করতে হবে।

অপ্রত্যাশিত সংবাদে নিতাই হতবাক হইয়া গেল।

মহাদেব কবিয়াল তাহার কাছে লোক পাঠাইযাছে! বায়না আছে। অকস্মাৎ তাহার সে বিস্ময়-বিমূঢ়তা কাটিল রাজনের চীৎকারে। উচ্ছ্বসিত আনন্দে রাজন প্রায় গগনস্পর্শী চীৎকার করিযা উঠিল!

—ওস্তাদ। ওস্তাদ!

রাজনের সঙ্গে একজন লোক। মহাদেবের দোয়ারের দলের একজন দোয়ার। এই মেলার আসরেই সে গান করিযা গিযাছে। নিতাই তাহাকে চিনিল।

—বায়না, ওস্তাদ, বাযনা আযা হ্যায়! রাজা আবার উচ্ছ্বসিত হইযা উঠিল।

লোকটি নিতাইকে নমস্কার করিয়া বলিল—ভাল আছেন?

এতক্ষণে নিতাই প্রতিনমস্কার করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের কুশল? ওস্তাদ ভাল আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনিই পাঠালেন আপনাদের কাছে। একটা বায়না ধরেছেন ওস্তাদ, আপনাকে দলে দোয়ারকি করতে হবে।

রাজা বলিল—জরুর আলবৎ যাযেগা! চলিয়ে তো বাসামে, বাতচিৎ হোগা, চা খায়েগা।

নিতাই রাজার কথাকেই অনুসরণ করিল, অ।ন্ন তাহার সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে। মহাদেব কবিয়াল তাহার কাছে লে।ক পাঠাইয়াছে—বায়না আছে! সেও বলিল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—নিশ্চয় যাব, নিশ্চয়। আসুন, বাসায় চা খেতে খেতে কথা হ'ব।

বাসার দুয়ারে আসিয়া নিতাই আশ্চর্য্য হইয়া গেল, একটি ঝোপের আড়ালে—কৃষ্ণচূড়াগাছটির ছায়াতলে, ও কে বসিয়া?

ঠাকুরঝি!

উৎসুক উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিয়াই ঠাকুরঝি লজ্জায় যেন কেমন হইয়া গেল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া বেশ ধীর ভাবেই বলিল —কোথা গিয়েছিলে বাপু, আমি দুধ নিয়ে ব'সে আসি সেই থেকে।

নিতাই বলিল—কাল একটুকু সকাল ক'রে দুধ এনো বাপু। কাল বারোটায় আমি কবি গাইতে যাব। তার আগেই যেন—

রাজা কথাটা সংক্ষিপ্ত করিয়া দিল—হাঁ, হাঁ, ঠিক আওয়েগা; ঘড়িকে কাঁটাকে মাফিক আতা হামারা ঠাকুরঝি। আজ রাজাও ঠাকুরঝির উপর খুশী হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরঝির মুখখানিও সেই খুশীর প্রতিচ্ছটায় মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ঠাকুরঝি যেন কাজল দীঘির জল! ছটা ছড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঝিকমিক করিয়া উঠে; মেঘ উঠিলে আঁধার হয়—কে যেন কালি গুলিয়া দেয়!

ঠাকুরঝি সেই খুশীর ছটামাখা মুখে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল। কবি-গান গাইতে যাবা কবিয়াল।

কবিগান করিয়া নিতাই ফিরিল পাঁচদিন পর। ওই স্টেশনে ট্রেন হইতে সে নামিল, তাহার পায়ে সাদা ক্যাম্বিশের একজোড়া নূতন জুতা, ময়লা কাপড়-জামার উপর ধপধপে সাদা নূতন একখানা উড়ানি চাদর। মুখে মৃদুমন্দ হাসি—কিন্তু বিনয়ে অত্যন্ত মোলায়েম। ট্রেনে সারা পথটা সে কল্পনা করিতে করিতে আসিতেছে, স্টেশন-মাস্টার হইতে সকলেই তাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় বিস্মিত

শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্ভাষণ করিয়া উঠিবে।

—এই যে নিতাই! আরে বাপ রে, চাদর জুতো! এই যে, বাপ রে, তোকে চেনাই যায় না রে!

উত্তর নিতাই ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল।

—আজ্ঞে, চাদরখানা বাবুরা শিরোপা দিলেন। আর জুতো জোড়াটা কিনলাম।

শিরোপার কথাটা অবশ্য মিথ্যা; জুতা-চাদর দুইই নিতাই নগদমূল্যে খরিদ করিয়াছে! গেরুয়া না পরিলে সন্ন্যাসী বলিয়া কেহ স্বীকার করে না, 'ভেক নহিলে ভিখ মিলে না'; চাদর না হইলে কবিয়ালকে মানায় না; নগ্নপদ জনের পদবী স্বীকার করিতে মানুষ সহজে চায় না। তাই নিতাই জুতা ও চাদর কিনিয়াছে। স্টেশনে নামিয়া প্রত্যাশাভরে মুখ ভরিয়া বিনীত অথচ আত্মপ্রসাদপূর্ণ হাসি হাসিয়া সে সকলের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াও যেন তাহাকে কেহ দেখিল না; সম্ভাষণ দূরের কথা, কেহ কোনও প্রশ্নও করিল না। যে প্রশ্ন করিবার, সে তখন ইঞ্জিনের কাছে কর্ত্তব্যে ব্যস্ত। মালগাড়ী শান্টিং হইবে; গাড়ী কাটিয়া রাজা ইঞ্জিনে চড়িয়া হাঁক মারিতেছিল—এই! হট যাও, এই—এই বুড়বক! হটো—হটো!

নিতাইয়ের মনটা উদাস হইয়া গেল। মানুষ বৈরাগ্যভরে যেমন জনতাকে জনবসতিকে পাশ কাটাইয়া পথ ছাড়িয়া আপথে সকলের অলক্ষিত অগোচরে চলিয়া যায়, তেমনি ভাবেই সে স্টেশনের মেহেদীর বেড়ার পাশের অপরিচ্ছন্ন স্থানটা দিয়া স্টেশন অতিক্রম করিয়া আসিয়া উঠিল আপনার বাসার দুয়ারে। মনটা তাহার মুহূর্ত্তে উদাস হইয়া গিয়াছে; শুধু মনই নয় সারা দেহে সে যেন গভীর অবসন্নতা অনুভব করিতেছে।

হঠাৎ কানে ঢুকিল—গুন্‌গুন্ সুর।

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?'—গুনগুন করিয়া অতি মৃদুস্বরে কে গান গাহিতেছে! ওই ঝোপটার আড়ালে—কৃষ্ণচূড়াগাছটির তলায়।

মুহূর্ত্তে ভাটার নদীতে যেন ষাড়াষাঁড়ির বান ডাকিয়া গেল। ঠাকুরঝি! তাহারই বাঁধা গান গাহিতেছে ঠাকুরঝি। রবার-সোল ক্যাম্বিশের জুতা পায়ে নিঃশব্দে নিতাই আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া অনুরূপ মৃদুস্বরে গাহিল—'কালো কেশে রাঙা কোসোম হেরেছ কি নয়নে?'

ঠাকুরঝি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল সচকিত বন্য কুরঙ্গীর মত।—বাবা রে! কে গো?

পরমুহূর্ত্তেই সে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল।—কবিয়াল!

নিতাইয়ের মুখ ভরিয়া আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল, পরম স্নেহভরে সে ভক্ত অনুরাগিনীটিকে বলিল—এস, চা খেতে হবে একটুকুন!

নিতাই চাদরখানি গলা হইতে খুলিয়া রাখিতে গেল, কিন্তু বাধা দিয়া ঠাকুরঝি বলিল—খুলো না, খুলো না; দাঁড়াও দেখি ভাল ক'রে!

ভাল করিয়া দেখিয়া ঠাকুরঝি বলিল—আচ্ছা সাজ হইছে বাপু। ঠিক কবিয়াল কবিয়াল লাগছে। ভারি সোন্দর দেখাইছে।

নিতাই বলিল—বাবুরা শিরোপা দিলে চাদরখানা।

—ম্যাডেল? ম্যাডেল দেয় নাই?

—সে আসছে বার দেবে। মেডেল কি দোকানে তৈরী থাকে ঠাকুরঝি!

—তা চাদরখানাও আচ্ছা হইছে। খুব গাযেন করেছ তুমি, . ?

—খুব। 'কালো যদি মন্দ তবে' গানখানাও গেযে দিয়েছি।

কালো মেয়েটির মুখ কেমন হইযা উঠিল; চোখের পাতা দুইটি অসম্ভব রকমের ভারী হইযা উঠিযাছে! নত চোখে সে বলিল—না বাপু; ছি! কি ধারার নোক তুমি?

নিতাই হাসিযা বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে।

—কি?

—চোখ বোজ দেখি। তা নইলে হবে না।

—কেনে?

—আঃ, বোজই না কেনে চোখ। তারপর চোখ খুললেই দেখতে পাবে।

ঠাকুরঝি চোখ বন্ধ করিল; কিন্তু তবু সে তাহারই মধ্যে মিটিমিটি চাহিয়া দেখিতেছিল। নিতাই পকেটে হাত পুরিয়াছে।

—উ কি, তুমি দেখছ! নিতাই ঠাকুরঝির চাতুরী ধরিয়া ফেলিল। বোজ-খুব শক্ত করে চোখ বোজ।

পরক্ষণেই ঠাকুরঝি অনুভব করিল তাহার গলায় কি যেন ঝুপ করিয়া পড়িল। কি? চকিতে চোখ খুলিয়া ঠাকুরঝি দেখিল, সুতার মত মিহি, সোনার মত ঝকমকে একগাছি সূতা-হার তাহার গলায় তখনও মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

ঠাকুরঝি বিস্ময়ে আনন্দে যেন অবশ নির্ব্বাক হইয়া গেল।

—সোনার?

—না, সোনার নয়, কেমিকেলের।

না হোক সোনার, তবু ঠাকুরঝির আনন্দ কম হইল না। বুকের ভিতরটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, বসন্তদিনে দুপুরের বাতাসে অশ্বত্থগাছের নূতন কচি পাতার মত।

—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

রাজা আসিতেছে; ট্রেনখানা চলিয়া গিয়াছে, ডিউটি সারিয়া রাজা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্ম হইতেই হাঁকিতে হাঁকিতে আসিতেছে।

ঠাকুরঝি চমকিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও চকিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে ঠাকুরঝি গলার সূতা-হারখানি খুলিয়া ফেলিল। শঙ্কিত চাপা গলায় বলিল—জামাই আসছে।

নিতাইও যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল—তা হ'লে?

পরমুহূর্ত্তেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখনও তাহার গলায় চাদর, পায়ে জুতা। খানিকটা আগাইয়া গিয়াই সে সবিনয়ে রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল—রাজন, আপনার পুরীর কুশল তো?

রাজার চোখ বিস্ময়ে আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আরে, বাপ রে, বাপ রে! গলামে চাদর—। বাধা দিয়া নিতাই বলিল—শিরোপা।

—শিরোপা!

—হাঁ। বাবুরা গান শুনে খুশী হয়ে দিলেন।

—হাঁ?

—হাঁ।

—আরে, বাপ রে, বাপ রে! রাজা নিতাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, তারপর বলিল—আও ভাই কবিয়াল, আও।

—কোথায়?

—আরে, আও না! সে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল বণিক মাতুলের চায়ের দোকানে।

—মামা! বনাও চা। লে আও মিঠাই।

বেনে মামাও অবাক হইয়া গেল নিতাইয়ের পোশাক দেখিয়া। রাতে-পঙ্গু বিপ্রপদ অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল,—আড়ষ্ট দেহখানাকে টানিয়া সে ফিরিয়া চাহিল, তাহারও চোখে রাজ্যের বিস্ময় জমিয়া উঠিল।

নিতাই সবিনয়ে বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া আজ কতদিন পরে [illegible]প করিয়া টানিয়া লইল। তারপরে সবিনয়ে হাসিয়া বলিল—চাদরখানা বাবুরা শিরোপা দিলেন প্রভু।

বেনে মামা বলিল—আমাদিগে কিন্তু সন্দেশ খাওয়াতে হবে নিতাই।

—নিশ্চয়। খাও না মাতুল, সন্দেশ তো তোমার দোকানেই। দাম দেব।

—নেহি, হাম দেঙ্গে দাম। বানাও ঠোঙ্গা। কাঠের একটা প্যাকিং-বাক্স টানিয়া রাজা চাপিয়া বসিল, নিতাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া পাশের জায়গায় বসাইয়া দিয়া বলিল—বইঠ্ যাও।

এতক্ষণে বিপ্রপদ কথা বলিল, সে আজ আর রসিকতা করিল না, ঠাট্টাও করিল না, সপ্রশংস এবং সহৃদয় ভাবেই বলি[illegible]—তারপর গাওনা কি রকম

হ'ল বল দেখি নিতাই ?

নিতাই উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বিপ্রপদকে স আজ জং করিয়াছে। ইহার অপেক্ষা বড় কিছু সে কল্পনা বা কামনা করিতে পারে না। স আবার একবার বিপ্রপদের পদধুলি লইয়া জোড়হাত করিয়া বলিল—আজ্ঞে প্রভু, গাওনা আপনার চরম। দু'দিকে দুই বাঘা কবিয়াল—এ বলে আমাকে দেখ ও বলে আমাকে দেখ, একদিকে ছিষ্টিধর, অন্যদিকে মহাদেব। লোকে লোকারণ্যি। আর মেলাও তেমনি।

বেনে মামা ঠোঙায় মিষ্টি ভরিয়া হাতে হাতে দিয়া বলিল—খেতে খেতে গল্প হোক। খেতে খেতে। সকলকে ঠোঙা দিয়া সে নিতাইয়ের ঠোঙাটি অগ্রসর করিয়া ধরিল। কিন্তু নিতাইয়ের অবসর নাই—কথার সঙ্গে তাহার হাত দুইটিও নানা ভঙ্গিতে নড়িতেছে।

বিপ্রপদ এতক্ষণে সহজ হইয়া উঠিয়াছে, সে চট করিয়া বেনে মামার হাত হইতে ঠোঙাটি লইয়া ধমক দিয়া উঠিল—ভাগ বেটা বেরসিক কাঁহাকা। কবিরা সন্দেশ খায় কোন্ কালে ? কবিরা চাঁদের আলো খায়, ফুলের মধু খায়, কোকিলের গান খায় তারপর নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিল—হ্যাঁ, তারপর নিতাইচরণ ? একদিকে ছিষ্টিধর, একদিকে মহাদেব। লোকে লোকারণ্যি। তারপর ?

নিতাইয়ের উৎসাহ কিন্তু ইহাতে দমিত হইল না। সে সমান উৎসাহেই বলিয়া গেল—একদিন, বুঝলে প্রভু, মহাদেবের নেশাটা খানিকটা বেশী হয়ে গিয়েছিল। সেদিন—মহাদেব হয়েছে কেষ্ট, ছিষ্টিধর রাধা। ছিষ্টিধর তো ধুয়ো ধরলে—"কালো টিকেয় আগুন লেগেছে—তোরা দেখে যা গো সাধের কালাচাঁদ।" গালাগালির চরম করে গেল। ওদিকে মহাদেব তখন বমি করছে। দোয়াররা সব মাথায় জল ঢালছে। আমি সেই ফাঁকে এসে ধরে দিলাম ধুয়ো—"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে ?" বাস, বুঝলেন প্রভু, বাবুভাই থেকে আরম্ভ করে একেবারে 'বলিহারি, বলিহারি' রব উঠল। সঙ্গে

সঙ্গে শিরোপা এই চাদর।

কথাটা সত্য। নিতাই ধুয়াটা করিয়াছিল এবং লোকে সত্যই ভাল বলিয়াছে, কিন্তু শিরোপার কথাটা ঠিক নয়।

তবে শিরোপা পাইলে অন্যায় হইত না। নিতাই মেলায় গাওনা করিয়াছে ভালো। তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং বিচিত্র বিচার-দৃষ্টি একটা নূতন স্বাদের সৃষ্টি করিয়াছিল। সত্যই তো—কালো যদি মন্দই হইবে—তবে কালো চুলে সাদা রঙ ধরিলে—মন উদাস হইয়া ওঠে কেন? নিতাই বারবার এই প্রশ্নটির জবাব চাহিয়াছিল। ছিষ্টিধর খ্যাতিমান কবিয়াল—সে মানুষকে জানে এবং চেনে—সে এ প্রশ্নের জবাব রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল। গাহিয়াছিল—

> "কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদি ক্যানে?
> কাঁদি না রে! কাঁদি না রে! কলপ মাখি!
> কলপ মাখি,—না হয়, বউ তুলে দেয় হ্যাঁচকা টেনে।"

লোকে খুব হাসিয়াছিল বটে কিন্তু ওই অদ্ভুত প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত সকরুণ বিষণ্ণ তত্ত্বটি কাহারও মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। পালা শেষের পর দুজন পরস্পরের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিয়া প্রশ্ন করিয়াছে—

> "কালো যদি মন্দ তবে—কেশ পাকিলে কাঁদো ক্যানে?"

পরের দিনের আসরে নিতাইকে মহাদেব ইচ্ছা করিয়াই ছিষ্টিধরের মুখের কাছে আগাইয়া দিয়াছিল। সে দিন ছিষ্টিধর দ্রোণ, মহাদেব একলব্য। আগের দিন প্রচুর বমি করিয়া মহাদেবের শরীরও ভাল ছিল না, গলাটাও বসিয়া গিয়াছিল। এবং ছিষ্টিধরের কাছে হারের ভয়ও ছিল। তাই সম্বন্ধ পাতাইবার পর মহাদেব উঠিয়া আসর বন্দনা করিয়া বলিয়াছিল—

> আমার চুল পেকেছে দাঁত ভেঙেছে বয়স আমার অনেক হলো—
> ব্যাধের ব্যাটা একলব্য বয়স তাহার বছর ষোলো;

আমাকে কি মানায় তাই ? তাই হে দ্রোণ মোর বক্তব্য
একলব্যের বাবা আমি নিতাই হল একলব্য।
বলি—মানাবে ভা ' হে !

ইহার উত্তরে ছিষ্টিধর উঠিয়া প্রথমেই কপালে চাপড় মারিয়া গাহিয়াছিল—

—টাকা কড়ি চাই নে কো মা—তোর দণ্ড সাজা ফিরিয়ে নে
হায় মহিষের কৈলে বাছুব বধের হুকুম ফিরিয়ে নে।
নিজে বধলি মহিষাসুরে—
ছানাটাকে দিলি ছেড়ে—
আমায় বলিস বধতে তাবে এ আজ্ঞে মা ফিরিয়ে নে।

তাহার পব মহাদেব এবং নিতাইকে জড়াইয়া গালাগালির আর আদি অন্ত রাখে নাই ছিষ্টিধর। মূল সুর তাহার ওই। নিতাই যদি মহাদেবের পুত্র হয তবে তাহারা অন্ত্যজ ব্যাধও নয়, তাহারা অসুর ; মহাদেব ব্যাটা মহিষাসুব আর নিতাইটা মহিষাসুরের বাচ্চা।

—হায অসুরের শ্বশুরবাড়ীর ঠিক ঠিকানা নাই—
গরুর পেটে হয নামড়া
গাযে তাহার বাঘের চামড়া
বিধাতা সে অধোবদন—এ ব্যাটা ঠিক তাই।

সে যেন নিষ্ঠুর আক্রোশে কোপাইয়া কুচি কুচি করিয়া কাটা। মহাদেবও অধোবদন হইয়াছিল। ভাঙা গলা লইয়া জবাব দিবার তাহার উপায় ছিল না। কিন্তু নিতাই দমে নাই। সে উঠিয়া গান ধরিয়া দিযাছিল অকুতোভযে। তাহাব আর হার-জিতের ভয় কি ? সে গান ধরিয়াছিল—

ভাণ্ড পুত্ত দ্রোণ ব্রাহ্মণ তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হে !

—মহাশযগণ আ 'কে উনি জন্তু পুত্ত বলে গাল দিলেন। কিন্তু ওঁর জন্ম ভাণ্ডে—মাটির কলসীতে।

নারিকেলে নিন্দে করেন—ও কষুটে গুবাক হে !

—মানে সুপুরী। মশায় সুপুরী।

কিন্তু আর জোগায় নাই। ইহার পর সে উল্টা পথ ধরিয়াছিল। নিজেই হার মানিয়া লইয়া—মারখাওয়ার লজ্জাকে লঘু করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ছড়া ধরিয়াছিল—

বামুন প্রধান ওহে দ্রোণাচায্য
গুরু, হয়ে তোমার এ কি অন্যায় কায্য
আমি একলব্য নহি সভ্য ভব্য
না হয় ব্যাধের ছেলে বনে আমার রাজ্য
কিন্তু তোমার শিষ্য কহি সত্য ন্যায্য।
দেশের সাক্ষাতে —পা নিলাম মাথাতে—

বলিয়াই ছিষ্টিধরের পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিয়াছিল—এখন রণং দেহি হারজিত হোক গ্রাহ্য। এবং একেবারে শেষ পালাতে হারিয়া নাস্তানাবুদ হইয়া সে হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল—

পভুগণ! শুনুন নিবেদন!
আমি হেরেছি হেরেছি সত্য এ বচন।
হেরেই কিন্তু হয় সার্থক জীবন।

ছিষ্টিধর বলিয়া উঠিয়াছিল—নিশ্চয় নিশ্চয়। তাহার কারণ,—

মুণ্ডু কাটা যায় ধুলাতে গড়ায়
জিব বাহির হয় উল্টায় নয়ন।

এবং নিজেই জিব বাহির করিয়া চোখ উল্টাইয়া ভঙ্গি করিয়া অবস্থাটা প্রকট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল। লোকে হো-হো করিয়া হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িয়াছিল। নিতাই এই হাসির রোলের উপরেও এক তান ছাড়িয়াছিল—

—আ—আহা—

তাহার সুস্বরের সেই সুর-বিস্তার মুহূর্তে সকলের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া

তাহাদের কৌতুক উচ্ছ্বাসকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল। বর্ষার জলো হাওয়ার মাতামাতির উপর ছড়াইয়া পড়া গুরুগম্ভীর জলভরা মেঘের ডাকের মত বলিলে অন্যায় বলা হইবে না, কারণ নিতাইয়ের গলাখানি তেমনিই বটে। এবং গান ধরিয়া দিয়াছিল। খাঁটী গান। আপনার মনে অনেক সময় সে অনেক গান বাঁধে—গায়। তাহারই একখানি গান।

আহা—ভালবেসে—এই বুঝেছি

সুখের সার সে চোখের জলে রে—

তুমি হাস—আমি কাঁদি

বাঁশী বাজুক কদম তলে রে!

আমি নিব সব কলঙ্ক তুমি আমার হবে রাজা

(হার মানিলাম) হার মানিলাম

তুলিয়ে দিয়ে জয়ের মালা তোমার গলে হে!

ওই কয়টা লাইনই। তাহার পর আর ছিল না। কিন্তু উহাতেই আসরময় বাহবা পড়িয়া গিয়াছিল।

ছিষ্টিধর বলিয়াছিল—তোর এমন গলা নিতাই—তুই যাত্রার দলে টলে যাস না কেন? কবিগান করে কি করবি?

নিতাই আবার তাহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিয়াছিল—সে তো পরের গান গাইতে হবে ওস্তাদ!

সবিস্ময়ে ছিষ্টিধর প্রশ্ন করিয়াছিল—এ তোর গান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ওস্তাদ।

ছিষ্টিধর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল—তাহার পর বলিয়াছিল—হবে, তোর হবে। কিন্তু—।

—কিন্তু কি ওস্তাদ?

—কবিয়ালিও ঠিক তোর পথ নয়। বুঝলি! কিন্তু তু ছাড়িস না। ভগবান তোকে মূলধন দিয়েছেন। খোয়াস না। বুঝলি!

নিশানা ঝিকমিক করিয়া উঠে।—সেই কথাগুলিই সাজাইয়া গুছাইয়া সুর দিয়া গুন গুন করিতে লাগিল আপন মনেই—

"ও-আমার মনের মানুষ গো!
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর!
পথের পরে ঝিকিমিকি তোমার নিশানা চোখে আমার ভাসে নিরন্তর।"

ঘর বাঁধিয়া অহরহ দাওয়ায় বসিয়া চাহিয়া থাকিবে। ঘর হইতে ঠাকুরঝি বাহির হইলেই তাহার মাথার ঘটি—কাঁখের ঘড়ার ঝিলিক আসিয়া চোখে লাগিবে। গান বাঁধিয়া সে সুরে ভাঁজিতে লাগিল—

ও-আমার মনের মানুষ গো!

আট

পথের ধারে ঘরের বদলে কুলি-ব্যারাকেই নিতাই দিবাস্বপ্ন রচনা সুরু করিল। গান গাহিয়া সে টাকা পাইয়াছে। আর ভাবনা কি? ট্রেনভাড়া সমেত নিতাই পাইয়াছিল ছয়টি টাকা। কিন্তু ট্রেনভাড়া তাহার লাগে নাই। এই ব্রাঞ্চ লাইনটিতে নিতাই অনেকদিন কুলিগিরি করিয়াছে—গার্ড, ড্রাইভার, চেকার সকলেই তাহাকে চেনে, রাজার জন্য তাহাকে সকলেই ভাল করিয়াই চেনে, সেইজন্য ট্রেনভাড়াটা তাহার লাগে নাই, ছয়টা টাকাই বাঁচিয়াছিল! জুতা চৌদ্দ আনা, চাদর বারো আনা, দেশলাই বিড়ি আনা দুইয়েক—এই এক টাকা বারো আনা বাদে চার টাকা চার আনা সম্বল লইয়া নিতাই ফিরিয়াছে। প্রত্যাশা আছে, আবার শীঘ্রই দুই-একটা বায়না আসিবে। নিতাইয়ের ধারণা, যাহারা তাহার গান শুনিয়াছে তাহাদের মুখে মুখে তাহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে—

—"নতুন একটি ছোকরা, মহাদেবের দলে দোয়ারকি করছিল, দেখেছ?

—হ্যাঁ! ভাল ছোকরা। বেড়ে মিষ্টি গলা।

—উঁহু। শুধু গলাই মিষ্টি নয়, কবিয়ালও ভাল। এবার মহাদেবের মান রেখেছে ওই। মহাদেব তো বেহুঁশ, ও-ই গান ধরলে—'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে বাদ ক্যানে'। তা..তেই স্ব সর একেবারে গরম হয়ে উঠল! দাও জবাব—কালো যদি খারাপ তবে কালো চুলের এত গরব কেন? এত ভালবাস কেন? পাকলেই বা মন খারাপ কেন?

—বল কি। ওই ছোকরার বাঁধা গান ওটা?

হ্যাঁ।

—তা হ'লে আমাদের মেলাতে ওই ছোকরাকেই আন।"

নিতাই মনে মনে নিজের দরও ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। মহাদেব আট টাকা লইয়া থাকে, ছিষ্টিধর দশটাকা; নিতাই পাঁচ টাকা হাঁকিবে, চার টাকায় রাজী হইবে। একজন ঢুলী চাই। রাজনের ছেলেটাকে দিয়ে কাঁসী বাজানোর কাজ দিব্য চলিবে। এবার সে আরও ভালো গান বাঁধিয়াছে। সুরও হইয়াছে তেমনি। 'ও-আমার মনের মানুষ গো—তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর; পথের পরে ঝিকিমিকি তোমার নিশানা চোখে আমার ভাসে নিরন্তর।' ইহাতেই মাত হইয়া যাইবে। একবার সুযোগ পাইলে হয়। মুস্কিল এইখানেই। কবির পালায় এমন গান গাহিবার সুযোগ সহজে মেলে না। তবুও আশা সে রাখে। এই কারণেই ঢং ঢং করিয়া ট্রেনের ঘণ্টা পড়িলেই সে তাড়াতাড়ি আসিয়া স্টেশনে বসে। ট্রেনের প্রতি যাত্রীটিকে সে লক্ষ্য করিয়া দেখে। মেলা-খেলা লইয়া যাহারা থাকে, তাহাদের চেহারার মধ্যে একটা বিশিষ্ট ছাপ আছে, নিতাই সেই ছাপ খুঁজিয়া ফেরে। কেবল যায় না বেলা বারোটার ট্রেনের সময়, ওই সময়টিতে আসে ঠাকুরঝি।

মাসখানেক পর।

সেদিন তাহার হাতের সম্বল আসিয়া ঠেকিল—একটি সিকিতে। তাহার মন অকস্মাৎ আবার ভাঙিয়া পড়িল। কোনরূপে আর চারিটা দিন চলিবে। তার

পর? আবার কি 'মোট বহন' করিতে হইবে? উপোস করিয়া মানুষ কয়দিন থাকিতে পারে? এদিকে ঠাকুরঝির কাছে দুধের দাম বাকী পড়িয়া যাইতেছে। দশ দিন আগে অবশ্য সব সে মিটাইয়া দিয়াছে; দশ দিনের দশ পোয়া দুধের দশ পয়সা বাকী। নিতাই স্থির করিল, আজই সে দুধের বোজে জবাব দিবে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে, রেল-লাইনের বাঁকের মুখে যেখানে লাইন দুইটা মিলিয়া এক হইযাছে বলিযা মনে হয, সেইখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ কবিযা সে দাঁড়াইয়া বহিল। আজই তার শেষ দাঁড়াইযা থাকা। ও-আমাব মনের মানুষ—গান আর শেষ হইল না, হইবেও না, আজ হইতে সে ভুলিযা যাইবে, আব গাহিবে না। ওইখানে ... এক সময় দেখা গেল, মাথায ঘটী—সাদা ধপধপে কাপড় পরা ঠাকুরঝিকে।

ঠাকুরঝিকে দেখিযাই নিতাই হাসিল।

ঠাকুরঝি বলিল—না বাপু, তুমি এমন ক'রে দাঁড়িযে থেকো না। নোকে কি বলবে বল দেখি?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিযা নিতাই বলিল—একটি কথা বলবার নেগে দাঁড়িযে আছি।

নিতাই এখন ভদ্রভাষায কথা বলিতে চেষ্টা করে, তাই ল-কারকে ন-কার কবিযা তুলিযাছে। লোহাকে বলে 'নোযা', নুচকে বলে নুচ লঙ্কা—নঙ্কা, লোক—নোক হওযা উঠিযাছে তাহার কাছে। রাজন, ঠাকুরঝি তাহার ভাষার এই মার্জ্জিত রূপের পরম ভক্ত।

নিতাইযের কথা শুনিযা ঠাকুরঝি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহাব মুখের দিকে চাহিযা রহিল। কি কথা? অকারণে মেযেটির বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মুহূর্ত্তে দ্রুত হইযা উঠিল।

নিতাই বলিল—অনেক দিন থেকেই বলব মনে করি, কিন্তুক—

একটু নীরব থাকিযা নিতাই বলিল—আর ভাই, দুধের পেয়োজন আমার হবে না।

ঠাকুবঝি কেমন হইযা গিযাছিল। তাহাব মুখেব শ্রী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পাববর্ত্তিত হইতেছিল। মুহূর্ত্তে সে মুখ বর্ষাব বসপবিপুষ্ট ঘন শ্যামপত্রশ্রীব মত, আবাব পব-মুহূর্ত্তেই সে মুখ শুকাইয়া হইযা উঠিতেছিল পাণ্ডুব হেমন্তশ্রীব মত। স হইতেছিল সম্পূর্ণভাবে তাহাব অজ্ঞাতসাবে। স নির্ব্বাক হইযা শুধু নিতাইযেব মুখেব দিকে চাহিযা দাঁড়াইযাছিল। নিতাইযেব কথাব শেষে তাহ ব মুখ এবার যে পাণ্ডুব হইযা গেল, তাহাব আব পবিবর্ত্তন ঘটি। না। অনেকক্ষণ পবে সে কথা বলিল—নিতাইযেব কথাটা সে কম্পিত কণ্ঠে যন যাচাই কবি। লইল—আব দুধ লেবে না?

—না।

—ক্যানে? কি দোষ কবলাম আমি? তাহাব চোখ দুইটি জলে ভবিযা উঠিল।

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ কবিযা বহিল, উত্তব দিবাব শক্তি তাহাবও ছিল না কোনরূপে নিজেকে সামলাইয়া লইযা বলিল—মিথ্যা কথা একেই মহাপাপ, তাব ওপব তোমাব নিকট মিথ্যা বললে পাপেব আমাব পবিসীমে থাকবে না। আমাব সামর্থ্যে কুলাইছে না ঠাকুবঝি।

একটা গভীব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিযা সে আবাব বলিল—দবিদ্র ছোটনোকেব কবি হওযা বড বেপদেব কথা ঠাকুবঝি।

কাতব অনুনযে ব্যগ্রতা কবিযা মেযেটি বলিযা উঠিল—তোমাকে পযসা দিতে লাগবে না ওস্তাদ। অকুণ্ঠিত আবেগে সে নিতাইযেব হাত দুইটি চাপিযা ধবিল।

নিতাই তাহাব মুখেব দিকে চাহিযা কিছুক্ষণ চুপ কবিযা থাকিল, তাবপব বলিল—না। জানতে পাবলে তোমাব স্বামী পেহাব কববে, শাশুডী তিবস্কাব কববে, ননদে গঞ্জনা দেবে—

ঠাকুবঝি প্রতিবাদ কবিযা উঠিল—না না না। ওগো, একটি গাই আমাব নিজেব আছে, আমি বাবার ঘব থেকে এনেছি, সেই গাইযেব দুধ আমি

তোমাকে দোব।

নিতাই চুপ করিয়া রহিল।

—লেবে না? কবিয়াল—? মেয়েটির কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, দৃষ্টি ফিরাইয়া নিতাই দেখিল, আবার তাহার চোখ দুইটিতে জল টলমল করিতেছে।

সান্ত্বনা দিবার জন্যই নিতাই মৃদু হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঝির মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিল। নিতাইয়ের মুখের হাসিকেই সে সম্মতি ধরিয়া লইয়াই উচ্ছ্বসিত পুলকে দ্রুত লঘুপদে নিতাইকে অতিক্রম করিয়া আসিয়া বাসার দুয়ার খুলিয়া ফেলিল। পরিচিত ঘরকন্না ঘাঁটিয়া পাত্র বাহির করিয়া দুধ ঢালিয়া দিয়া দ্রুততর পদে বাহির হইয়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

নিতাই ডাকিল—ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝির যেন শুনিবার অবসর নাই, তাহার যেন কত কাজ। গতিবেগ আরও একটু বাড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

তখন চলিয়া গেলেও ফিরিবার পথে সে আসিয়া বাসার বারান্দায় বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে বলিল—দাও, চা দাও। আমার নতুন কাপে দাও।

চায়ের কাপটি নামাইয়া দিয়া নিতাই বলিল—একটি কথা শুধাব ঠাকুরঝি?

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া ঠাকুরঝি বলিল— বল?

—আমাকে বিনি পয়সায় কেনে দুধ দেবে ঠাকুরঝি?

ঠাকুরঝি স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাই আবার প্রশ্ন করিল—কিসের লেগে?

—আমার মন।

—তোমার মন?

—হ্যাঁ। আমার মন। তারপর হাসিয়া মুখ তুলিয়া সে বলিল—তুমি যে কবিয়াল! কত বড় লোক! বলিয়াই সে চায়ের কাপটি ধুইবার অছিলায় বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া দেখিল, নিতাই হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হাতে দুইটি গাঢ় রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল। ফুল দুইটি আগাইয়া দিয়া নিতাই বলিল—নাও।

কবিয়ালের হাতে ফুল নিতে হয়।*

ঠাকুরঝি লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া বলিল—না।

—তবে আমিও দুধ নোব না।

ঠাকুর. । ক্ষিপ্রহাতে ফুল দুইটি টানিয়া এক রকম ছুটিয়াই পলাইয়া গেল।

নিতাই নূতন গানের কলি ভাঁজিতে বসিল। আজ আবার নূতন কলি মনে হইয়াছে। 'ও-আমার মনের মানুষ গো।' গানটির শুধু দু'কলি আছে আর নাই ; ও গানটি ভুলিবার সংকল্পই সে করিয়াছিল, কিন্তু বিধাতা দিলেন না ভুলিতে,—ঐ গানটিকে পুরা করিতে বসিল। বড় ভাল গান।

'ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা'—গুন গুন করিতে করিতেই সে একখানা কাঠ উনানে গুঁজিয়া দিল। ট্রেন চলিয়া গিয়াছে, ডিউটি শেষ করিয়া এইবার রাজন চা-চিনি লইয়া আসিবে, আবার একবার চা হইবে।

নূতন কলি আসিয়াছে। বড় ভাল কলি। নিতাই খুব খুশী হইয়া উঠিল।—আহা—"সেই ছটাতে ঘর পুড়িল পথ করিলাম সার।"

তাই বটে, পথই সে সার করিয়াছে। কিন্তু তার পর? হ্যাঁ—হইয়াছে। পাইয়াছে সে পাইয়াছে—সেই পথের চারিদিকেই বাঁশী বাজিতেছে—পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে দুঃখ নাই কষ্ট নাই।

"চারদিকে চার—বৃন্দাবনে বংশী বাজে কার?"

কার আবার? সেই ব্রজের বাঁশী! সেই বাঁশী যে চিরকাল বাজিতেছে। প্রেম হইলে তবে শোনা যায় নহিলে যায় না! সে শুনিয়াছে।

সে আজ স্পষ্ট অনুভব করিল—ঠাকুরঝিকে সে ভালবাসে।

ঠাকুরঝিও তাহাকে ভালবাসে।

গুন গুন করিয়া নিতাই আপন মনে আখর দিল—

"বংশী বাজে তার।

ও রাধা রাধা রাধা বলে—।

তারপর? তারপর? আহা—! সেই বাঁশী। না। না—হাঁ।—

"ঘর জ্বলিল—মন হারালো ছটায় সুরে গো!
সুখের একি অকুল আতান্তর।"

আতান্তরই বটে। এ বড় আতান্তর!

অকস্মাৎ তাহার গান বন্ধ হইয়া গেল। একটা কথা মনে হইতেই গান বন্ধ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝি ভিন্ন জাতি, অন্য একজনের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। এ যে মহাপাপ! ওঃ! এ বড় আতান্তর!

অনেকক্ষণ নিতাই চুপ করিয়া রহিল। নির্জ্জনে বসিয়া সে বার বার তাহার মনকে শাসন করিতে চেষ্টা করিল। বার বার সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই শাসন মানিতে চায় না। অবাধ্য মন লজ্জা পায় না, দুঃখিত হয় না, সে যেন কত খুশী হইয়াছে, কত তৃপ্তি পাইয়াছে! ঘরের প্রতিটি কোণে যেন ঠাকুরঝি দাঁড়াইয়া আছে—অন্ধকারের মধ্যে ক্ষারে-ধোওয়া ধপধপে কাপড় পরিয়া সে যেন দাঁড়াইয়া আছে নিতাইয়ের মনের খবর জানিবার জন্য। নিতাই অধীর হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের জানালাটা খুলিয়া দিল। উদাস দৃষ্টিতে সে জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া রহিল রেলের লাইনের দিকে। রেলের সমান্তরাল লাইন দুইটা যেখানে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয়, সেইখানে নিতাইয়ের আজ মনে হইল একটি স্থির স্বর্ণবিন্দু জাগিয়া রহিয়াছে, সে অচঞ্চল—সে নড়ে না—আগায় না—চলিয়া যায় না, স্থির। ঠাকুরঝি যেন ঘর হইতে বাহির হইয়া ওইখানে গিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জানালা খুলিয়া দেওয়ায় রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পথে সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, কবিয়াল তাহাকে ডাকে কিনা!

নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়াগাছটার তলায়। রাঙা ফুলে ভরা গাছ। 'চিরোল চিরোল' পাতার ডগায় থোপা থোপা ফুল! গাছটার এমন অপরূপ বাহার নিতাই কখনও আর দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সামনেই রেল লাইনের

ওপাশে বন-আউচের গাছ—বন-আউচের মিঠা গন্ধ আসিতেছে। কদমের গাছটায় কচি পাতা দেখা দিয়াছে। বর্ষা নামিলেই কদমের ফুল দেখা দিবে। বাবুদের আমবাগানে দুইটা কোকিল পাল্লা দিয়া ডাকিতেছে ; একটা 'চোখ গেল' পাখী ডাকিতেছে চণ্ডীতলার দিকে। 'মধুকুলকুলি' পাখীগুলি নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। রঙীন প্রজাপতির যেন মেলা বসিয়া গিয়াছে কৃষ্ণচূড়াগাছটার চারিপাশে।

ঠাকুরঝি যেন দ্রুতপদে চলিয়া আসিতেছে এই দিকে।

নিতাইয়ের শরীর যেন কেমন ঝিমঝিম করিতেছে! সে চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ডাকিল—এস। ঠাকুরঝি, এস। তোমার মনের কথা আমি বুঝিয়াছি। তুমি এস। আমার পাপ হয় হোক, নরকে যাইতে হয় হাসিমুখেই যাইব, তবু তোমাকে বলিতে পারিব না—তুমি এস না। সে কি পারি? সে কথা কি মুখ দিয়া বাহির হইবার? এস তুমি, এস।

তাহার মনে হইল নষ্টচাঁদের কথা। সে চাঁদ দেখিলে নাকি কলঙ্ক হয়। নিতাই কিন্তু কখনও সে কথা মানে নাই। মনের মধ্যে তাহার গান গুনগুন করিয়া উঠিল। আপনি যেন কলিটা আসিয়া পড়িল—

"চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে ব'লে কে দেখে না চাঁদ?"

ঠাকুরঝি তাহার সেই চাঁদ। ঠাকুরঝি যদি আর না আসে, তবে নিতাই বাঁচিবে কি করিয়া? এখানে থাকিয়া সে কি করিবে? কোথায় সুখ তবে? সে এইখানে বসিয়া ওই পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া চোখের দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিবে;

"চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে ব'লে কে দেখে না চাঁদ?
তার চেয়ে চোখ যাওয়াই ভাল রে! ঘুচুক আমার দেখার সাধ।
ওগো চাঁদ, তোমার লাগি—"

ও-হো-হো! গানের কলি হু-হু করিয়া আসিতেছে।

"ওগো চাঁদ তোমার লাগি—না হয় আমি হব বৈরাগী,
পথ চলিব রাত্রি জাগি সাধবে না কেউ আর তো বাদ।"

হায়, হায়, হায়, ! একি বাহারের গান ! ওগো, ঠাকুরঝি ! ওগো, কি মহা ভাগ্যে তুমি আসিয়াছিলে, কবিয়ালকে ভালবাসিয়াছিলে, তাই তো—তাই তো আজ এমন গান আপনা-আপনি আসিয়া পড়িল !

নিতাই উঠিল। সে চলিল ওই রেল লাইন ধরিয়া যে পথে ঠাকুরঝি আসে ; কিছু দূর গিয়া পথ নির্জ্জন হইতেই সে ওই গানটা ধরিয়া দিল।

রেল লাইনের বাঁধে ছেদ পড়িয়াছে নদীর উপর। বাঁধের মাথা হইতে পুল আরম্ভ হইয়াছে। বাঁধ হইতে নিতাই নামিল নদীর ঘাটে ; নদীতে অল্প জল, এক হাঁটুর বেশী নয়। হাঁটিয়াই ঠাকুরঝি নিত্য নদী পার হইয়া আসে-যায়। নিতাই গিয়া নদীর ঘাটে দাঁড়াইল।

নিতাই চলিয়াছিল একেবারে বিভোর হইয়া। বাঁ হাত গালে দিয়া ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা আঙুল দুইটি জোড় করিয়া সে যেন ঠাকুরঝিকেই উদ্দেশ করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল। হয়তো সে একেবারে ঠাকুরঝির শ্বশুর-বাড়ীতেই গিয়া হাজির হইত। নদীর ঘাটে পা দিয়াই হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল। তাই তো, সে কোথায় যাইতেছে ? এ কি করিতেছে সে ? ঠাকুরঝির শ্বশুর-বাড়ীতে সে যদি গিয়া দাঁড়ায়, এই গান গায়, বলে—ঠাকুরঝি, এ চাঁদ কে জান ? এ চাঁদ আমার তুমি ! তবে ঠাকুরঝির দশা কি হইবে ? ঠাকুরঝির স্বামী কি বলিবে ? তাহার শাশুড়ী ননদ কি বলিবে ? পাড়া-প্রতিবেশী আসিয়া জুটিয়া যাইবে। তাহারা কি বলিবে ? সকলের গঞ্জনার মধ্যে পড়িয়া ঠাকুরঝি—, তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল ঠাকুরঝির ছবি। দিশাহারার মত তাহার ঠাকুরঝি দাঁড়াইয়া শুধু কাঁদিবে।

ঠাকুরঝির নিন্দায় ঘর-পাড়া-গ্রাম-দেশ ভরিয়া যাইবে। ঠাকুরঝি পথ হাঁটিবে, মাথা হেঁট করিয়া পথ হাঁটিবে, লোকে আঙুল দেখাইয়া বলিবে—ওই দেখ, সেই কালামুখী যাইতেছে।

কুৎসিত অভদ্র লোকে ঠাকুরঝিকে কুকথা বলিবে।

সে যদি ঠাকুরঝিকে মাথায় করিয়া দেশান্তরী হয়, তবুও লোকে বলিবে—

মেয়েটা খারাপ, নিতাইয়ের সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে। ঠাকুরঝি সেখানেও মাথা তুলিতে পারিবে না।

নিতাই নদীর ঘাটে বসিল।

আপন মনেই বলিল—আকাশের চাঁদ তুমি আমার ঠাকুরঝি। তুমি আকাশেই থাক।

আঃ—আক্ষেপ হইল নিতাইয়ের। আবার কলি আসিয়া গিয়াছে।—

"চাঁদ তুমি আকাশে থাক—আমি তোমায় দেখব খালি।
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে—সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।"

নিতাই গান ভাঁজিতে ভাঁজিতে আবার ফিরিল।

রাজা বলিল—কাঁহা গিয়া রহা ওস্তাদ?

নিতাই হাসিয়া বলিল—গান, রাজন, গান। বহুত বঢিয়া বঢ়িয়া গান আজ এসে গেল ভাই। তাই গুনগুন করছিলাম আর মাঠে মাঠে ঘুরছিলাম।

—হাঁ! বঢিয়া বঢিয়া গান?

—হাঁ, রাজন, অতীব উত্তম, যাকে বলে উচ্চাঙ্গের গান।

—বইঠো। তব্ ঢোলক লে আতা হাম।

রাজা ঢোল আনিয়া বসিয়া গেল।

নিতাই একমনে গাহিতেছিল।

হঠাৎ বাজনা বন্ধ করিয়া রাজা বলিল—আরে ওস্তাদ, আঁখসে তুমরা পানি নিকাল গিয়া ভাই?

চোখ মুছিয়া নিতাই বলিল—হাঁ রাজন, পানি নিকাল গিয়া।

পরদিন নিতাই সকাল হইতেই বসিয়া ছিল ওই কৃষ্ণচূড়াগাছের তলায়। আজ সকাল হইতে তাহার মনে হইতেছে—মনে তাহার কোন খেদ নাই, কোন তৃপ্তিও নাই। সে যেন বৈরাগী হইয়া গিয়াছে।

কাল সমস্ত দিন-রাত্রি মনে মনে অনেক ভাবিয়াছে সে। সন্ধ্যায় গিয়াছিল রাজনের বাড়ী। রাজার স্ত্রী বড় মুখরা ; ইদানীং রাজা নিতাইকে নানাপ্রকার সাহায্য করে বলিয়া সে নিতাইয়ের উপর প্রায় চটিয়াই থাকে। তবু সে গিযাছিল। রাজা খুশী হইয়াছিল খুব। আশ্চর্য্যের কথা—কাল রাজার বউও তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিল। ঘোমটার মধ্য হইতেই বলিযাছিল—তবু ভাগ্যি যে ওস্তাদের আজ মনে পড়ল।

নিতাই তাহারই কাছে কৌশলে কথাপ্রসঙ্গে জানিযাছে—ঠাকুরঝির স্বামীর সমস্ত বৃত্তান্ত।

ঠাকুরঝি· স্বামীটি নাকি দিব্য দেখিতে!

—রঙ পেরায গোরো, বুঝলে ওস্তাদ, তেমনি লসছা-ললছা গড়ন। লোকটিও বড় ভাল। দুজনাতে ভাবও খুব, বুঝলে।

অবস্থাও নাকি ভাল। দিব্য সচ্ছল সংসার। রাজার স্ত্রী বলল—যাকে বলে 'ছছল-বছল'। আট-দশটা গাই গরু। দুটো বলদ। ভাগে চাষ-বাস করে। ঠাকুরঝির তোমাদের পাঁচজনার আশীর্ব্বাদে সুখের সংসার।

নিতাই বলিযাছিল—আহা! আশীর্ব্বাদ তো চব্বিশ ঘণ্টাই করি মহারাণী।

রাজার স্ত্রী অদ্ভুত। সে এতক্ষণ বেশ ছিল, এবার ওই মহারাণী বলাতেই সে খড়ের আগুনের মত জ্বলিযা উঠিল। ওই—ওই কথা আমি সইতে লারি। মহারাণী! মহারাণী তো খুব। মেথরাণী, চাকরাণী তার চেযে ভাল। না ঘর না দুয়োর। র‍্যালের ঘরে বাস—আজ এখান, কাল সেখান।

রাজা মুহূর্ত্তে আগুন হইযা উঠিয়াছিল—কেঁও হারামজাদী? কেযা বোলতা তুম?

—কেয়া বোলতা তুম কি? হক কথা বলব তার ভয় কি?

তাহার পরেই কুরুক্ষেত্র! রাজা ধরিয়াছিল তাহার চুলে। তাহাদের শান্ত করিবার জন্য নিতাই বারকয়েক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টায় কিছু হয নাই। রাজার স্ত্রী প্রায় রাত্রি বারোটা-একটা পর্য্যন্ত কাঁদিয়া, রাজাকে গাল

দিয়াছে, নিতাইকে গাল দিয়াছে। আজ সকালেও একদফা হইয়া গিয়াছে।

নিতাইয়ের উদাসীনতা অবশ্য সেজন্য নয়।

কাল সমস্ত রাত্রি সে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মনকে বুঝাইয়াছে। ভাল তুমি বাস, কিন্তু সে কথা মনেই রাখ, কাহাকেও বলিও না—ঠাকুরঝিকেও না। তাহার সুখের ঘরসংসার—সে ঘর তাহার নিত্যনূতন সুখে ভরিয়া উঠুক। তুমি তাহার মনের সরমের বাঁধ ভাঙিয়া তাহার সে সুখের ঘর ভাসাইয়া দিও না।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ঠাকুরঝি আসিল ঘড়ির কাঁটার মত। রেলের লাইনে জাগিয়া উঠিল সোনার বরণ একটি ঝকঝকে বিন্দু, তাহার পর ক্রমশ জাগিয়া উঠিল কাশফুলের মত সাদা একটি চলন্ত রেখা। ক্রমে কাছে আসিয়া সে হইল ঠাকুরঝি। একমুখ হাসি লইয়া ঠাকুরঝি তাহার সামনে দাঁড়াইল।

—কবিয়াল!

নিতাই অশ্রুকণ্ঠে বলিল—ঘরে বাটি আছে, দুধটা রেখে যাও।

—না। তুমি এস। আমি অত সব লারব বাপু! আর—

—কি আর?

—রোদে এলাম, বসব একটুকুন।

—না ঠাকুরঝি। এমন ভাবে আমার ঘরে বসা ঠিক নয়। দেখ পাঁচজনে দুষ্যু ভাববে।

ঠাকুরঝি স্তব্ধভাবে স্থিরদৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাই বলিল—বিশ্রাম করবে যদি তো তোমার দিদির বাড়ী রয়েছে। আমি একা বেটাছেলে বাড়ীতে থাকি। পাঁচজনের দুষ্যু ভাবার তো দোষ নাই। দেখ তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ ঠাকুরঝি! তাহার মুখে নিরুপায় মানুষের সকরুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝি হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

নিতাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

দিন এমনি ভাবেই চলিতে আরম্ভ করিল। নিতাই উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকে। গানও আর তেমন গায় না। ঠাকুরঝি আসে, সেও আর নিতাইয়ের সঙ্গে কথা বলে না। দ্রুতপদে আসিয়া দাঁড়াইয়া, দুধের বাটিতে দুধ ঢালিয়া দেয়, চলিয়া যায়। একদিন নিতাই বলিল—শোন।

ঠাকুরঝি শুনিতে পাইল, কিন্তু দাঁড়াইল না। একবার মুখ ফিরাইয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়াই আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

নিতাই আবার ডাকিল—যেও না, শোন। ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি এবার দাঁড়াইল।

—শোন, এদিকে ফেরো।

ঠাকুরঝি ফিরিয়া দাঁড়াইল। নিতাইয়ের চোখেও মুহূর্ত্তে জল আসিয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল—না না। যাও তুমি। বলব, আর একদিন বলব।

ঠাকুরঝি আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

দিন কয়েক আবার সেই আগের মত চলিল। কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। একদিন ঠাকুরঝি দুধ ঢালিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্তে পরে বলিল—সে দিন যে কি বলব বলছিলে—বললে না?

নিতাই বলিল—বলব।

—বল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাই বলিল—আর একদিন বলব ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝি একটু হাসিল। সে হাসি দেখিয়া নিতাইয়ের বুক একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাসের বাতাসে ভরিয়া উঠিল। ঠাকুরঝি সঙ্গেই সঙ্গে ফিরিল, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

নিতাইয়ের বুক-ভরা নিঃশ্বাসের বাতাসটা তৎক্ষণে ঝরিয়া পড়িল। সে কথা আর বলা হইবে না। না বলাই ভাল।

"বলতে তুমি ব'লো নাকো, আমার মনের কথা থাকুক মনে।
দূরে থাক সুখে থাক আমিই পুড়ি মন-আগুনে!"

অনেকদিন পরে নিতাইয়ের মনে গান আসিয়াছে; দুঃখের মধ্যেও নিতাই খুশী হইয়া উঠিল। গুন গুন করিয়া গান ধরিয়া নিতাই চলিল বাবুদের বাগানের দিকে। বাবুদের বাগানে তাহার গানের অনেক সমঝদার আছে। বাগানের প্রতিটি গাছ তাহার সমঝদার শ্রোতা। এই বাগানেই সে প্রথম প্রথম কবিগান অভ্যাস করিত। গাছগুলি হইত মজলিসের মানুষ। তাহাদের সে তাহার গান শুনাইত। আজও বাগানে আসিয়া সে গান ধরিল, ওই গানটাই ধরিল—

"সাক্ষী থাক তরুলতা, শোন আমার মনের কথা,
এ বুকে যে কত বেথা—বোঝ বোঝ অনুমানে।"

গান শেষ করিয়া সে চুপ করিয়া বসিল। নাঃ, এমন ভাবে আর দিন কাটে না। এই মনের আগুনে সে আর পুড়িতে পারিবে না। শুধু মনের আগুনই নয়, পেটের আগুনের জ্বালা, সেও তো কম নয়! রোজগার গিয়াছে; পুঁজি প্রায় ফুরাইয়া আসিল। রোজগারের একমাত্র পথ মোটবহন, কিন্তু কবিয়াল হইয়া তো ঐ কাজ সে করিতে পারিবে না। অন্তত এখানে সে পারিবে না। এখান হইতে তাহার চলিয়া যাওয়াই ভাল। তাই করিবে সে। কালই গিয়া মা চণ্ডীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিবে—মা গো, তোমার অভাগা ছেলে নিতাই-চরণকে কবিয়াল করিলে, কিন্তু তাহার মনের দুঃখ পেটের দুঃখ বুঝিলে না। কোন উপায় করিলে না। সে চলিল, তাহাকে বিদায় দাও তুমি। তাহার মনে পড়িয়া গেল অনেক দিনের আগের একটা শোনা গান, বাউলেরা গাহিত, ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান—

"বিদায় দে মা ফিরে আসি।"

ওই প্রথম কলিটা লইয়া তাহার পাদপূরণ করিতে করিতে সে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

"বিদায় দে মা ফিরে আসি।
বলতে কথা বুক ফাটে মা চোখের জলে ভাসি।"

স্তব্ধ হইয়া সে বসিয়া ছিল। তাহার সে স্তব্ধতা ভাঙিল রাজনের ক্রুদ্ধ চীৎকারে। সে সচকিত হইয়া উঠিল। রাজা কাহাকে দুর্দান্ত ক্রোধে ধমক দিতেছে—চোপ রহো!

পরক্ষণেই স্ত্রী-কণ্ঠে তীক্ষ্ণ কর্কশ ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল—চা-চিনি নিয়ে যাবে! কেনে? কিসের লেগে? লাজ নাই, হায়া নাই, বেহায়া, চোখখেগো মিনসে!

আর কথা শোনা গেল না, শোনা গেল দুপ-দাপ শব্দ, আর স্ত্রীকণ্ঠের আর্ত্ত চীৎকার। রাজা নীরবে স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে, রাজার স্ত্রী উচ্চ চীৎকারে কাঁদিতেছে। নিতাই ছি-ছি করিয়া সারা হইল। নাঃ, এই চায়ের পর্ব্বটা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

—ওস্তাদ! ওস্তাদ! স্ত্রীকে প্রহার করিয়া সেই মুহূর্ত্তটিতেই রাজা আসিয়া ঘরে ঢুকিল।—বানাও চা!—পনুরা যোলা আদমীকে মাফিক। প্রায় পোয়া-খানেক চা, আধসেরটাক চিনি সে নামাইয়া দিল। রাজার স্ত্রীর দোষ কি? এত অপব্যয় কেহ চোখে দেখিতে পারে?

নিতাই গম্ভীরভাবে বলিল—রাজন!

রাজন নিতাইয়ের কথায় কানই দিল না, সে বাসার বাহিরে চলিয়া গেল, দুয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া হাঁকিল—হো ভেইয়া লোক হো! হাঁ হাঁ, হিঁয়া আও। চলে আও সবলোক, চলে আও।

নিতাই বিস্মিত হইয়া উঠিয়া আসিল।

মেয়ে-পুরুষের একটি দল আসিতেছে। ঢোল, টিনের তোরঙ্গ, কাঠের বাক্স, পোঁটলা—আসবাবপত্র অনেক। মেয়েদের বেশভূষা বিচিত্র, পুরুষগুলিরও বিশিষ্ট একটা ছাপ-মারা চেহারা। এ ছাপ নিতাই চিনে।

—চা দাও ভাই, মরে গেলাম মাইরি! কথাটা যে বলিল, সে ছিল দলের

৬

পিছনে, দলটি দাঁড়াইতেই সে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইল। একটি দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী মেয়ে। অদ্ভুত দুইটি চোখ। বড় বড চোখ দুইটার সাদা ক্ষেতে যেন ছুরির ধার,—সেই শাণিত-দীপ্তির মধ্যে কালো তারা দুইটা কৌতুকে অহরহ চঞ্চল। সা৷ আগুনের শিখার মধ্যে নাচিয়া ফিরিতেছে যেন দুই। কালো পতঙ্গ—মরণজয়ী কালো ভ্রমর দুইটা।

রাজন নিতাইকে দেখাইযা বলিল—এহি হামারা ওস্তাদ।

নিতাই অবাক হইযা গিয়াছিল, সে ইহাদের সকল পরিচয দেখিযাই চিনিযাছে,—ঝুমুরের দল। কিন্তু ইহারা আসিল কোথা হইতে?

—জোর কবকে উতার লিয়া। রাজা বলিল—ট্রেনসে জোব করকে উতার লিযা। গাওনা হোগা আজ। তুমকো গাওনা করনে হোগা।

মেযেটা ঠোঁট বাঁকাইযা বলিযা উঠিল—এই তুমারা ওস্তাদ নাকি? অ-মা-গ! বলিযাই সে খিলখিল করিযা হাসিযা উঠিল; সে হাসির আবেগে তাহার দীর্ঘ কৃশ তনু থরথর করিযা কাঁপিতেছিল। মেযেটা শুধু মুখ ভরিয়া হাসে না, সর্ব্বাঙ্গ ভরিযা হাসে। আর সে হাসির কি ধারা। মানুষের মনের মনকে কাটিযা টুকরা টুকরা করিযা ধূলায লুটাইযা দেয।

ন্য়

জলেব বুকে ক্ষুব দিযা চিরিযা দিলে যেমন চকিতের মতন একটা রেখা টানিযা মিলাইয়া যায আর ক্ষুরটাও জলের মধ্যে অদৃশ্য হইযা যায, তেমনি করিযা নিতাই মৃদুহাসি হাসিল, সেই হাসির—অতি হাসির মধ্যে দীর্ঘ কৃশতনু মেয়েটার মুখের ধারালো সশব্দ হাসি যেন ডুবিযা মিলাইযা গেল। উদাসীন নিতাইযের মৃদু চকিত হাসিটুকুর বিনীত সহনশীলতার মধ্যে কোথাও এতটুকু শক্ত কিছু নাই, যাহা কাটিয়া বসা চলে। মেয়েটাও কিন্তু আশ্চর্য্য মেযে—সে মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ

করিয়া তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল, যেন জলে ধোওয়া মালিন্যমুক্ত ক্ষুরের মত ঝকমক করিয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নিতাই সবিনয়ে সমস্ত দলটিকে আহ্বান জানাইয়া বলিল—আসুন, আসুন, আসুন।

সে বাড়ীর মধ্যে আগাইয়া গেল—সকলে তাহার অনুসরণ করিল। নিতাইয়ের বাসা—রেলওয়ে কুলি-ব্যারাক। কনস্ট্রাক্‌শনের সময় এখানেই ছিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের বড় অফিস, তখনকার প্রয়োজনে এই সমস্ত ব্যারাক তৈয়ারী হইয়াছিল, এখন সব পড়িয়াই আছে। দিব্য তকতকে সিমেণ্ট বাঁধানো খানিকটা বারান্দা, বাঁধানো আঙিনা ; সেই দাওয়া ও আঙিনার উপরেই দলটি বসিয়া পড়িল। দলটি ঝুমুরের দল। বহু পূর্ব্বকালে ঝুমুর অন্য জিনিস ছিল, কিন্তু এখন নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা গায়িকা এবং কয়েকজন যন্ত্রী লইয়াই ঝুমুরের দল। আজ এখানে, কাল সেখানে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, গাছতলায় আস্তানা পাতে, কেহ বায়না না করিলেও সন্ধ্যার পর পথের ধারে নিজেরাই আসর পাতিয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়া দেয়। মেয়েরা নাচে, গায়—অশ্লীল গান। ভন্‌ভনে মাছির মত এ রসের রসিকরা আসিয়া জমিয়া যায়। দুই চারি পয়সা পেলাও পড়ে। মেয়েদের দেহের ব্যবসাও চলে। তবে অশ্লীল গানই ইহাদের সর্ব্বস্ব নয়, পুরাণের পালাগানও জানে, তেমন আসর পাইলে সে গানও গায়। যন্ত্রীদের মধ্যে নিতাইয়ের ধরণের দুই-একজন কবিয়ালও আছে, প্রয়োজন হইলে কবিগানের পাল্লায় দোয়ারকিও করে, আবার সুবিধা হইলে নিতাইয়ের মত কবিয়াল সাজিয়াও দাঁড়ায়। গাছতলায় পথের ধারে আস্তানা পাতিয়া যাহারা অনায়াসে দিন রাত্রি কাটাইয়া দেয়, এমন বাঁধানো আঙিনা ও দাওয়া পাইয়া তাহাদের কৃতার্থ হইবার কথা—কৃতার্থই হইয়া গেল তাহারা ; খুশী হইয়া তালপাতার চ্যাটাই বিছাইয়া সকলে বসিয়া পড়িল। দীর্ঘ কৃশতনু মেয়েটি কেবল সিমেণ্ট বাঁধানো দাওয়ার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, বলিল—আঃ! তাহার সে কণ্ঠস্বরে অসীম ক্লান্তি—তার সঙ্গে গভীর হতাশার কারুণ্য। সে যেন আর পারে না।

—বসন। মেয়েদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া আছে, দলের কর্ত্রী, সে-ই বলিয়া উঠিল—বসন, জ্বর গায়ে ঠাণ্ডা মেঝের উপর শুলি কেনে? ওঠ, ওঠ।

মেয়েটি নাম বসন্ত। বসন্ত সে কথার উত্তর দিল না, কণ্ঠস্বর একটু উচ্চ করিয়া বলিল—কই হে, ওস্তাদ না ফোস্তাদ! চা দাও ভাই।

নিতাই চায়ের জল তখন চড়াইয়া দিয়াছে, সে বলিল—এই আর পাঁচ মিনিট। কিন্তু তোমার জ্বর হয়েছে—তুমি ঠাণ্ডা মেঝের ওপর শুলে কেন? একটা কিছু পেতে দোব?—মাদুর?

বসন্ত চোখ মেলিল না, চোখ বুজিয়াই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—ওলো, নাগর আমার পীরিতে পড়েছে। নাগর শুধু নাগর নয়, পথের নাগর, দেখবামাত্র প্রেম! দরদ একেবারে গলায় গলায়। সঙ্গে সঙ্গে তাহার তরুণী সঙ্গিনীর দলও খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝির নতুন মগটিতে চা ঢালিয়া নিতাই সেই মগটি বসন্তের মুখের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিল—বুঝে খেয়ো, চায়ের সঙ্গে যোগবশের রস দিয়েছি। কবিয়াল নিতাই রসের কারবারী, রসিক ভাবে এমন ধারালো প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাত্র পাইয়া সে যেন মাতিয়া উঠিয়াছে।

চা পাইয়া তৃষ্ণার্তের মত আগ্রহে বসন্ত ইতিমধ্যেই উঠিয়া বসিয়াছিল, সে মুখ মচকাইয়া হাসিয়া নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল—বল কি। পীরিতে কুলোল না, শেষে যোগবশ।

অপর সকলকে চা পরিবেষণ করিতে করিতে নিতাই গান ধরিয়া দিল—

"প্রেমডুবি দিয়ে বাঁধতে নারলেম হায়,
চন্দ্রাবলীর সিঁদুর শ্যামের মুখচাঁদে!
আর কি উপায় বৃন্দে—এইবার এনে দে এনে দে—
বশীকরণ লতা—বাঁধব ছাঁদে ছাঁদে।"

গানটা কিন্তু নিতাইয়ের বাঁধা নয়, নিতাইয়ের আদর্শ কবিয়াল তারণ মোড়লের বাঁধা গান; নিতাইয়ের মুখস্থ ছিল।

ঝুমুর দলের মেয়ে, সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইঁহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোন শিক্ষাই নাই; কিন্তু সঙ্গীতব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে। পালাগানের মধ্য দিয়া ইহারা পুরাণ জানে, পৌরাণিক কাহিনীর উপমা দিয়া ব্যঙ্গ শ্লেষ করিলে বুঝিতে পারে, প্রশংসা সহানুভূতিও উপলব্ধি করে। নিতাইয়ের গানের অর্থ বসন্ত বুঝিতে পারিল, তাহার চোখ দুইটা একেবারে শাণিত ক্ষুরের মত ঝকমক করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ নামাইয়া চায়ের কাপে চুমুক দিল।

পুরুষদলের একজন বলিল—ভাল! ওস্তাদ, ভাল!

অন্যজন সায় দিল—হ্যাঁ, ভাল বলেছে ওস্তাদ।

—হ্যাঁ। ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া একটি মেয়ে বলিল—হ্যাঁ, ময়না বলে ভাল। নিতাইয়ের গানের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ, একা বসন্ত নয়—মেয়েদের সকলেরই গায়ে লাগিয়াছিল। অপর একটি মেয়েও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—"উনোন ঝাড়া কালো কয়লা—আগুন তাতে দিপি-দিপি!" ছেঁকা লাগে।

নিতাই হাসিয়া বলিল—না ভাই ছেঁকা কি দিতে পারি! আর তোমার সঙ্গে আমার কি পীরিত হয়, না হতে পারে? তুমি ফোটা ফুল আমি ধুলো। ফুলের পথের নাগর তো ধুলো।—বলিয়াই গুনগুন করিয়া ধরিয়া দিল—

ফুলেতে ধুলাতে প্রেম হয় নাকো সই কোন কালে।
ঝরা ফুলকে বুকে করা লেখা ধুলোর পোড়া কপালে।

বল বটে কিনা?

বসন্ত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। লোকটা কি?

প্রৌঢ়া বিচারকের মতো স্মিতহাসি হাসিয়া বলিল—তা তোদের হার হ'ল বাছা। জবাব তোরা দিতে নারলি। তা বাবা কি এ সব গান মুখে মুখে বেঁধে সুর দিয়ে গাইছ?

নিতাই সবিনয়ে বলিল—খানিক আদেক চেষ্টা করি। দু' চারটে আসরে কবি-গানও করেছি!

প্রৌঢ়া বলিল—পদগনি তো বড় ভাল বাবা।

নিতাই হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—তাঁর দয়া।

বসন্ত কোন কথা বলিল না, চা-টুকু নিঃশেষে পান করিয়া মগটা নামাইয়া দিয়া আবার সে মাটিতে লুটাইয়া শুইয়া পড়িল। রাজা সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকিল, তাহার দুই হাতে হাঁড়ি-মালসা, বগলে শালপাতার বোঝা। মিলিটারী রাজা—হুকুমের সুরেই ব্যবস্থা জানাইয়া দিল—ভেইয়া লোক, ও-হি বটতলামে জায়গা সাফ হো গিয়া, আব পাকাও খানা।

এক সময় রাজাকে একা পাইয়া নিতাই চুপি চুপি প্রশ্ন করিল—রাজন, এই সব খরচপত্র করছ—

রাজার সময় অত্যন্ত কম এবং সংসারে গোপনও কিছু নাই। সে বাধা দিয়া স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠেই বলিল—সব ঠিক হ্যায় ভাই, সব ঠিক হ্যায়। বেনিয়া মামা আট আনা দিয়া, কয়লাওয়ালা এক আনা, মুদী আট আনা, মাস্টারবাবু চার আনা, গুদামবাবু চার আনা, গাড়বাবু চার আনা, মালগাড়ীকে 'ডেরাইবর' আট আনা, হামারা এক রুপেয়া; বাস, জোড় লেও। তুমারা এক রুপেয়া,—উলোককে আড়াই রুপেয়া, বারো আনাকে চাউল ডাউল। বাস্, হো গিয়া।

সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গেল, ওদিকে শান্টিং লাইন হইতে একখানা গাড়ী কুলিরা ঠেলিয়া প্রায় পয়েন্টের কাছে লইয়া গিয়াছে।

নিতাই গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল; ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়টি ইতিমধ্যেই অভ্যস্ত ক্ষিপ্র নিপুণতার সহিত গাছতলায় সংসার পাতিয়া ফেলিয়াছে; উনান পাতিয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হইয়াছে, একটি মেয়ে জল আনিতেছে, একজন তরকারি কুটিতেছে, প্রৌঢ়া উনানের সম্মুখে বসিয়া মাটির হাঁড়ি ধুইয়া ফেলিতেছে। পুরুষেরা তেল মাখিতেছে; মেয়েদের স্নান হইয়া গিয়াছে, সকলেরই ভিজা খোলা চুল পিঠে পড়িয়া আছে, প্রান্তে একটি করিয়া গেরো

বাঁধা। নাই কেবল সেই কৃশতনু গৌরাঙ্গী ক্ষুরধার মেয়েটির। নিতাইকে দেখিয়া প্রৌঢ়া তাহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—ব'স বাবা, ব'স।

পুরুষ কয়জন প্রায় একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল—তাই তো, আপনি দাঁড়িয়ে কেন গো? বসুন।

উনানে একটা কাঠ গুঁজিয়া দিয়া প্রৌঢ়া বলিল—খাসা গলা আমার বাবার; তারপর মুখের দিকে চাহিয়া স্মিতহাসি হাসিয়া বলিল—এই 'নাইনেই' থাকবে বাবা? না, কাজকম্মও করবে—এও করবে?

—এই 'নাইনেই' থাকাবই তো ইচ্ছে: তা দেখি।

—বিয়ে-টিয়ে করেছ? ঘরে কে আছে?

—বিয়ে। নিতাই হাসিল, হাসিয়া বলিল—ঘরে মা আছে, বুন আছে; মা বুনের কাছেই থাকে। আমি একা।

—তবে আমাদের দলে এস না কেনে?

নিতাই কিন্তু এ কথার উত্তর চট্ করিয়া দিতে পারিল না। সম্মতি দিতে গিয়া মনে পড়িয়া গেল রাজাকে—মনে পড়িয়া গেল ভূইচাঁপাব শ্যামল সরস ডাঁটাটির মত কোমল শ্রীময়ী ভক্ত মেয়েটি—ঠাকুরঝিকে। সে চুপ করিয়াই রহিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রৌঢ়া আবাব প্রশ্ন করিল—কি বল. বাবা?

—বাবা ভাবছে তোমার মনের মানুষের কথা। সঙ্গে সঙ্গে খিল-খিল হাসি। নিতাই পিছন ফিরিয়া দেখিল, ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া সদ্যঃস্নাতা বসন্ত। ভিজা চুল হইতে তখনও জল গড়াইয়া পড়িতেছে। নিতাই অবাক হইয়া গেল।

—বউ কেমন হে? বশীকরণের লতায় ছাঁদে ছাঁদে বেঁধেছ বুঝি।

নিতাই এতক্ষণে সবিস্ময়ে বলিল—জ্বর গায়ে তুমি চান ক'রে এলে?

—ধুয়ে দিয়ে এলাম। চন্দ্রাবলীর প্রেমজ্বর কিনা! বলিয়াই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। সিক্তবাসের স্বচ্ছতার আড়ালে তাহার সুপরিস্ফুট সর্ব্বাঙ্গ হাসিতেছে। নিতাইয়ের লজ্জা হইল।

প্রৌঢ়া বলিল—মিছে কথা নয়, ভিজে কাপড় ছাড়্ বসন। তুই কোন্‌দিন মরবি ওই ক'রে।

হাসিযা বসন বলিল—ফেলে দিও টেনে। তা ব'লে চান না ক'রে থাকতে পারি না। চান না করলে—মা-গো! গায়ে যা বাস ছাড়ে!

একটি তরুণী মুচকি হাসিয়া বলিল—চুল ফেরে না লতায় পাতায়, তা বল!

বসন হাত দিয়া মাথার চুলে চাপ দিতে দিতে বলিল—আমার তো আর কেশ দিযে নাগরের পা মুছতে হয় না, তা চুল না ফিরিযে করব কি?

বহুপরিচর্য্যাই ইহাদের ব্যবসা, কিন্তু নারীচিত্তের স্বভাবধর্ম্মে একটি বিশেষ অবলম্বন ভিন্ন ইহারাও থাকিতে পারে না; সঙ্গের পুরুষগুলির মধ্যেই দলের প্রত্যেক মেযেটিরই প্রেমাস্পদ জন আছে। সেখানে মান-অভিমান আছে, সাধ্য-সাধনাও আছে। কিন্তু বসন্তের প্রেমাস্পদ কেহ নাই, সে কাহাকেও সহ্য করিতে পারে না। কেহ পতঙ্গের মত তার শাণিত দীপ্তিতে আকৃষ্ট হইয়া কাছে আসিলে মেযেটার ক্ষুরধারে তাহার কেবল পক্ষচ্ছেদই নয, মর্ম্মচ্ছেদও হইয়া যায। তাই বসন্ত সঙ্গিনীকে এমন কথা বলিল। ফলে ঝগড়া একটা বাধিয়া উঠিবার কথা; আহত মেয়েটি ফণা তুলিযাও উঠিয়াছিল; কিন্তু দলের নেত্রী প্রৌঢ়া মাঝখানে পড়িয়া কথাটা ঘুরাইয়া দিল। হাসিযা বলিল—ও বসন, শোন শোন, দেখ আমাদের ওস্তাদকে পছন্দ হয় কিনা!

তাহার কথা শেষ হইল না, বসন্তর উচ্চ উচ্ছল হাসিতে ঢাকা পড়িয়া গেল। নিতাই ঘামিযা উঠিল। প্রৌঢ়া ধমক দিযা বলিল—মরণ! এত হাসছিস কেনে?

হাসি থামাইযা বসন্ত বলিল—মরণ তোমার নয়, মরণ আমার!

—কেন?

—মা গো! ওই কালো—; মা-গ!

সকলে নির্ব্বাক হইযা রহিল।

বসন্ত আবার বলিল—কালো অঙ্গের পরশ লেগে আমি সুদ্ধ কালো হয়ে যাব মাসী। মুখ বাঁকাইয়া সে একটু হাসিল, তারপর আবার বলিল—

যাই, শুকনো কাপড় পরে আসি। 'নিমুনি' হ'লে কে করবে বাবা। সে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল।

একটি মেয়ে বলিল—মরণ তোমার, গলায় দড়ি।

প্রৌঢ়া ধমক দিল—চুপ কর বাছা। কোঁদল বাধাস নে।

মেয়েটি একেবারে চুপ করিল না, আপন মনেই মৃদুস্বরে গজগজ করিতে আরম্ভ করিল। নিতাই আপন মনে মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। হাসিতেছিল ওই গৌরগরবিনীর রকম সকম দেখিয়া। মেয়েটা ভাবে তাহার ওই সোনার মত বরণের ছটায় দু'নয়ার চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে। সবাই উহাকে পাইবার জন্য লালায়িত। হায়! হায়! হায়!

প্রৌঢ়া আবার কথাটা পাড়িল—বলি হাঁ গো, ও ছেলে।

—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ। ছেলেই বলবো তোমাকে। অন্য লোক বলে—ওস্তাদ। রাগ করবে না তো বাবা?

—না-না। রাগ করব কেনে। মাসীর এ কথাটি তাহার বড় ভাল লাগিল।

—কি বলছ? এই 'নাইনেই' যখন থাকবে, তখন এস না আমাদের সঙ্গে।

—না। নিতাইয়ের কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। নিতাই উঠিল,—তা হ'লে আ যাই এখন; আমাকেও রান্নাবান্না করতে হবে।

—ওহে কয়লা-মাণিক। বসন্তর কণ্ঠস্বর। নিতাই ফিরিয়া চাহিল। বসন্ত বিন্যাস করিয়া চুল আঁচড়াইয়াছে—বিন্যাস করিবার মত চুল বটে মেয়েটির। ঘন একপিঠ দীর্ঘ কালো চুল। কপালে সিঁদুরের টিপ, পরনে ধপধপে লাল নক্সিপাড় মিলের শাড়ী।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—তোমার নাম দিয়েছি ভাই কয়লা-মাণিক। কালো-মাণিক কি বলতে পারি? সে হাতজোড় করিয়া কালো-মাণিককে প্রণাম করিল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—ভাল ভাল! তা বেশ তো! ময়লা-মাণিক বলতেও পার।

—সে ওই কয়লাতেই আছে। বসন্ত মুখ বাঁকাইয়া হাসিল।

নিতাই বলিল—তা' আছে কিন্তু ম—ময়ে—মিল নাই। ওতে কথাটা মিষ্টি হয়। গানের কান আছে তাই বললাম। কালা হলে বলতাম না। বল কি বলছ?

—এখন আমার একটি কাজ করে দেবে?

—কি, বল?

—চার পয়সার মাছ এনে দেবে? আমার আবার মাছ নইলে ভাত রোচে না। দেবে এনে?

—দাও। নিতাই হাত পাতিল। কিন্তু বসন্ত পয়সা দিতে হাত বাড়াইতেই আপনার হাত অল্প সরাইয়া লইল, বলিল—আলগোছে ভাই, আলগোছে।

—কেনে? চান করতে হবে নাকি? মেয়েটার ঠোঁটের কোণ দুইটা যেন গুণ-দেওয়া ধনুকের মত বাঁকিয়া উঠিল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—কয়লার ময়লা লাগবে ভাই, তোমার রাঙা হাতে।

বসন্তের হাতের পয়সা আপনি খসিয়া নিতাইয়ের হাতে পড়িয়া গেল। মুহূর্তে ধনুকের গুণ যেন ছিঁড়িয়া গেল। তাহার অধরপ্রান্ত থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই সে কম্পন তাহার বাঁকা হাসিতে রূপান্তর গ্রহণ করিল; নিতাইয়ের মনে হইল মেয়েটা যেন গল্পের সেই মায়াবিনী, প্রতিদ্বন্দ্বী সাপ হইলে সে বেজী হয়; বিড়াল হইয়া বেজীরূপিণী তাহাকে আক্রমণ করিলে বেজী হইতে সে হয় বাঘিনী। কান্না তাহার বাঁকা হাসিতে পাল্টাইয়া গেল মুহূর্তে। হাসিয়া সে বলিল—সেই জন্যে আলগোছে দিলাম।

জেলে-পাড়ার পথে নিতাইয়ের মনে গান জাগিয়া উঠিল। নূতন গান

মনে মনে ভাবিয়া সে ওই মেয়েটার তুলনা পাইয়াছে। গুনগুন করিয়া সে কলি ভাঁজিতে আরম্ভ করিল—আহা।

'আহা—রাঙাবরণ শিমুল ফুলের বাহার সার '

দশ

সন্ধ্যায় রাজা বেশ সমারোহ করিয়া আসর পাতিল। রাজা পরিশ্রম করিল সেনাপতির মত ; বিপ্রপদ বসিয়া ছিল রাজা সাজিয়া। বেচারা বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট শরীর লইয়া নড়া-চড়া করিতে পারে না, চীৎকারেই সে সোরগোল তুলিয়া ফেলিল। অবশ্য কাজও অনেকটা হইল। মুদী, কয়লাওয়ালা বিপ্রপদর ব্যঙ্গশ্লেষের ভয়ে শতরঞ্চি বাহির করিয়া দিল, বণিক মাতুল তাহার পেট্রোম্যাক্স আলোটা আনিয়া নিজেই তেল পুরিয়া জ্বালিয়া দিল। লোকজনও মন্দ কেন—ভালই হইল। সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তিরা কেহ না আসিলেও দোকানদার শ্রেণীই যথাসাধ্য হংসশ্রোতার মত সাজিয়া গুজিয়া বসিল, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একেবারে ভিড় জমাইয়া আসিল। আসর পড়িল ঝুমুর নাচের। নিতাই প্রত্যাশা করিয়াছিল উহাদের দলের কবিয়ালের সঙ্গে একহাত লড়িবে অর্থাৎ গাওনার পাল্লা দিবে। অনেক ঝুমুর দলের সঙ্গে একজন নিম্নস্তরের কবিয়াল থাকে—স্বতন্ত্রভাবে গাওনা করিবার যোগ্যতা না থাকা হেতু ওই ঝুমুর দলকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহারা ; পথে কোন গ্রামে বা মেলায় এমনি ধারার ঝুমুর দলের দেখা পাইলে পাল্লা জুড়িয়া দেয়। মেলায় ঝুমুরের সহিত কবির আসর যোগ হইলে আসরও জোরালো হয়। এ দলেরও এমন একজন কবিয়াল আছে। কিন্তু সে আজ দলের সঙ্গে আসে নাই। কাজের জন্য পিছনে পড়িয়া আছে। দলটার গন্তব্যস্থান আলিপুরের মেলা। কথা আছে, দুইদিন পরে সে সেইখানে গিয়া জুটিবে। নইলে নিতাই একটা আসর পাইত। কবিয়ালের

অভাবে আসর বসিল শুধু নাচগানের। ঢোল, ডুগি তবলা, হারমোনিয়ম, একটা বেহালা লইয়া ঝুমুর দলের পুরুষেরা আসর পাতিয়া বসিল। তাহাদের তেল চপচপে চুলে বাহারের টেরী, গায়ে রংচঙে ছিটের ময়লা জামা। মেয়েদের গায়ে গিল্টির গহনা—কান, ঝাপটা, হার, তাগা, চুড়ি, বালা; পরনে সস্তা কাপড়ের বাতিল ফ্যাশানের বডিস, রঙিন কাপড়। কেশবিন্যাসের পারিপাট্যে আধুনিকতা অনুকরণের ব্যর্থ অপকৃষ্ট ভঙ্গি। ঠোঁটে-গালে লালরঙ, তার উপর সস্তা পাউডার এবং স্নো'র প্রলেপ, পায়ে আলতা, হাতেও লাল রঙের ছোপ। দর্শকদের মনে কিন্তু ইহাতেই চমক লাগিতেছে। মেয়েগুলির মধ্যে বসন্তই ঝলমল করিতেছে, মেয়েটার সত্যই রূপ আছে। কবিয়াল নিতাই ফরসা কাপড় জামার উপর চাদরখানি গলায় দিয়া ঝুমুর দলেরই গা ঘেঁষিয়া বসিল। মুখে তাহার গৌরবের হাসি। এ আসরে সে বিশিষ্ট ব্যক্তি, সে কবিয়াল!

গাওনা আরম্ভ হইল। খেমটার অনুকরণে নাচ ও গান। মেয়েরা প্রথমে গান ধরে, মেয়েদের পরে দোযারেরা সেই গানেরই পুনরাবৃত্তি করে, মেয়েরা তখন নাচে। একালে খেমটা নাচের প্রসার দেখিয়া তাহাদের ঝুমুর নাচ ছাড়িয়া এই ধরিয়াছে। কিছুটা অবশ্য ঝুমুরের রঙ রাখিয়াছে। সেটুকু সবই অশ্লীলতা।

প্রৌঢ়া মধ্যস্থলে পানের বাটা লইয়া বসিয়া ছিল, সে নিতাইকে বলিল—বাবা, তুমিও ধর।

নিতাই হাসিল। কিন্তু দোয়ারদের সঙ্গে সে গান ধরিল না। প্রথম গানখানা শেষ হইতেই মেয়েরা বিশ্রামের জন্য বসিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাই উঠিয়া পড়িল। কবিয়ালের ভঙ্গিতে চাদরখানা কোমরে বাঁধিয়া সে হাতজোড় করিয়া বলিল—আমি একটি নিবেদন পাই।

চারিদিকে নানা কলরব উঠিয়া পড়িল।

—সঙ নাকি?

—ব'স ব'স।

—এই নিতাই!

একজন রসিক বলিয়া উঠিল—গোঁফ কামিয়ে এস! গোঁফ কামিয়ে এস!

অকস্মাৎ সকল কলরবকে ছাপাইয়া রাজা হুঙ্কার দিয়া উঠিল—চোপ সব, চোপ।

বিপ্রপদও একটি ধমক ঝাড়িল—অ্যা—ও!

সকলে চুপ করিয়া গেল। নিতাই সুযোগ পাইয়া বলিল—আমি একপদ গাইব আপনাদের কাছে।

—লাগাও ওস্তাদ, লাগাও। রাজার কণ্ঠস্বর।

নিতাই গান ধরিয়া দিল। বাঁ হাতটি গালে দিয়া, ডান হাতটি মুখের সম্মুখে রাখিয়া অল্প ঝুঁকিয়া আরম্ভ করিল—

"আহা রাঙাবরণ শিমুলফুলের বাহার সার—
ওগো সখি বাহার দেখে যা।"

কলিটা প্রথম দফা গাহিয়া ফেরতার সময় সে হাতে তালি দিয়া তাল দেখাইয়া বলিল—এই—এই,—এই বাজাও তবলাদার!—বলিয়াই সে আবার ধরিল—

"শুধুই রাঙা ছটা, মধু নাই এক ফোঁটা, গাছের অঙ্গে কাঁটা খরধার।
মন-ভোমরা যাস্ নে পাশে তার।"

নিতাইয়ের কণ্ঠস্বরখানি মধুর এবং ভরাট, এক মুহূর্তে মানুষের মন দখল করিয়া লয়। লইলও তাই। লোকের আপত্তি গ-যে গোমাতাতে, কিন্তু তাহার আভাস না পাইয়া লোকে জমিয়া বসিল।

রাজা বাহবা দিয়া উঠিল—বাহা রে ওস্তাদ, বাহা রে!

বিপ্রপদও দিল—বহুত আচ্ছা!

বণিক মাতুল বলিল—ভাল, ভাল!

লোকেও বাহবা দিল।

নিতাই উৎসাহে মৃদু মৃদু নাচিতে আরম্ভ করিল। একবার চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, মুখে তাহার মৃদু হাসি। রাজার পিছনেই রাজার স্ত্রী, তাহার

পাশে ঠাকুরঝি। শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে সে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। মুহূর্তের জন্য নিতাই গান ভুলিয়া গেল, ঠাকুরঝিকে অবহেলা দেখাইলেও ঠাকুরঝি তাহাকে অবহেলা করে নাই। তাহার গৌরবের গোপন অংশ লইতে সে আসিয়াছে। মুহূর্তের জন্য সে গানের খেই হারাইয়া ফেলিল।

ঝুমুর দলের ঢুলীটা সুযোগ পাইয়া ঢোলে কাঠি মারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ এই কাটল। অর্থাৎ নিতাইয়ের তাল কাটিয়া গেল। মুহূর্তে নিতাই সজাগ হইয়া গান ছাড়িয়া দিয়া হাতে তালি দিয়া বলিল—গান নয়, এবার ছড়া।

হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ বলিয়া তালি মারিতে মারিতে পুনরায় ধরতার মুখে ধরিয়া দিল—

"ফল ধরে না ধরে তুলো, চালের বদলে চুলো—"

সঙ্গে সঙ্গে সে নাচিতে শুরু করিল। পরের কলি ভাবিবার এই অবকাশ। নাচিতে নাচিতে সে ফিরিয়া চাহিল—আসরের দিকে। ঝুমুর দলের মেয়েগুলি মুখ টিপিয়া হাসিতেছে—কেবল বসন্তর চোখে খেলিতেছে ছুরির ধার। নিতাই তাহার দিকে চাহিয়াই ছড়া কাটিল—

"ফুলের দরে সেই শিমুলও বিকালো, মালা হ'লো গলার।"

নিতাইয়ের সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রৌঢ়াকে বলিল—আমি চললাম মাসী।

—কোথায় ?

—বাসায়, ঘুমুতে।

—ঘুমুতে !

—হ্যাঁ।

—তুই কি ক্ষেপেছিস নাকি ? ব'স।

—না। এ আসরে আমি গান গাই না। যে আসরে বাঁদর নাচে সে আসরে আমি নাচি না।

বেশ উচ্চকণ্ঠেই কথা হইতেছিল। নিতাই মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। দর্শকেরা অধিকাংশই চীৎকার করিয়া উঠিল—এই, এই, তুমি থাম।

চটিয়া উঠিল রাজা, সে উঠিয়া দাঁড়াইল—কেয়া?

বসন্ত কোনও উত্তরই দিল না, কেবল একবার ঘাড় বাঁকাইয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে একটা চকিত দৃষ্টি হানিয়া আসর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। চারিদিকে একটা রোল উঠিল, কেহ নিতাইয়ের উপর চটিয়া চীৎকার শুরু করিল, কেহ অর্থের চুক্তিতে আবদ্ধ ঘৃণিত পথচারিণী মেয়েটার দুর্বিনীত স্পর্দ্ধায় ক্রুদ্ধ হইয়া আস্ফালন তুলিল। কিন্তু মেয়েটা কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিল না, সম্মুখের মানুষটিকে বলিল—পথ দাও ভাই।

সে পথ ছাড়িয়া দিত কি দিত না—কে জানে, কিন্তু সে কিছু করিবার পূর্ব্বেই পিছন হইতে সম্মুখে আসিয়া পথ-রোধ করিল নিতাই। হাত জোড় করিয়া সে দাঁড়াইল, হাসিমুখে বিনয় করিয়া বলিল—আমার দোষ হয়েছে। যেও না তুমি, ব'স। আমার মাথা খাও।

বসন্ত কথার উত্তর দিল না, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আসরে বসিল। গোলমাল একটু স্তিমিত হইতেই সে উঠিয়া গান ধরিল। গানখানি বাছাই করা গান। ভদ্রজনের আসরে যেখানে খেউর গাওয়া চলে না সেখানে গাওয়ার জন্য তাহাদের ভাণ্ডারে মজুত আছে। গানখানি বসন্তের বড় প্রিয়; নাচের সঙ্গে কোথায় যেন যোগ আছে। বাছিয়া বাছিয়া তাই সে এইখানাই ধরিল—

তাই ঘুনাঘুন্ বাজেলো নাগরী;
নূপুর চরণে মোর। ও সে থামিতে না চায় গো!
তোরা আয় গো।
জল ফেলে কাঁখে তুলে নে গো সখি গাগরী
রজনী হইল ভোর;—আয় সখি আয় গো; নিশি যে ফুরায় গো!
নূপুর চরণে মোর থামিতে না চায় গো!
তাই ঘুনাঘুন্—তাই ঘুনা ঘুনাঘুন্!

তাই ঘুনাঘুনের—সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিল নাচ। আসরটা স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন কি ক্রুদ্ধ রাজা পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। মেয়েটার রূপ আছে, কণ্ঠও আছে। ছুরির ধারের মত উচ্চ সু-কণ্ঠ। তাহার উপর মেয়েটা যেন গান ও নাচের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছে। দ্রুত হইতে দ্রুততর তানে লয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য শেষ করিয়া মুহূর্ত্তে একটি পূর্ণচ্ছেদের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল; এতক্ষণে আসরে রব উঠিল—বাহবার রব। চারিদিক হইতে 'পেলা' পড়িতে আরম্ভ হইল—পয়সা, আনি, দোয়ানি, সিকি, দুইটি আধুলি; দোকানী ঘনশ্যাম দত্ত একটা টাকাই ছুঁড়িয়া দিল। মেয়েটার সে দিকে লক্ষ্য করিবার বোধ হয় অবসর ছিল না, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘাম দেখা দিয়াছে, বুকখানা হাপরের মত হাঁপাইতেছে; গৌরবর্ণ মুখখানা রক্তোচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রৌঢ়া নিজে উঠিয়া পেলাগুলি কুড়াইয়া লইল।

চারিদিক হইতে রব উঠিল—আর একখানা, আর একখানা!

নিতাই বসন্তের দিকে চাহিল, চোখে চোখে মিলিতেই নমস্কার করিয়া সে তাহাকে অভিনন্দিত করিল!

প্রৌঢ়া বসন্তের গায়ে হাত দিয়া বলিল—ওঠ্! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শিহরিয়া উঠিল,—এ কি বসন, জ্বর যে আজ অনেকটা হয়েছে!

হাসিয়া বসন বলিল—একটুকুন মদ থাকে ত দাও।

সামান্য আড়াল দিয়া খানিকটা নির্জ্জলা মদ গিলিয়া সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রথম বারের মত গতি বা আবেগ কিছুই আনিতে পারিল না, সে হাঁপাইতেছিল, গতির মধ্যে ক্লান্তির পরিচয় সুপরিস্ফুট। গান ধরিয়াও গাহিতে পারিল না; দোহারেরা গাহিল। তেহাই পড়িতেই নাচ শেষ করিয়া সে শিথিল ক্লান্ত পদক্ষেপে আসর হইতে বাহির হইয়া গেল। কেহ কোন কথা বলিল না, যেন তাহাদের দাবি ফুরাইয়া গিয়াছে, চোখের উপর দেনা-পাওনার ওজন-দাঁড়িতে তাহার দুইখানা গান ও নাচের ভার তাহাদের পেলার ভারকে তুচ্ছ করিয়া পাথরের ভারে মাটির বুকে চাপিয়া বসিয়াছে। পথের ধারে

যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা আরও একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিল।

প্রৌঢ়া নিতাইকে বলিল—দেখ তো বাবা। আচ্ছা একগুঁয়ে মেয়ে!

নিতাইও বাহির হইয়া আসিল। চারিদিকে চাহিয়া সে বসন্তর সন্ধান করিল। মনে মনে এই মেয়েটির কাছে সে হার মানিয়াছে। 'শিমুল' ফুল বলা তাহার অন্যায় হইয়াছে—অন্যায় নয়, অপরাধ। নূতন গানের কলি তাহার মনের মধ্যে গুনগুনানি আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কোথায় গেল বসন্ত? ঝুমুর দলের বাসা তো এই বটগাছতলা। গাছতলাটায় একখানা চ্যাটাইয়ের উপর বসিয়া আছে একটা পুরুষ—দলের মধ্যে শক্তিশালী পুরুষটা। মহিষের মত প্রচণ্ড আকার, তেমনি কালো, রাঙা গোল চোখ; বোবার মত নীরব: তৃষ্ণার্ত্ত মহিষ যেমন করিয়া জল খায়—তেমনি করিয়া মদ খায়, সারাদিন শুইয়া থাকে, সন্ধ্যার পর হইতে পড়ে তাহার জাগরণের পালা। আগুন জ্বালিয়া আগুনের সম্মুখে বসিয়া লোকটা জিনিসপত্র আগলাইতেছে। সেখানে নিতাই দেখিল বসন্ত নাই। সে জ্যোৎস্নালোকিত চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল। এ কি? তাহার বাসার দরজায় কয়জন লোক দাঁড়াইয়া কেন? সে আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—কে?

—আমরা।

নিতাই চিনিল, ব্যাপারী কাসেদ সেখের ছেলে—নয়ান ওরফে ননাইয়ের দল। সে প্রশ্ন করিল—কি? এখানে কি?

—মেয়েটা তোর বাসায় এসে ঢুকেছে।

—এসেছে তা'—তোমরা দাঁড়িয়ে কেনে?

দলকে দল অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

নিতাই বলিল—যাও তোমরা এখান থেকে। নইলে হাঙ্গামা হবে। আমি

রাজাকে ডাকব, কনেস্টবল আছে—তাকে ডাকব। কাসেদ সেখ নিতাইকে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু রাজাকে গ্রাহ্য করে ; সে তবুও বলিল—শোন্ না, তোকে বকশিশ করব। নেতাই!

নিতাই একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি হানিয়া বাড়ী ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু কোথায় বসন্ত? কোথাও তো নাই! কিন্তু ঘরের দরজার শিকল খোলা। দরজায় হাত দিয়া সে দেখিল—হ্যাঁ, দরজা বন্ধ।

নিতাই ডাকিল—ওহে ভাই, শুনছ? আমি—আমি।

—কে?

—তোমার 'কয়লা-মাণিক'।

—কে! ওস্তাদ?

—ওস্তাদ কি ফোস্তাদ যা বল তুমি।

এবার দরজাটা খুলিয়া গেল। নিতাই ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—বসন্ত ততক্ষণে আবার শুইয়া পড়িয়াছে। তাহারই বিছানাটা পাড়িয়া দিব্য আরাম করিয়া শুইয়াছে। বসন্তই বলিল—দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও।

—বাইরের দরজা বন্ধ আছে।

পাঁচিল টপকিয়ে ঢুকবে ভাই—বন্ধ কর। বসন্ত ক্লান্ত অথচ বিচিত্র হাসি হাসিল। নিতাই তাহার কপালে হাত দিয়া চমকাইয়া উঠিল—এ কি? এ যে অনেকটা জ্বর!

—মাথাটা একটু টিপে দেবে?

হাসিয়া নিতাই মাথা টিপিতে বসিল। বসন্ত হাসিয়া বলিল—না, তুমি ফোস্তাদ নও, ভাল ওস্তাদ—গানখানি কিন্তুক খাসা। তোমার বাঁধা?

—হ্যাঁ। কিন্তু ও গানটা বাতিল করে দিলাম।

—কেনে? চোখ বন্ধ করিয়াই বসন্ত প্রশ্ন করিল।

—ওটা আমার ভুল হয়েছিল।

মেয়েটি কোন উত্তর দিল না, শুধু একটু হাসিল।

—আবার নতুন গান বাঁধছি। সে গুন গুন করিয়া আরম্ভ করিল—

"করিল কে ভুল, হায় রে!
মন-মাতানো বাসে ভ'রে দিযে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।"

বসন্তর মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিল—তারপর?

—তারপর এখনও হয নাই।

গানটি আমাকে নিকে দিযো।

—আমার গান তুমি নিকে নেবে? গাইবে?

—হুঁ।

জানালার দিকে চাহিযা নিতাই বলিল—আজ শেষ করব!—কে? কে? জানালার পাশ হইতে কে সবিযা যাইতেছে? বসন্ত হাসিযা বলিল—আবার কে! ওত সব নরুকেদের দল।

নিতাই কিন্তু ওই কথা মানিযা বসিযা থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি আসিযা জানালার ধারে দাঁড়াইল। সে যাহা দেখিযাছে সে-ই জানে। হ্যাঁ।—ওই যে দুগ্ধবরণ কোমল জ্যোৎস্নার মধ্যে মানুষটি রেল লাইনের দিকে চলিযাছে। দ্রুত চলন্ত কাশফুলের মত চলিযাছে। মাথায় শুধু স্বর্ণবিন্দুটি নাই। ঠাকুরঝি।

এগারো

জ্যোৎস্নার রহস্যময় শুভ্রতার মধ্যে দ্রুত চলন্ত কাশফুলটি যেন মিশিযা মিলাইযা গেল। নিতাই কিন্তু স্তব্ধ হইযা জানালার ধারে দাঁড়াইযাই রহিল। চোখে তাহার অর্থহীন দৃষ্টি, মনের চিন্তা অসম্বদ্ধ অস্পষ্ট, বুকের মধ্যে শারীরিক অনুভূতিতে কেবল একটা গভীর উদ্বেগ, সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে।

ঠাকুরঝি এই জ্যোৎস্নার মধ্যে হারাইয়া যাওয়ার সঙ্গে তাহার সব যেন হারাইয়া গেল।

তাহার ভাব দেখিয়া মুখরা স্বৈরিণী অসুস্থ দেহেও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া বসিল।

জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার যত জটিল, তত কুটিল। পথচারিণী নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনীর রাত্রির অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতায়—নিশাচর হিংস্র জানোয়ারের মত মানুষই সংসারে ষোল আনার পনেরো আনা তিন পয়সা; সেই অভিজ্ঞতার শঙ্কায় শঙ্কিত বসন্ত উঠিয়া বসিল। যে দলটি বাড়ীর দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল, তাহারাই দলপুষ্ট হইয়া নিঃশব্দ লোলুপতায় নখর দন্ত মেলিয়া বাড়ীর চারিপাশে জুটিয়াছে না কি? আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে? উৎকণ্ঠিত হইয়া সে প্রশ্ন করিল—কি?

নিতাই তবুও উত্তর দিল না। সে যেমন স্তব্ধ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনিই দাড়াইয়া রহিল। ঠাকুরঝির রাগ হলে সে জানে খানিকটা গিয়াই সে দাঁড়ায়, পিছন ফিরিয়া তাকায়, ইঙ্গিতে বলে— আমায় ডাক, ডাকিলেই ফিরিব। আজ কিন্তু সে দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল, এই রাত্রে একা সে চলিয়া গেল!

বসন্ত এবার উঠিয়া আসিয়া নিতাইয়ের পাশে দাড়াইল, জ্বরোত্তপ্ত হাতে নিতাইয়ের হাত ধরিয়া সে প্রশ্ন করিল—কই?

এতক্ষণে সচকিত হইয়া নিতাই ফিরিয়া চাহিল। রূপে গুণে ক্ষুরধার স্বৈরিণীর কৃশ মুখে, ডাগর দীপ্ত চোখে অপরিমেয় শঙ্কিত—গভীর উৎকণ্ঠা। নিতাই সে মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহকোমল না হইয়া পারিল না। সস্নেহে হাসিয়া সে বসন্তের কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—এত জ্বর, তুমি উঠে এলে কেনে? চল শোবে চল। উঃ! ধান দিলে যেন খই হবে, এত তাপ!

—নচ্ছারগুলো ঘুরছে চারিদিকে? ছুরি ছোরা নিয়ে জুটেছে?

—নচ্ছারগুলো? নিতাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল। বসন্তের ভাবনার পথে যাহারা বিচরণ করিতেছিল, তাহাদের সে কল্পনা করিতেই পারিল না।

বসন্তের ভ্রূ এবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—খাপ হইতে ক্ষুরের ধার এবার উঁকি মারিল, সে প্রশ্ন করিল—তবে ? কি ? কে গেল ? কি দেখছ তুমি ?

চকিতে নিতাই এবার বসন্তের কল্পনার কথা বুঝিল, হাসিয়া সে বলিল—না, তারা নয়। ভয় নাই তোমার। এস, শোবে এস। সে তাহাকে আকর্ষণ করিল।

—কে যে গেল ? কাকে দেখছিলে ? কে উঁকি মেরে গেল ?

কে চিনতে পারলাম না।

চিনতে পারলে না ?

না।

তবে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলে যে ? যেন কত সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে তোমার ?

বসন্তের শাণিত দৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যেও যেন জ্বলিতেছিল।

নিতাই কোন উত্তর দিল না, শুষ্ক হাসিমুখে সে বসন্তের দিকে চাহিয়া রহিল।

বসন্ত অকস্মাৎ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—তীক্ষ্ণ ক্রুর হাসি। হাসিয়া বলিল—আ মরণ আমার! চোখের মাথা খাই আমি! যে টুক মারলে তার মাথায় যে ঘোমটা ছিল! ও! আমাকে দেখে—। আবার সেই খিলখিল হাসি।

নিতাইয়ের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। বসন্ত হাসিতে হাসিতে ঘরের খিল খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিতাই ডাকিল—বসন! ও-ভাই! বসন!

দুয়ারের বাহির হইতে উত্তর আসিল—বসন নয় হে, কেয়াফুল, কেয়াফুল। টেনো না, করাত-কাঁটার ধারে সর্ব্বাঙ্গ ছ'ড়ে-ছিঁড়ে যাবে।

নিতাই তবুও বাহিরে আসিল।

স্বৈরিণী তখন কাসেদ সেখের ছেলে নয়ানের সঙ্গে কথা বলিতেছে।

এ অবস্থায় নিতাই ডাকিতে গিয়াও পারিল না, লজ্জাবোধ হইল। আপনার

ছুয়াবটিতেই সে স্তব্ধ হইযা দাঁড়াইযা রহিল। ও দিকে স্টেশনের ধাবে ঝুমুরেব আসবে গান হইতেছে। আলোর ছটা গাছের ফাঁকে ফাঁকে আসিযা এখানে ওখানে পড়িযাছে। এদিকটা প্রায জনহীন স্তব্ধ, আবাশের চাঁদ অস্তে চলিযাছে, অন্ধকাব ঘন হইযা উঠিতেছে। স্বৈরিণী মেযেটাব কিন্তু কোন লজ্জা নাই ; খিল খিল হাসির মধ্যে কথা শেষ করিযা—ঘন অন্ধকাবে কাসেদেব ছেলে নযানের সঙ্গে গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। নিতাই আকাশেব দিকে তাকাইযা একা দাঁড়াইয়া রহিল। থাকিতে থাকিতে আবার তাহাব মনে নূতন গান গুনগুন করিযা উঠিল। ভগবান মানুষের মন লইয়া কি মজার খেলাই না খেলেন। এক ঘটে, মানুষ তাঁহার ছলনায অন্য দেখে। ঠাকুবঝি বসন্তবে দেখিযা চলিযা গেল, বসন্ত ঠাকুরঝিকে দেখিযা চলিযা গেল। সে গুনগুন কবিযা তাই লইযাই গান বাঁধিতে বসিল।—

"বঙ্কিম বিহারী হরি বাঁকা তোমার মন।"

ঘটনার মধ্যে সে যেন নিযতিব খেলা বা দৈবের অদ্ভুত পরিহাস দেখিতে পাইযাছে আজ। ঠিক তাহার অচ্ছুত জন্মের মতই এ পবিহাস নিষ্ঠুব। সে তাই গানের মধ্যে হরিকে স্মরণ না করিযা পারিল না।

ভোরবেলাতে রাজার হাঁক-ডাকে নিতাইযের ঘুম ভাঙিযা গেল। সে ঘরে আসিযা গান বাঁধিতে বাঁধিতে ঘুমাইযা পড়িযাছিল। চেতনা হইবামাত্র সেই অসমাপ্ত গানের কলিটাই প্রথমে গুঞ্জন করিযা উঠিল তাহাব মনে—

"বঙ্কিম বিহারী হরি বাঁকা তোমার মন,
কুটিল কৌতুকে তুমি হযকে কর নয—অঘটন কর সংঘটন।
দ্রোণের চোখের জলে অর্জ্জুন দেখে ভুজঙ্গ,
সীতা দেখেন হরিণ স্বুবর্ণ তার অঙ্গ,
রঙ্গ তোমার দেখে ধন্ধ লাগে চোখে—"

বাকীটা এখনও সে মিল করিতে পারে নাই—সেই কথাটাই তাহার প্রথম মনে হইল। কিন্তু বাহিরে রাজার হাঁকডাকের উচ্ছ্বাসটা আজ অতিরিক্ত। হয়তো

নূতন কোন অভিনন্দন লইয়া রাজন তাহার দুয়ারে আসিয়াছে—ধৈর্য্য তাহার আর ধরিতেছে না। স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসিমুখে সে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজা—তাহার পিছনে ঝুমুরের দলের প্রৌঢ়া। রাজা সটান ঘরের ভিতরে আসিয়া চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সকৌতুকে কাহাকে যেন খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

নিতাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কি?

—কাঁহা? কাঁহা হ্যায় ওস্তাদিন?

—ওস্তাদিন?

—হা-হা বলিয়া হাসিয়া রাজা বলিল—সব ফাঁস হোয়েগা ওস্তাদ, সব ফাঁস হোয়েগা। কাল রাতমে—সে হা-হা করিয়াই সারা হইল। কথা আর শেষ করিতে পারিল না।

নিতাই তবুও কথাটা বুঝিতে পারিল না।

বুঝাইয়া দিল প্রৌঢ়া। সে এতক্ষণ দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, এবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিল—আ মরণ। ও বসন্ত! বেরিয়ে আয় না লো, এই ট্রেনেই যাব যে আমরা!

নিতাই বলিল—সে তো এখানে নাই।

—নাই! সে কি? সে আসর থেকে বেরিয়ে এল, তুমি এলে সঙ্গে সঙ্গে। আমি বলেও দিলাম তোমাকে। তারপর আমি খোঁজও করলাম; শুনলাম, তোমার ঘরেই—

নিতাই বলিল—হ্যাঁ, কজন লোক বিরক্ত করছিল ব'লে আমার ঘরেই এসেছিল। আমি এসে দেখলাম শুয়ে আছে, গায়ে অনেকটা জ্বর। কিন্তু খানিক পরেই বেরিয়ে সেই লোকের সঙ্গেই চলে গেল।

প্রৌঢ়া চিন্তিত হইয়া উঠিল; রাজার কৌতুক-হাস্য স্তব্ধ হইয়া গেল।

নিতাই বলিল—কাসেদ সেখের ছেলে নযানের সঙ্গে গিয়েছে। ওই ঝোঁপ বটগাছটার তলাতেই যেন কথা কইছিল। আসুন দেখি।

তাহারা আগাইয়া গেল।

সেইখানেই পাওয়া গেল। বসন্ত সেইখানেই ছিল। অচেতনের মত পড়িয়া আছে!

বিপুলপরিধি ছায়ানিবিড় বটগাছটির তলদেশটা ছায়ান্ধকারের জন্য তৃণহীন পরিষ্কার; সেইখানেই মাটির উপর বসন্ত তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। কেশের রাশ বিস্রস্ত অসম্বৃত, সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসর, মুখের কাছে কতকগুলা মাছি ভন ভন করিয়া উড়িতেছে; পাশেই পড়িয়া আছে একটা খালি বোতল, একটা উচ্ছিষ্ট পাতা। কাছে যাইতেই দেশী মদের তীব্র গন্ধ সকলের নাকে আসিয়া ঢুকিল।

প্রৌঢ়া বলিল—মরণ! এই করেই মরবে হারামজাদী! বসন, ও বসন!

রাজা হাসিয়া বলিল—বহুত মাতোয়ারা হোগেযা।

নিতাই দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল এক কাপ ধূমায়মান চা হাতে লইয়া। দুধ না দিয়া কাঁচা চা, তাহাতে একটু লেবুর রস। কাঁচা চায়ে নাকি মদের নেশা ছাড়ে। মহাদেব কবিয়ালকে সে কাঁচা চা খাইতে দেখিয়াছে। বসন্ত তখন উঠিয়া বসিয়াও ঢুলিতেছে অথবা টলিতেছে। প্রৌঢ়া বলিতেছে—এ আমি কি করি বল দেখি?

—এই চা-টা খাইয়ে দিন, এখুনি ছেড়ে যাবে নেশা।

চা খাইয়া সত্যই বসন্ত খানিকটা সুস্থ হইল। এতক্ষণে সে রাঙা ডাগর চোখ মেলিয়া চাহিল নিতাইয়ের দিকে।

প্রৌঢ়া তাড়া দিয়া বলিল—চল এইবার।

নিতাই বলিল—চান করিয়ে দিলে ভাল করতেন। সুস্থও হত, আর সর্ব্বাঙ্গে ধুলো লেগেছে—

তাহার কথা চাপা পড়িয়া গেল বসন্তের মত্ত খিলখিল হাসিতে। সে টলিতে

টলিতে উঠিযা দাঁড়াইল, নিতাইয়ের সম্মুখে আসিয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিল—মুছিয়ে দাও না নাগর, দেখি কেমন দরদ !

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল—হাসিযা কাঁধের গামছাখানা লইযা সযত্নে বসন্তের সর্ব্বাঙ্গের ধূলা মুছাইয়া দিয়া বলিল—আচ্ছা, নমস্কার তা হ'লে।

প্রৌঢ়া তাহাকে ডাকিল—বাবা।

নিতাই ফিরিল !

—আমার কথাটার কি করলে বাবা ? দলে আসবার কথা ?

নিতাই কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নেশায বিভোর মেয়েটা আবার আরম্ভ করিযা দিল সেই হাসি। সে হাসি তাহার যেন আর থামিবে না।

বিরক্ত হইযা প্রৌঢ়া বলিল—মরণ। কালামুখে এমন সর্ব্বনেশে হাসি কেনে? দম ফেটে মরবি যে !

সেই হাসির মধ্যেই বসন্ত কোনরূপে বলিল—ওলো মাসী লো—কযলা-মাণিকের মনের মানুষ আছে লো। কাল রাতে—হি-হি-হি—হি-হি-হি—হি-হি-হি—

রাজা এবার অত্যন্ত বিরক্ত হইযা মেয়েটাকে একটা ধমক দিযা উঠিল—

—কেঁও এইসা ফ্যাক্ ফ্যাক্ করতা হ্যায ?

বসন্তর চোখ দুইটা জ্বলিযা উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার হাসিতে আরম্ভ করিল—হি-হি-হি—হি-হি-হি—

ও-দিকে স্টেশনে ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল; স্টেশন-মাস্টার নিজে ঘণ্টা দিতে দিতে হাঁকিতেছিল—রাজা ! এই রাজা !

রাজা ছুটিল, নতুবা একটা অঘটন ঘটা অসম্ভব ছিল না।

নিতাই হাসিযা বলিল—আচ্ছা, আসুন তা হ'লে। সঙ্গে সঙ্গে সেও আপনার বাসার দিকে ফিরিল।

প্রৌঢ়া এবার কঠিন-স্বরে বলিল—বসন ! আসবি, না এইখানে মাতলামি করবি ?

বসন্ত শিথিল পদে চলিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু হাসি তাহার তখনও থামে নাই।

সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া ইশারা করিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল—চলাম হে!

* * *

নিতাই আসিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়াগাছটির তলায়। গত রাত্রির গানটি সে সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল!

"রঙ্গ তোমার দেখে—ধন্ধ লাগে চোখে—"

বাকিটা আর কিছুতেই মনে আসিতেছে না। 'সভয়ে মুদি নয়ন'—কয়েক-বার মনে আসিয়াছে কিন্তু মনঃপূত হয় নাই। 'তাই চরণে নিলাম শরণ'—এও পছন্দ হয় নাই। হঠাৎ মনে নতুন পদ আসিয়া গেল। ওই পদটারই বদলে নতুন পদ।

"খেলার লেগে ভুলেব স্থতোয়-- খেলাও হরি পুতুল নাচন।
তোমার বাঁকা হাসির ছটায় আঁধার রাতে আলো ফোটায়
ঘুম ভেঙে যাই পথ চলিতে—আঁধার তখন তিন ভুবন।
সোনার হরিণ দেখাও সীতায়—"

বাধা পড়িল। ট্রেন আসিতেছে!

ট্রেনটা স্টেশন হইতে ছাড়িয়া সশব্দে সম্মুখ দিয়া পার হইয়া চলিয়াছিল। একটা কামরায় ঝুমুরের দলটাকে দেখা গেল। বসন্ত মেয়েটি একধারে দরজার পাশেই বসিয়া জানালায় মাথা রাখিয়া একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে। অদ্ভুত মেয়ে! নিতাই হাসিল। ঝুমুর সে অনেক দেখিয়াছে, কবিগান করিতে ইহাদের সঙ্গে মেলা-মেশাও অনেক করিয়াছে, কিন্তু এমন নিষ্ঠুর ব্যবসায়িনী সে দেখে নাই। তবে মেয়েটার গুণ আছে, রূপও আছে। আশ্চর্য্য মেয়ে! আবার তাহার সব গোলমাল হইয়া গেল। 'পুতুল নাচন' গানটা আর ভাল লাগিল না। গত রাত্রের গানটা তাহার মনে পড়িয়া গেল—

"করিল কে ভুল—হায় রে!
মন-মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।"

ট্রেন চলিয়া গেল। নিতাই চাহিয়া রহিল রেল-লাইনের বাঁকের দিকে যেখানে সমান্তরাল লাইন দুইটি এক বিন্দুতে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়! বসন্ত চলিয়া গেল, আর হয়তো কখনও দেখা হইবে না। অদ্ভুত মেয়ে! ক্ষণে ক্ষণে মেয়েটার এক এক রূপ; এক রাত্রে তিন-তিনখানা গান উহাকে লইয়াই মনে আসিয়াছে। সে খানিকটা উদাস হইয়া রহিল। অকস্মাৎ সে সচেতন হইয়া উঠিল। ওইখানে এখনই এক সময় একটি স্বর্ণবিন্দু ঝকমক করিয়া উঠিবে; তাহার পর দেখা যাইবে—ওই স্বর্ণবিন্দুটির নীচে চলন্ত একটি শুভ্র রেখা। স্বর্ণবিন্দু-বিচ্ছুরিত জ্যোতিরেখাটি মধ্যে মধ্যে চমকের মত চোখে লাগিয়া চোখ ধাঁধিয়া দিবে। অসমাপ্ত গানগুলি অসমাপ্তই থাকিয়া গেল. স্থিরদৃষ্টি পথের উপর রাখিয়া নিতাই বসিয়া রহিল।

কই?

ওই কি? না, ও তো নয়। চোখের ভুল নিতাইয়ের। মনের প্রত্যাশিত কল্পনা—প্রত্যক্ষ দিবালোকে মরীচিকার মত মধ্যে মধ্যে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। নিতাই হাসিল। এই তো বেলা সবে দশটা। ঠাকুরঝি আসে ঘড়ির কাঁটাটির মত বারোটার ট্রেনের ঠিক আগে।

গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া নিতাই ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। ঘণ্টাগুলা আজ যেন যাইতেই চাহিতেছে না।

ওই! হ্যাঁ, ওই আসিতেছে। চলন্ত সাদা একটি রেখার মাথায় স্বর্ণাভ একটি বিন্দু। কিন্তু না, ও তো নয়, রেখাটির গতি-ভঙ্গি তো তেমন দ্রুত নয়, রেখাটিও তেমন সরল দীঘল নয়!

ওই আর একটি রেখা, এও নয়।

নিতাইয়ের ভুল হয় নাই। রেখাগুলি নিকটবর্ত্তী হইলে নারীমূর্ত্তিগুলি স্পষ্ট

হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই ঠাকুরঝি নয়। এ মেয়েগুলিও এই গ্রামে দুধ বেচিতে আসে। একে একে তাহারা সকলেই গেল। কিন্তু ঠাকুরঝি কই?

বেলা বারোটার ট্রেন চলিয়া গেল।

রাজা আসিয়া ডাকিল—ওস্তাদ!

সচকিত হইয়া নিতাই হাসিয়া বলিল—রাজন!

—কেয়া ধ্যান করতা ভাই, হিঁয়া বইঠকে? নয়া কুছ গীত বানায়া—?

না—। অপ্রস্তুতের মত নিতাই শুধু খানিকটা হাসিল।

—তুমারা উপর হাম গোসা করেগা।

—কেন রাজন, কেন? কি অপরাধ করলাম ভাই?

—ওহি ঝুমুরওয়ালী বোলা তুমারা দিলকে আদমী, মনকে মানুষ—

নিতাই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর রাজার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—চল, চা খেয়ে আসি। চা খাওয়া হয় নাই, ঠাকুরঝি আজ আসে নাই দুধ নিয়ে। ঝুমুরওয়ালীর কথায় তুমি বিশ্বাস করেছ? হ্যাঁ রাজন—আছে আমার মনের মানুষ। আমার মনের মানুষ তুমি রাজন, তুমি।

—হাম? রাজা বিকট হাসিতে স্থানটি চমকিত করিয়া দিল। সে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—চুমু খাগা ওস্তাদ? আবার সেই বিকট হাসি।

বারো

একদিন, দুইদিন, তিনদিন।

ঠাকুরঝি আসিল না। চতুর্থ দিনে উৎকণ্ঠিত হইয়া নিতাই স্থির করিল, আজ ঠাকুরঝি না আসিলে ঠাকুরঝির গ্রামে গিয়া খোঁজ করিয়া আসিবে।

বারোটার ট্রেন চলিয়া গেল, সেদিনও ঠাকুরঝি আসিল না। অন্যান্য মেয়েরা

যাহারা দুধ দিতে আসে, তাহারা আসিয়া ফিরিয়া গেল। নিতাইয়ের বার বার ইচ্ছা হইল—উহাদের কাছে সংবাদ লয়, কিন্তু সেও সে কিছুতেই পারিল না। কেমন সঙ্কোচ বোধ করিল। নিজেই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল—বার বার মনে হইল, কেন সঙ্কোচ, কিসের সঙ্কোচ? কিন্তু তবু সে সঙ্কোচকে নিতাই কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। চুপ করিয়া সে আপনার বাসায় বসিয়া ভাবিতে বসিল। ভাবিতেছিল—কোন্ অজুহাতে ঠাকুরঝির শ্বশুরগ্রামে গিয়া উঠিবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ঠিক করিল—হাঁস, মুরগী অথবা ডিম কিনিবার অছিলায় যাইবে। ঠাকুরঝির শ্বশুরদের হাঁস মুরগী আছে সে জানে। সংসারের তুচ্ছতম সংবাদটি [illegible] ঠাকুরঝি তাহাকে বলিয়াছে। দেওয়ালে কোথায় একটি সুচ গাঁথা আছে, নিতাই সেটি গিয়া স্বচ্ছন্দে—চোখ বন্ধ করিয়া লইয়া আসিতে পারে।

—ওস্তাদ রয়েছ নাকি? রাজার কণ্ঠস্বর।

নিতাই আশ্চর্য্য হইয়া গেল, রাজা বাংলায় বাত বলিতেছে। বিস্মিত হইয়া সে হিন্দীতে উত্তর দিল—রাজন, আও মহারাজ, কেয়া খবর?

রাজা আসিয়া খবর দিল—বি[illegible]ভাবে বাংলাতেই বলিল—খারাপ খবর ওস্তাদ, ঠাকুরঝিকে নিয়ে তো ভারি মুশকিল হয়েছে ভাই।

নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সে কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না, উৎকণ্ঠিত স্তব্ধমুখে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—আজ দিন তিনেক হ'ল, কি হয়েছে ভাই, অত ভাল মেয়ে—লক্ষ্মী মেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-মরদ সবারই সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করছে—মাথামুড় খুঁড়ছে। কাল রাত থেকে আবার মূর্চ্ছা যাচ্ছে। দাঁত লাগছে, হাত-পা কাঠির মত করছে।

অপরিসীম উদ্বেগে নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা অস্থির হইয়া উঠিল। রাজার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—দেখতে যাবে রাজন?

রাজা বলিল—বউ গেল দেখতে, ফিরে আসুক। আমরা ও-বেলায় যাব।

নিতাইয়ের চোখে জল আসিয়াছিল, মাথা নীচু করিয়া সে বসিয়া রহিল।

রাজা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বড় ভাল মেয়ে ওস্তাদ। আবার কিছুক্ষণ পর রাজা বলিল—ওঃ, ঠাকুরঝির স্বামীটি যা কাঁদছে! হাউ হাউ করে কাঁদছে। ছেলেমানুষ, ভাব-সাবটি হয়েছে ঠাকুরঝির সঙ্গে। বেচারা! রাজা একটু ম্লান হাসি হাসিল।

টপ টপ করিয়া দুই ফোটা চোখের জল নিতাইয়ের চোখ হইতে এবার ঝরিয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি খেলাচ্ছলে আঙুল দিয়া জলের চিহ্ন দুইটা বিলুপ্ত করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ডাকিল—রাজন।

—ওস্তাদ!

—ডাক্তার-বদ্যি কিছু দেখানো হয়েছে?

হতাশায় ঠোঁট দুইটা দুইপাশে টানিয়া রাজা বলিল—এতে আর ডাক্তার-বদ্যি কি করবে ওস্তাদ? এ তোমার নির্ঘাত অপদেবতা, না হয় ডাইনী-ডাকিনী, কি কোন দুষ্ট লোকের কাজ।

কথাটা নিতাইয়ের মনে ধরিল। চকিতে মনে হইল, তবে কি ওই ক্ষুরধার মেয়েটার কাজ! ঝুমুর দলের স্বৈরিণী—উহাদের তো অনেক বিদ্যা জানা আছে, বশীকরণে তো উহারা সিদ্ধহস্ত।

রাজা বলিল—মা কালীর থানে ভরনে দাঁড় করাবে আজ ঠাকুরঝিকে। কি ব্যাপার বিত্তান্ত আজই জানা যাবে।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া রাজা উঠিল, নিতাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া হিন্দীতে বলিল—আও ভেইয়া, থোড়াসে চা পিয়েগা।

অনেকক্ষণ পর রাজা যেন সহজ হইয়া উঠিল।

*　　*　　*

রাজার বাড়ীতেই নিতাই বসিয়া রহিল। রাজার স্ত্রী সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিবে—সেই সংবাদের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত ব্যগ্র হইয়া বসিয়া রহিল। রাজা দুঃখ কষ্ট শোক সন্তাপের মধ্যেও রাজা। সে প্রচুর মুড়ি, বেগুনি, আলুর চপ, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ, কিছু সন্দেশ আনিয়া হাজির করিল।

নিতাই বলিল—এ সব কি হবে? এ সমারোহ তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

—খানে তো হোগা ভেইয়া; পেট তো নেই মানেগা। লাগাও খানা। তারপর সে চীৎকার আরম্ভ করিল—এ বাচ্চা! এ বেটা।

ডাকিতেছিল সে ছেলেটাকে। রাজার ছেলের ধরণটা অনেকটা সে আমলের যুবরাজের মতই বটে, দিনরাত্রিই সে মৃগয়ায় ব্যস্ত, একটা গুলতি হাতে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। শালিক, চড়ুই, কোকিল, কাক—যাহা পায় তাহাই হত্যা করে। হত্যার উদ্দেশ্যে হত্যা। খাওয়ার লোভ নাই। কখনও কখনও পাখীর বাচ্চা ধরিয়া পোষে এবং তাহার জন্য ফড়িং শিকার করিয়া বেড়ায়। যুবরাজ বোধ হয় আজ দূরে গিয়া পড়িয়াছিল, সাড়া পাওয়া গেল না। রাজা চটিয়া চীৎকার করিয়া হাঁক দিল—এ শূয়ার কি বাচ্চা, হারামজাদোয়া—

তবুও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রাজা নিতাইকে বলিল—কি-ধার গিয়া ওস্তাদ। তারপর হাসিয়া বলিল—উ বাতঠো—কেয়া বোলতা তুম ওস্তাদ? কেয়া?—তেপান্তরকে মাঠকে উধার—কেয়া? মায়াবিনী, না কেয়া?

এমন ধারার চীৎকারে সাড়া না পাইলে নিতাই বলে—যুবরাজ বোধ হয় তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে মায়াবিনী ফড়িং কি পক্ষিণীর পেছনে ছুটেছে রাজন।

আজ কিন্তু নিতাইয়ের ও-কথাও ভাল লাগিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে একটু ম্লান হাসি হাসিল, কেবল রাজার মনরক্ষার জন্য।

রাজাও আর ছেলের খোঁজ করিল না, দুইটা পাত্র বাহির করিয়া আহার্য্য ভাগ করিয়া একটা নিতাইকে দিয়া, অপরটা নিজে টানিয়া লইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। বলিল—খানে দেও ভেইয়া শূয়ার-কি বাচ্চেকো। নসীবমে ভগবান উস্‌কো নেহি দিয়া, হাম কেয়া করেগা?

নিতাই স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল ঠাকুরঝির কথা। চোখের সম্মুখে হেমন্তের মাঠে প্রান্তরে ফসলে ঘাসে পীতাভ রং ধরিয়াছে, তাহার প্রতিচ্ছটায় রৌদ্রেও পীতবর্ণের আমেজ। ঊর্দ্ধলোকে সূক্ষ্ম ধূলি-আস্তরণের

ধূসরতা। নিতাই যেন চারিদিকে স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল ফুটিয়া উঠিতে দেখিতে-ছিল। কোনদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলেই মনে হইতেছিল, ধূসর দিগন্তের মধ্যে একটি একটি স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল দুলিতেছে।

রাজার খাওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সে তাগাদা দিয়া বলিল—খা লেও ভাই ওস্তাদ।

ম্লান হাসিয়া নিতাই বলিল—না।

—দূর, দূর; খা লেও। পেটমে যানেসে গুণ করেগা। তবিয়ৎ ঠিক হো যায়েগা।

—তবিয়ৎ ভালই আছে রাজন, কিন্তু মুখে রুচবে না।

—কাহে? মুখমে কেয়া হুয়া ভাই?

অকস্মাৎ রাজার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া নিতাই বলিল—সেদিন তুমি শুধাইছিলে—মনের মানুষের কথা।

—হাঁ। রাজা কথাটা বুঝিতে পারিল না, সে ওস্তাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—আমার মনের মানুষ, রাজন, ওই ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝিই আমার মনের মানুষ। ঝরঝর করিয়া নিতাই কাঁদিয়া ফেলিল। রাজার খাওয়া বন্ধ হইয়া গেল, বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে কবিয়ালের দিকে সে চাহিয়া রহিল। সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। অন্য সময় হইলে সে হয়তো বিকট হাস্যে কথাটা এই মুহূর্তে পৃথিবীময় প্রচার করিয়া দিত, কিন্তু ঠাকুরঝির জন্য তাহার বেদনা-ভারাক্রান্ত মন আজ তাহা পারিল না। স্তব্ধ হইয়া দুইজনেই বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে কে ঞানে চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল রাজার স্ত্রী।

ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত স্বরে নিতাই প্রশ্ন করিতে গিয়া শত প্রশ্নের মধ্য হইতে কম্পিত কণ্ঠে কোনমতে উচ্চারণ করিল কেবল একটি কথা—কি হ'ল?

রাজার স্ত্রী যেন অগ্নিস্পৃষ্ট বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িল—ডাইন, ডাকিন, রাক্ষস—

তারপর সে অশ্লীল কদর্য্য অশ্রাব্য বিশেষণে নিতাইকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। নিতাইয়ের মুখের উপর আঙুল দেখাইয়া বলিল—তুই, তুই, তুই! তোর নজরেই কচি মেয়েটার আজ এই অবস্থা! এত লোভ তোর? তোর মনে এত পাপ?

আজ ঠাকুরঝিকে নাকি কালী মায়ের ভরনে দাঁড় করানো হইয়াছিল। সকাল হইতে উপবাসী রাখিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে তাহাকে একখানা মন্ত্রপূত পিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া সম্মুখে প্রচুর ধূপ-ধুনা দিয়া কালী মায়ের দেবাংশী একগাছা ঝাঁটা হাতে তাহার সামনে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—কালী, করালী, নরমুণ্ডমালী! ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী, হাকিনী, শাকিনী, রাক্ষস, 'পিচাশ', যে মন্দ করেছে মা, তাকে তুমি নিয়ে এস ধরে। তার রক্ত তুমি খাও মা।

ঠাকুরঝি থরথর করিয়া কাঁপিয়াছিল।

—বল্ বল্? কে তোকে এমন করলে বল্? দোহাই মা কালীর!

ঠাকুরঝি তবুও কোন কথা বলে নাই, কেবল উন্মাদের মত দৃষ্টিতে চাহিয়া যেমন কাঁপিতেছিল তেমনি কাঁপিয়াছিল। এবার বজ্রনাদে হুংকার দিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবাংশী সপাসপ্ মন্ত্রপূত ঝাঁটা দিয়া প্রহার করিয়াছিল, তখন অস্থির অধীর ঠাকুরঝি বলিয়াছিল—বলছি বলছি, আমি বলছি।

সে নাম করিয়াছে নিতাইয়ের, বলিয়াছে—ওস্তাদ, কবিয়াল। আমাকে লালফুল দিলে। তারপর সে উদ্‌ভ্রান্ত মৃদুস্বরে গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল—

"কাল চুলে রাঙা কোসম হেরেছ কি নয়নে?"

রাজার স্ত্রীর মনে পড়িয়াছিল—নিতাইয়ের বাসার জানালা দিয়া দেখা ছবি—নিতাই, ঠাকুরঝির চুলে ফুল গুঁজিয়া দিতেছিল। সে বোনকে সমর্থন করিয়া সচীৎকারে সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

রাজার স্ত্রী চীৎকার করিয়াই সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিল; অবশেষে নিতাইকে গালিগালাজে—শরবিদ্ধ ভীষ্মের মত জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

অন্যদিন হইলে রাজা, স্ত্রীর চুলের মুঠায় ধরিয়া কঞ্চির প্রহারে মুখ বন্ধ করিত। আজ কিন্তু সেও যেন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। নিতাই মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল, সে তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল; গালিগালাজ অভিসম্পাত বিশেষ করিয়া ঠাকুরঝি যাহা বলিযাছে সেই কথা শুনিয়া—সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে।

কতক্ষণ পর ট্রেনের ঘণ্টার শব্দে রাজা সচেতন হইয়া উঠিল। তাহাকেও সচেতন করিয়া দিল। ট্রেনের ঘণ্টা পড়িয়াছে। তিনটার ট্রেন। রাজা স্টেশনে যাইবে, সে নিতাইকে ডাকিল। উঠো ভাই ওস্তাদ, কি করবে বল? হম ইস্টিশানমে যাতা হ্যায়! নিতাই উঠিয়া আসিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায। উদাসীন স্তব্ধ নিতাই ভাবিতেছিল, পথের কথা। কোন পথে গেলে সে এ লজ্জার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, কোন্ পথে গেলে জীবনে শান্তি পাইবে সে?

একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল তাহার সম্মুখে—এই যে ওস্তাদ!

নিতাই নিতান্ত উদাসীনের মতই তাহার দিকে চাহিল। মুহূর্ত্তে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।—তুমি?

লোকটি বলিল—হ্যাঁ আমি। তোমার কাছেই এসেছি।

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ। বড় দাযে পড়ে এসেছি ভাই। বসন পাঠালে।

—বসন?

লোকটি সেই ঝুমুর দলের বেহালাদার।

হেমন্তের ধূসর সন্ধ্যা; সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের সঙ্গে পল্লীর ধোঁয়া ও ধূলার ধূসরতায় চারিদিক আচ্ছন্ন। সন্ধ্যার ট্রেন আসিতেছে। সিগন্যাল ডাউন

করিয়া দিয়া রাজা লাইনের পয়েণ্টে নীল বাত্তি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল নিতাই।

—রাজন!

রাজা ফিরিয়া দেখিল—নিতাই। তাহার পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, গায়ে জামা, গলায় চাদর, বগলে একটি পুঁটলী। রাজা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল —কাঁহা যায়েগা ওস্তাদ?

পাঁচটা টাকা হাতে দিয়া নিতাই বলিল—দুধের দাম, ঠাকুরঝিকে দিও।

রাজা ফিস্ ফিস্ করিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বলিল—মুচিমে জাত দেগা ওস্তাদ? নেহি হোগা?

নিতাই বিস্মিত হইয়া রাজার দিকে চাহিল।

—ঠাকুরঝিকে সাদী হাম বাতিল কর দেগা। তুমারা সাথ ফিন সাদী দেগা। 'সাঙা' দে দেগা।

নিতাই মাথা নীচু করিয়া কিছুক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া হাসিয়া কেবল একটি কথা বলিল—ছি!

—ছি কাহে?

—মানুষের ঘর কি ভেঙে দিতে আছে রাজন? ছি!

রাজা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়াই রহি-

নিতাই বলিল—তুমি বিশ্বাস কর রাজন. আমি কবিগান করি, কিন্তু মন্তুতন্তু কিছু করি নাই। তবে হ্যাঁ, টান—একটা ভালবাসা হয়েছিল। তা ঠাকুরঝিকে নষ্ট আমি করি নাই।

সন্ধ্যার অন্ধকার চিরিয়া বাঁকের মুখে ট্রেনের সার্চ্চ-লাইট জ্বলিয়া উঠিল। নিতাই দ্রুতপদে স্টেশনের দিকে চলিল। এতক্ষণে এই সার্চ্চ-লাইটের আলোতে নিতাইয়ের বেশভূষা ও বগলে পুঁটলী দেখিয়া হাঁকিয়া রাজন প্রশ্ন করিল— কাঁহা যায়েগা ওস্তাদ?

ওদিকে ট্রেনটা সশব্দে কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই শব্দের প্রচণ্ডতায়

নিতাই কিছু বলিল কিনা রাজা বুঝিতে পারিল না। ট্রেনখানা স্টেশনে প্রবেশ করিলে পয়েণ্ট ছাড়িয়া রাজা ছুটিয়া প্লাটফর্ম্মে আসিল।

—ওস্তাদ!—ওস্তাদ।

গাড়ীর কামরা হইতে মুখ বাড়াইয়া নিতাই বলিল—রাজন।

—কাঁহা যায়েগা ভাই?

স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া নিতাই বলিল—বায়না এসেছে ভাই। আলিপুরের মেলায়।

আলিপুরে মহাসমারোহে নূতন মেলা হইতেছে। কিন্তু বায়না কখন আসিল? রাজার মনে চকিতে একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। ঠাকুরঝির দুধের দাম পাঁচ টাকা মিটাইয়া দিয়া সে বায়না লইয়া কবিগান করিতে চলিয়াছে। মিথ্যা কথা। সে বলিল—ঝুট বাত।

—না রাজন। এই দেখ, লোক।

রাজা দেখিল, সেই ঝুমুর দলের বেহালাদার। দলনেত্রী প্রৌঢ়া মেলায় গিয়াছে, সেখান হইতে নিতাইয়ের কাছে লোক পাঠাইয়াছে। তাহাদের দলের কবিয়াল পালাইয়া গিয়াছে। বসন ঝগড়া করিয়া তাহাকে লাথি মারিয়াছে।

নিতাই বলিল—আলিপুর, আলিপুর থেকে কান্দারা, কান্দারা থেকে কাটোয়া, কাটোয়া থেকে অগ্রদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ থেকে—

ট্রেনের বাঁশী তাহার কথাটাকে ঢাকিয়া দিল।

বাঁশী থামিল, ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল। রাজা ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে প্রশ্ন করিল—অগ্রদ্বীপসে কাঁহা? দুনিয়া ভোর কি তুমারা বায়না আয়া হ্যায়? উতার আও ওস্তাদ, উতার আও।—রাজার কণ্ঠের আর্ত্তমিনতি মুহূর্ত্তের জন্য নিতাইকে বিচলিত করিয়া তুলিল। পরক্ষণেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিল! মনে মনেই বলিল—হ্যাঁ, দুনিয়া ভোর বায়না আয়া হ্যায় রাজন।

ইতিমধ্যেই কিন্তু ট্রেন প্লাটফর্ম্ম পার হইয়া দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া গেল।

তেরো

ট্রেনখানা চলিতেছিল দক্ষিণমুখে। বাঁ পাশে পূর্ব্বদিগন্তে চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠিতেছিল—আকাশে পাতলা মেঘের আভাস দেখা দিয়াছে, কুয়াসার মত পাতলা মেঘের আবরণের আড়ালে চাঁদের রঙ ঠিক গুঁড়া হলুদের মত হইয়া উঠিয়াছে। নূতন বরের মত চাঁদ যেন গায়ে হলুদ মাখিয়া বিবাহ-বাসরে চলিয়াছে। নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাঁদের দিকেই চাহিয়া ছিল। ছোট লাইনের ট্রেনগুলি বড় বেশী দোলে, আর শব্দও করে বড় লাইনের ট্রেনের চেয়ে অনেক বেশী—শূন্য কুম্ভের মত। যে লোকটি নিতাইকে লইতে আসিয়াছিল, সে ঝুমুর দলের বায়েন অর্থাৎ বাদ্যকর, সে বেশ খানিকটা নেশার আমেজে ছিল, ট্রেনের এই অত্যধিক শব্দে এবং ঝাঁকুনিতে বিরক্ত হইয়া সে বলিল—এ যে ঝাঁপতাল লাগিয়ে দিলে ওস্তাদ।

লোকটি ট্রেনের শব্দের সঙ্গে মিলাইয়া বেঞ্চ বাজাইয়া বাজনা আরম্ভ করিয়া দিল। দেখাদেখি ওপাশের বেঞ্চে দুইটা ছোট ছেলে ট্রেনের শব্দের মর্ম্মার্থ উদ্ধার আরম্ভ করিল। একজন বলিল, কাঁচা-তেঁতুল—পাকা-তেঁতুল! কাঁচা-তেঁতুল—পাকা-তেঁতুল!

নিতাইয়ের মন কিন্তু কিছুতেই আকৃষ্ট হইল না। চাঁদের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল—ঠাকুরঝির কথা, রাজনের কথা, যুবরাজের কথা, বণিক মাতুলের কথা, বিপ্রপদর কথা, কৃষ্ণচূড়াগাছটির কথা, স্টেশনটির কথা, গ্রামখানির কথা। মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হইতেছিল—পরের স্টেশনেই সে নামিয়া পড়িবে। কিন্তু তাও সে পারিল না। হঠাৎ একসময়ে সে অনুভব করিল—নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার চোখ কখন জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটু-খানি ম্লান হাসিয়া এতক্ষণে সে সচেতন হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই স্বাভাবিক সুকণ্ঠে সে গান ধরিল—আহা! বার দুই-তিন তা-না-না করিয়া সুর ভাঁজিয়া গান ধরিল—

"চাঁদ তুমি আকাশে থেকো আমি তোমায় দেখব খালি।
ছোঁয়ার সাধে কাজ নাইকো—সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।"

বাজনদারটা নেশার মধ্যেও সজাগ হইয়া বসিয়া বলিল—বাহবা ওস্তাদ! গলাখানা পেয়েছিলে বটে বাবা। বলিয়াই সে ধরতার মুখে বেঞ্চে একটা প্রকাণ্ড চাপড় মারিয়া বলিল—হেঁই—তা—তেরে কেটে—তা—তা। গাহিতে গিয়া নিতাই পরের কলি বদলাইয়া দিল। মন যেন গানে ভরিয়া উঠিয়াছে, সুরে ফেলিলেই সে গান হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে—

"না না, তাও করো মার্জনা—আজ থেকে আর তাও দেখব না—
জানতাম নাকো এই কু-চোখের দিষ্টিতে বিষ দেয় হে ঢালি।"

স্টেশনের পর স্টেশন অতিক্রম করিয়া ট্রেন চলিয়াছিল। নিতাই গানখানা বার বার ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিয়া চলিয়াছে। গাহিয়া যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছে না।

ট্রেনটা খট্ খট্ শব্দে লাইনের জোড়ের মুখ অতিক্রম করিয়া একটা স্টেশনে আসিয়া ঢুকিল। স্টেশনে জমাদার হাঁকিতেছে—বাব্বাবা, রামজীবন পু—র্! বাজনদার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া স্টেশনটার চেহারা দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া বলিল—ওই, চলে আইচে লাগচে। নামো—নামো—ওস্তাদ নামো।

নিতাই নামিল, কিন্তু গান বন্ধ করিল না। গলা নামাইয়া মৃদুস্বরে গাহিতে গাহিতেই সে স্টেশন পার হইয়া পথে নামিল—

"তাই চলেছি দেশান্তরে আঁধার খুঁজেই ফিরব ঘুরে,
কাকের মুখে বার্তা দিও—ষোল কলায় বাড়ছ খালি।"

স্টেশন হইতে মাইল দুয়েক হাঁটা-পথ ধরিয়া নিতাইয়ের মনের অবসাদ অনেকখানি কাটিয়া আসিল। রাসপূর্ণিমায় আলিপুরের মেলা বিখ্যাত মেলা। কাতারে কাতারে লোক যায় আসে। চতুর্দ্দশীর প্রায় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মধ্যেও দুই মাইল দূরবর্ত্তী মেলাটার উপরের আকাশখণ্ড আলোর আভায়

ঝলমল করিতেছে। ইহার পূর্ব্বেও নিতাই দেখিবার জন্য এ মেলায় আসিয়াছে। কেবল আলো—আলো আর আলো, সেই আলোর ছটায় উজ্জ্বল পণ্যসম্ভার-ভরা সারি সারি দোকান, আর পথে ঘাটে মাঠে শুধু লোক—লোক আর লোক। মেলাটার স্থানে স্থানে নানা আনন্দের আসর—যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ঝুমুর। চারিপাশে কাতারে কাতারে দর্শক। এমনই একটি আসরে আজ তাহাকে গান করিতে হইবে। কবি ও ঝুমুর দল এক হইয়া অপর একটি এমনই দলের সহিত পাল্লা দিয়া গান করিবে। সঙ্গের লোকটি বলিয়াছে, তাহাকেই মুখপাত—অর্থাৎ মুখপাত্র হিসাবে গান করিতে হইবে। তাহাদের যে লোকটা এমন আসরে গান করিত, সে লোকটা বসন্তের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তাহার প্রণয়িনীকে লইয়া অন্যদলে চলিয়া গিয়াছে। তাহার গলা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, লোকটাও ছিল দুর্দ্দান্ত মাতাল, গান বাঁধিবার ক্ষমতাও তাহার আর তেমন ছিল না। গতকাল একটা গানের সুরতাল লইয়া বসন্তের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়াছিল। দুইজনেই ছিল মত্তাবস্থায়। শেষ পর্য্যন্ত লোকটা বসন্তকে অশ্লীল গাল দেওয়ায় বসন্ত তাহার পিঠে ঝাঁটার আঘাত বসাইয়া দিয়াছিল। ফলে লোকটা তাহার প্রণয়িনী মেয়েটাকে লইয়া অন্য দলে চলিয়া গিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রৌঢ়া নিতাইকে স্মরণ করিয়াছে। মান-সম্মানের সমস্ত ভরসা এখন নিতাইয়ের উপর। সেইজন্য একান্ত অনুরোধ জানাইয়া ঝুমুর দলের নেত্রী প্রৌঢ়া তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে। মনে মনে একটা খুব ভাল ধুয়া রচনা করিতে করিতে সে পথ চলিতেছিল—দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ওই আলোকোজ্জ্বল আকাশের দিকে। ঠাকুরঝি, রাজন, 'যোবরাজ', কৃষ্ণচূড়ার গাছ সমস্তই সম্মুখের ওই ভাস্বর আলোকে আলোকিত তাহার নিজের পিছনের দীর্ঘ ছায়ার অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। সে যত সম্মুখে আগাইয়া চলিয়াছে, পশ্চাতের ছায়া দৈর্ঘ্যে পরিধিতে তত বড় এবং ঘন হইয়া উঠিতেছে—সেই ক্রমবর্দ্ধমান ছায়ার অন্ধকারে ক্রমশ যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

তাহার মনকে টানিতেছে মেলার আসর। ঠাকুরঝির চিন্তা, সেখানকার

সকলের চিন্তাকে দুঃখকে ছাপাইয়া মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা জাগিয়া উঠিতেছে। আজ সে কবিয়াল হইয়া আসরে নামিবে। চণ্ডীমায়ের মেলায় মহাদেবের সঙ্গে পাল্লা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে এক আর এ এক। আজ সে সত্যই কবিয়াল বলিয়া স্বীকৃত হইয়া মেলায় গাওনা করিতে চলিয়াছে। এমন ভাগ্য কখনও হইবে, সে ভাবে নাই।

সে গাহিবে বসন্ত নাচিবে। অপর মেয়েগুলিকে সে নাচিতে দিবে না। আসরে বসিয়া তাহারা দোয়ারকি করিবে। কল্পনা করিতে করিতে তাহার মনে একটা কলি আসিয়া গেল:

"গোকুলের কূলে কালো কালিন্দীরই জলে—হেলে দোলে সোনার কমলা।
কালো হাতে ছুঁয়ো নাকো, লাগিবে কালি—ওহে কুটিল কালা।"

সঙ্গে সঙ্গেই সুরে ফেলিয়া সে গুনগুন করিয়া গান ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অপর দলের কবিয়াল নাকি বেজায় রঙদার লোক, গোড়া হইতেই সে রঙ তামাসা আরম্ভ করিয়া দেয়। রঙের জোরেই সে আসর জিতিয়া লয়। নিতাই কিছুতেই প্রথম হইতে রঙ আরম্ভ করিবে না। মানুষ কেবল মদই ভালবাসে, দুধে তাহার অরুচি—এ কথা নিতাই বিশ্বাস করে না। যদি অরুচি দেখে তবে মদই সে দিবে। দেখাই যাক না।

হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া নিতাইকে দাঁড়াইতে হইল। মেলার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, পথের জনতা ঘন হইয়া উঠিয়াছে। কবিয়ালির চিন্তায় বিভোর হইয়াই নিতাই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলিতেছিল, হঠাৎ লোকটার সহিত ধাক্কা বেশ একটু জোরেই লাগিয়া গেল। লোকটা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—কানা না কি? একেবারে হন্যে হয়ে ছুটেছে!

নিতাই অবনত হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—অন্যায় হয়ে গিয়েছে ভাই।

লোকটা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া বলিল—অঃ, একেবারে ঠাই করে লেগেছে—

নিতাই বলিল—তবে দোষ একা আমার নয়, বেবেচনা ক'রে দেখুন।

লোকটা এবার হাসিয়া ফেলিল।

কবি

এই অন্ধকার মোড়টা ফিরিয়াই মেলা। মেলার একপ্রান্তে একটা গাছের তলায় খড়ের ছোট ছোট ঘর বাঁধিয়া ঝুমুরের দলটি আস্তানা গাড়িয়াছে। আশে-পাশে আরও গোটা কয়েক ঝুমুরের দল। তাহার পরই একটা খোলা জায়গায়—বেশ্যাপল্লী।

সেখানে উন্মত্ত জনতার উচ্ছৃঙ্খল কোলাহলে নিতাইয়ের গানের কলি দুইটা কোথায় হারাইয়া গেল।

প্রৌঢ়া গাছতলায় চ্যাটাই পাতিয়া লণ্ঠনের আলোয় সুপারি কাটিতেছিল—মেয়েদের জন দুইয়েক রান্নায় ব্যস্ত। একটা খড়ের কুঠুরীতে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, মেয়েপুরুষের সম্মিলিত হাসির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত। তাহার মধ্যে নিতাই চিনিল—বসন্তের হাসি, এমন ধারালো খিলখিল হাসি বসন্ত ভিন্ন কেহ হাসিতে পারে না, অন্তত ঝুমুর দলের কোন মেয়ে পারে না।

নিতাইকে দেখিয়াই প্রৌঢ়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—এস, এস, বাবা এস। আমি তোমার পথ চেয়ে রয়েছি।

রন্ধনরতা মেয়ে দুইটি রান্না ছাড়িয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,—হাসিমুখে বলিল—এসে গেয়েছে—লাগছে!

নিতাই হাসিয়া বলিল—এলাম বৈকি।

প্রৌঢ়া বলিল—ওলো, বাবাকে আমার চা ক'রে দে। মুখে হাতে জল দাও বাবা।

একটি মেয়ে বলিল—খুব ভাল গান করতে হবে কিন্তুক।

অপর মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া আলোকোজ্জ্বল কুঠুরির দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল—ওলো বসন, কবিয়াল আইচে লো। তোর কালো-মাণিক।

নিতাই হাসিয়া সংশোধন করিয়া দিল—কালো-মাণিক নয়, ময়লা-মাণিক।

বসন্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল—তাহার পা টলিতেছে, ডাগর চোখের পাতা ভারী হইয়া নামিয়া আসিয়াছে, নাকের ডগায় চিবুকে কপালে ঘাম দেখা দিয়াছে,—সে আসিয়া নিতাইয়ের হাত ধরিয়া বলিল—না, তুমি

আমার কালো-মাণিক। আমার মান রেখেছ তুমি, ছিদ্র কুম্ভে জল রেখেছ—তুমি আমার কালো-মাণিক।

নেশার প্রভাবে বসন্তের কণ্ঠস্বর স্বভাবতই খানিকটা আবেগময় হইয়াছিল—কিন্তু সে আবেগ, এই কথা কয়টি বলিবার সময় যেন অনেক গুণে বাড়িয়া গেল।

প্রৌঢ়া রহস্য করিয়া বলিল—তা ব'লে যেন কাঁদতে বসিস না বসন, নেশার ঘোরে!

নেশায় অর্দ্ধনিমীলিত চোখ দুইটি বিস্ফাবিত করিয়া বসন এবার খানিকক্ষণ প্রৌঢ়ার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—আলবৎ কাঁদব, কালো-মাণিকের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দোব। এমন যতন ক'রে কে চা ক'রে দেয়—কে গায়ের ধুলো মুছিয়ে দেয়? আজ সারারাত কাঁদব—। বলিতে বলিতেই সে আপনার ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল—এই নাগরেরা, যাও, চলে যাও তোমরা। আর আমোদ নেহি হোগা।

প্রৌঢ়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া বসন্তর হাত ধরিয়া বলিল—এই বসন! বসন! ছি! করছিস কি? খদ্দেব লক্ষ্মী—তাড়িয়ে দিতে নাই।

বসন প্রৌঢ়ার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—আমি কাঁদতেও পাব না মাসী, আমি কাঁদতেও পাব না?

নিতাই উঠিয়া আসিয়া বলিল—না, কাঁদবে কেনে? ছি!

—তবে তুমিও এস! তুমি গান করবে আমি নাচব।

—আচ্ছা, আচ্ছা। প্রৌঢ়া বলিল—যাবে! এই এল, চা খেয়ে জিরুক খানিক, তারপর যাবে; তু চল ততক্ষণ।

—চা? না, চা খাবে কি! চা খাবে কেনে? খুব ভাল মদ আছে—মদ খাবে! এস। বসন্ত নিতাইয়ের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

নিতাই হাত টানিয়া লইয়া বলিল—ছাড়।

—না।

—মদ আমি খাই না।

—খেতে হবে তোমাকে। আমি খাইয়ে দোব।

—না।

বসন্ত ঘাড় বাঁকাইয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—আলবৎ খেতে হবে তোমাকে।

প্রৌঢ়া বলিল—মাতলামি করিস না বসন, ছাড়, ঘরে যা।

তেমনি বঙ্কিমগ্রীবাভঙ্গি করিয়া চাহিয়া বসন নিতাইকে বলিল—যাবে না তুমি? মদ খাবে না?

—না।

—আমার কথা তুমি রাখবে না?

—এ কথাটি রাখতে পারব না ভাই।

বসন্ত নিতাইকে ছাড়িয়া দিল। তারপর টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়া বলিল—বন্ধ করে দেও দরজা।

প্রৌঢ়া আক্ষেপ করিয়াই বলিল—মেয়েটা ওই মদ খেয়েই নিজের সর্ব্বনাশ করলে। এত মদ খেলে কি শরীর থাকে।

নিতাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। যে মেয়েটি চা করিতে গিয়াছিল, সে একটা কলাই-করা গ্লাসে চা আনিয়া বলিল—লাও, চা খাও ওস্তাদ।

হাসিয়া নিতাই চায়ের গ্লাসটি লইয়া বলিল—লক্ষ্মী দিদি আমার, বাঁচালে ভাই!

প্রৌঢ়া হাসিয়া বলিল—বাঃ, বেশ হয়েছে। নির্ম্মলা, তু ওস্তাদকে দাদা বলে ডাকবি। ভাইদ্বিতীয়েতে ফোঁটা দিবি, ওস্তাদকে কিন্তুক কাপড় লাগবে!

নিতাই পরম প্রীত হইয়া বলিল—নিচ্চয়!

অপর মেয়েটি রান্নাশাল হইতেই বলিল—আমি কিন্তুক ঠাকুরঝি সম্বন্ধ পাতালাম।

প্রৌঢ়া খুশী হইয়া সায় দিয়া বলিল—বেশ বলেছিস ললিতে, বেশ বলেছিস! বসন তোকে দিদি বলে।

নিতাইযেব হাত হইতে চায়ের গ্লাসটা খসিযা পড়িযা গেল—ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি!

*   *   *

রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে সে এক বীভৎস দৃশ্য। নিতাইযেব কাছে এ দৃশ্য অপরিচিত নয। মেলা উৎসবের আলোকোজ্জ্বল সমারোহের একটি বিপরীত দিক আছে, সে দিকটি সহজে মানুষেব চোখে পড়ে না। আলোকেব বিপরীত অন্ধকারে ঢাকা সে দিক। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা বিপরীত দিকটিতে মাটির তলার সরীসৃপের মত মানুষের বুকেব আদিম প্রবৃত্তির ভযাবহ আত্মপ্রকাশ সেখানে। অবশ্য নিতাইযের যে-পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্ম, সে পারিপার্শ্বিকও অবস্থাপন্ন সভ্যসমাজের ছাযায অন্ধকারে ঢাকা বিপরীত দিক। সভ্যসমাজেব আবর্জ্জনা ফেলার স্থান। সেখানেও অনাবিষ্কৃত চির-অন্ধকার—নরকলোকের মত চির-অন্ধকার। এ ধবনের বীভৎসতার সঙ্গে তাহার পরিচয না-থাকা নয। তবুও নিতাই হাঁপাইযা উঠিল।

নির্ম্মলা এবং ললিতার ঘরেও আগন্তুক আসিযাছে। মত্ত জড়িত কণ্ঠের অশ্লীল হাস্যপরিহাস চলিতেছে।

বসন্তের ঘর হইতে সে লোক দুইটা চলিযা গিযাছে, আবার নূতন আগন্তুক আসিযাছে।

প্রৌঢ়া দলের পুরুষগুলিকে লইযা মদ খাইতে বসিযাছে। নিতাইকে আবার একবার চা দেওযা হইযাছে সে ভাবিতেছিল ঠাকুরঝিকে; ইচ্ছা হইতেছিল—এখনই এখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিযা সে পলাইযা যায। কলঙ্ক তো তাহার হইযাই গিযাছে, সে কলঙ্কের ছাপ ঠাকুরঝির অঙ্গেও লাগিযাছে। হযতো তাহার স্বামী এ জন্য তাহাকে পরিত্যাগই করিবে—বাড়ী হইতে তাড়াইযা দিবে। দশের ভযে তাহার বাপও হযতো তাহাকে বাড়ীতে স্থান দিবে না। আজ আর তাহার লজ্জা নাই, ঘর ভাঙিবার ভয নাই। তবে? আজ তো নিতাই গিযা ঠাকুরঝির হাত ধরিযা বলিতে পারে—"এস, আজ

হইতে তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি।" নিতাই চঞ্চল হইয়া উঠিল। আবার অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে স্থির করিল—চলিয়াই সে যাইবে, ইহাদের এই মেলার গানের আসর সারিয়া চলিয়া যাইবে; কিন্তু গ্রামে নয়, অন্য যেখানে হোক—এত বড় দুনিয়ায় যেদিকে মন চায় সেই দিকে চলিয়া যাইবে। মুহূর্তে পূর্ব্বের চিন্তা কল্পনা সব তাহার পাল্টাইয়া গিয়াছে—না না, সে হয় না। ঠাকুরঝির ভাঙা ঘর আবার জোড়া লাগিবে, তাহার সুখের সংসার আবার সুখে ভরিয়া উঠিবে।

ঠাকুরঝি তাহাকে ভুলিয়া যাক। না দেখিলেই ভুলিয়া যাইবে। সন্তান-সন্ততিতে তাহার কোল ভরিয়া উঠুক, সুখে সম্পদে সংসার উথলিয়া পড়ুক, স্বামী সন্তান সংসার লইয়া সে সুখী হোক।

চৌদ্দ

প্রায় বিনিদ্র রাত্রিই সে যাপন করিয়াছিল। ভোরে উঠিয়াই সে বাহির হইয়া পড়িল। একটা প্রকাণ্ড দীঘিকে মাঝখানে রাখিয়া দীঘির চারি পাশে মেলা বসিয়াছে। রাসপূর্ণিমায় রাসোৎসব মেলা; দীঘির পূর্ব্ব দিকে রাধাগোবিন্দের মন্দির; পাশেই সেবাইত বৈষ্ণব বাবাজীর আখড়া; মুখ হাত ধুইয়া নিতাই সেই রাধাগোবিন্দের মন্দিরে গিয়া বসিল। রাসমঞ্চে অষ্টসখীপরিবৃতা রাধাগোবিন্দ তাহার বড় ভাল লাগিল। সেখানেই বসিয়া সে গান রচনা আরম্ভ করিয়া দিল। রাধাকৃষ্ণের যুগল-রূপের স্তবগান। প্রথমে গুন গুন করিয়া গানখানি রচনা শেষ করিয়া—বেশ গলা ছাড়িয়া গান আরম্ভ করিল। মিষ্ট গলার গানে বেশ কয়েকজন লোকও জমিয়া গেল। আখড়ার মোহন্তও বাহির হইয়া আসিলেন।

নিতাই গাহিতেছিল—

"আশ মিটায়ে দেখ রে নয়ন যুগল-রূপের মাধুরী।"

মোহন্ত চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া তাল দিতে দিতে একজনকে বলিলেন—খোল আন তো বাবা।

মোহন্ত খোল লইয়া নিজেই সঙ্গত আরম্ভ করিয়া দিলেন। গান শেষ হইলে বলিলেন—পদাবলী জান বাবা?

নিতাই পদাবলী জানে না। সে বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিল—আজ্ঞে?

—মহাজন-পদাবলী বাবা—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাসের পদ?

নিতাই হাত জোড় করিয়া বলিল—প্রভু, অধীনের অধম ডোমকুলে জন্ম। কি করে জানব বাবা?

হাসিয়া মোহন্ত বলিলেন—জন্ম তো বড় নয় বাবা, কর্ম্মই বড়, মহাপ্রভু আমার আচণ্ডালে কোল দিয়েছেন।

নিতাইয়ের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, বলিল—কর্ম্মও যে অতি হীন প্রভু; ঝুমুর দলে—বেশ্যাদের সঙ্গে থাকি, কবিগান করি।

—কবিগান কর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু।

—যে গান তুমি গাইলে, সে কি তোমার গান?

মাথা নত করিয়া সলজ্জ হইয়া নিতাই বলিল—আজ্ঞে—হ্যাঁ।

মোহন্ত সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—ভাল ভাল! চমৎকার গান! তারপর বলিলেন—কর্ম্ম তোমার তো অতি উচ্চ কর্ম্মই বাবা। তোমার ভাবনা কি! যাঁরা কবি, তাঁরাই তো সংসারের মহাজন, তাঁরাই তো সাধক। কবির গানে ভগবান বিভোর হন। চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনে মহাপ্রভু ভাবে বিভোর হয়ে নাচতেন।

টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল নিতাইয়ের চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল, সে বলিল—কিন্তু সঙ্গ যে অতি নীচ সঙ্গ বাবা, বেশ্যা—

মোহন্ত হাসিয়া হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে নিতাইকে বাধা দিলেন, বলিলেন—

প্রভুর সংসারে নীচ কেউ নাই বাবা। নিজে, পরে নয়—নিজে নীচ হলে সেই ছোঁয়াচে পরে নীচ হয়। নীল চশমা চোখে।-য়েছ বাবা? সূর্য্যের আলো নীলবর্ণ দেখায়। তোমার চোখের চশমার রঙের মত তোমার মনের ঘৃণা পরকে ঘৃণ্য করে তোলে। মনের বিকারে এমন সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যেতে মানুষ আত্মহত্যা করে। আর বেশ্যা? বাবা, চিন্তামণি বেশ্যা—সাধক বিল্বমঙ্গলের প্রেমের গুরু। জান বাবা, বিল্বমঙ্গলের কাহিনী?

নিতাই ব্যগ্র-ব্যাকুলতায় মোহন্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দয়া করে যদি বলেন বাবা—

মোহন্ত সস্নেহে হাসিয়া পাশে অল্পদূরে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—এইখানে ... ব'স বাবা। না না, কোনো সঙ্কোচ নাই, মহাপ্রভুর দাসানুদাস—আমাদের কাছে ছোট কেউ নয়, আর তুমি তো কবি, তুমি মহাজন—এস, এইখানে ব'স।

তিনি বিল্বমঙ্গলের কাহিনী আরম্ভ করিলেন। কাহিনী শেষ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—অবস্থা গতিকে যেখানেই পড়বে বাবা, সেইখানেই সন্তুষ্ট মনে থাকবে—আপনার কর্ম্ম করে যাবে। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে—কিন্তু একবিন্দু পাঁক তার গায়ে লাগে না—কথা শেষ করিয়া তিনি সস্নেহে খানিকটা হাসিলেন। তারপর আবার বলিলেন—আচ্ছা বাবা, তুমি দুপুরে এখানে ...স—গোবিন্দের প্রসাদ পাবে এইখানে।

নিতাই ফিরিয়া আসিল—অদ্ভুত এক মন লইয়া। ঝুমুর দলের মেয়েগুলি গান বাজনায় নাচে সুরে তালে পারদর্শিনী বলিয়া কবিয়াল নিতাই তাহাদের সম্ভ্রম করিত, কিন্তু মনের গোপন কোণে ঘৃণা সঞ্চিত ছিল; আজ এই মুহূর্ত্তে সেটুকুও যেন নাই। মনটা যেন তাহার জুড়াইয়া গিয়াছে। ফিরিবার পথে বার বার তাহার চোখে জল আসিল। কাপড়ের খুঁটে সে চোখ মুছিল আর মনে মনে বাবাজীকে প্রণাম করিল। মনে মনে সংকল্প করিল গোবিন্দের প্রসাদের সঙ্গে সে বাবাজীর প্রসাদকণাও চা...য়া লইবে।

ঝুমুর দলের আস্তানায় আসিয়া সে অবাক হইয়া গেল। মনে হইল, এ বুঝি গোবিন্দের কৃপা!

আশ্চর্য্য! আজিকার প্রভাতের এই স্থান ও পাত্র-পাত্রীগুলির রূপের সহিত গতরাত্রির স্থান ও পাত্র-পাত্রীগুলির এতটুকু মিল নাই! সমস্ত স্থানটা গোবরমাটি দিয়া অতি পরিপাটীরূপে নিকাইয়া ফেলা হইযাছে। গাছতলায একটি কলার পাতায অনেকগুলি ফুল; মেয়েগুলি স্নান সারিয়া জলসিক্ত চুল পিঠে এলাইয়া দিযা শান্ত ভাবে বসিয়া আছে; সকলের পরনেই লালপাড় শাড়ী—একটি নিবিড এবং গভীর শান্ত পবিত্রতার আভাস যেন সর্ব্বত্র পরিস্ফুট।

বসন্ত পিছন ফিরিয়া বসিযা ছিল, নির্ম্মলা ও ললিতা বসিযা ছিল এইদিকে মুখ ফিরাইয়া। তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—বেশ মানুষ যা হোক তুমি! এই এত বেলা পর্য্যন্ত কোথা ছিলে বল দেখি?

বসন্ত মুখ ফিরাইযা চাহিল। নিতাই মৃদু হাসিল। বসন্ত মুখ ফিরাইযা লইল এবং পরক্ষণেই সে উঠিযা রান্নাশালে চলিযা গেল। নিতাই আসিযা নির্ম্মলা ও ললিতার কাছে বসিযা বলিল—বাঃ, ভারি ভাল লাগছে কিন্তক; চারিদিক নিকানো, তোমরা সব চান করেছ, লাল-পেড়ে কাপড় পরেছ—

হাসিযা নির্ম্মলা বলিল—আজ যে নক্ষীপুজো গো দাদা!

—লক্ষীপুজো?

—হঁ্যা। পুর্ণিমে বেরস্পতির, আমাদের বারোমেসে নক্ষী আজ।

নিতাই অবাক হইযা গেল! এতদিন মেলামেশা করিয়াও এ কথাটা সে জানিত না। ইহাদেরও ধর্ম্মকর্ম্ম আছে! সে প্রশ্ন করিল—কখন হবে লক্ষীপুজো?

—সেই সন্ধ্যেবেলায়। আজ তোমার পাল্লা আরম্ভ হতে সেই ল'টার আগে লয়।

প্রৌঢ়া বলিল—বাবা আমার ভক্তিমান লোক। ভাল লোক।

ললিতা বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিল—লোক ভাল, কিন্তুক পাল্লা মোগলের। খানা—

প্রৌঢ়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল—চুপ।

বসন্ত আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাতে একটি গ্লাস। গ্লাসটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল—লাও।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—কি?

মুখ মুচকাইয়া বসন বলিল—মদ লয়, ধর!

নিতাই গ্লাসটি লইয়া দেখিল—সদ্য প্রস্তুত ধূমায়িত চা।

ললিতা হাসিয়া বলিল—বুঝে-সুঝে খেও ভাই, জামাই-বশীকরণের ওষুধ দিয়েছে।

বসন্ত চলিয়া যাইতেছিল, সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—আগুন পোড়ারমুখে।

নিতাই হাসিয়া কথাটা নিজের গায়ে লইয়া বলিল—তাই দাও ভাই, কয়লার ময়লা ছুটে যাক। আগুনের পারা বরণ হোক আমার। জান তো?

"আগুনের পরশ পেলে কালো আঙার রাঙা বরণ"

লতিকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—যাও কেনে, আগুনের শীষ তো জ্বলছেই, গায়ে গায়ে পরশ নিয়ে আগুন ধরিয়ে নিয়ে এস।

বসন্তের চোখে ছুরির ধার খেলিয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে সে হাসিয়া বলিল—মদ জ্বলে দেখেছিস? বলিয়া নিজের দেহখানা দেখাইয়া সে বলিল—এ হ'ল মদের আগুন! বলিয়া সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

নিতাইয়ের মনে পড়িল গত রাত্রের কথা; সে হাসিল।

মেয়েদের সেদিন সমস্ত দিন উপবাস। সে উপবাস তাহারা নিষ্ঠার সহিত পালন করিল। সন্ধ্যায় ফলমূল, সন্দেশ, দুধ, দই, নানা উপচারে ও ফুল, ধূপ,

দীপ নানা আয়োজনে পরম ভক্তির সহিত তাহারা লক্ষ্মীপূজা করিল। পূজা শেষে প্রৌঢ়াকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি সুপারি হাতে ব্রতকথা শুনিতে বসিল। নিতাই অদূরেই বসিয়া ছিল। অপর পুরুষগুলি দূরে মদ্যপান করিতে বসিযাছে। মদ খাইতে খাইতেই তাহারা রাত্রির আসরের জন্য সাজ-সজ্জা করিতেছে। বেহালাদার বেহালার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত; বার্নিশের শিশি, তার, রজন লইয়া বসিযাছে। দোহারটা ঢুলীর সহিত তাল হইয়া তর্ক বাধাইয়াছে। হাতে তাল দিতেছে, আর বলিতেছে—এই—এই—এই ফাঁক। বাজনদার আপন মনেই বাজাইযা চলিযাছে। সে দোহারের কথা গ্রাহ্যও করিতেছে না।

মহিষের মত লোকটা মদের ঝোঁকে ঝিমাইতেছে। মেযেদের খাওযা-দাওযা শেষ হইলেই গান আরম্ভ হইবে। তাহারা যুদ্ধের ঘোড়ার মত মাতিযা প্রস্তুত হইতেছে।

প্রৌঢ়া ব্রতকথা বলিতেছিল—

"পুরাকালে এক বেশ্যা ছিল অতি গরীব—তার না ছিল রূপ, না ছিল সুকণ্ঠ। কিন্তু তার ছিল ভক্তি। সেই ভক্তির বশেই সে নিত্য স্নান করিত, লক্ষ্মীর ব্রত করিত, সন্ধ্যায় ঘরে ধুপ দিত, তাহার ঘরের প্রদীপটি নিত্যমার্জ্জনায ঝক্‌মক করিত। লক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া সে প্রসাধন করিয়া নাগর আহ্বান করিতে আপনার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইত। নাগর আসিলে তাহাকে সে স্বামীর মত ভক্তি করিত, যত্ন করিত। তাহার মুখের কথায ঝরিত মধু; ব্যবহারে থাকিত পত্নীর নিষ্ঠা, যাচ্ঞায় থাকিত বিনয়; লোকে খুশী হইযা যাহা দিত তাহাতেই সে তৃপ্ত হইত। কোন রাত্রেই একজনের পর আর কাহাকেও ভজনা করিত না। প্রভাতে উঠিয়া সে গৃহমার্জ্জনা করিত, নিত্য বিছানাগুলি পরিষ্কার করিত, অতিথি-অভ্যাগতকে ভাবিত দেবতা।

আর একজন ছিল অতি সুন্দরী ধনী মাতার কন্যা। রূপের অহঙ্কারে অহঙ্কৃতা দর্পিতা। নাগরকে সে বলিত কটু কথা। ব্রত বার উপবাসে তার ছিল বিষম বিরাগ। লক্ষ্মীর চৌকির উপরে সে রাখিত চুলের দড়ি, তেলের বাটি, মদের

বো ত্তল। প্রতি রজনীতেই বহু নাগর লইয়া প্রমোদ ছিল তাহার বিলাস।

তারপর ক্রমে লক্ষ্মীর কৃপায় ওই কালো ভক্তিমতী মেয়েটি একদা রূপসায়রে স্নান করিয়া হইল রূপসী, কণ্ঠস্বর হইল মধুক্ষরা। ক্রমে সে এক নাগরকে ভজনা করিয়া পরিশেষে সাগর-সঙ্গমে তাহাকেই পতি-কামনা করিয়া করিল দেহত্যাগ। আর দর্পিতা উচ্ছৃঙ্খলা রূপবতী মেয়েটা লক্ষ্মীর ছলনায় রূপসায়রে স্নান করিতে গিয়া একবার স্নান করিয়া দেখিল—রূপ অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। লুব্ধা আরও রূপের প্রত্যাশায় আবার স্নান করিল—ফলে সকল রূপ ঝরিয়া গিয়া সে হইয়া গেল জরতী বৃদ্ধার মত, কণ্ঠস্বর হইয়া গেল কাকের মত কর্কশ। অবশিষ্ট জীবন ভিক্ষায় নির্বাহিত করিতে হইল।"

কথা শেষ করিয়া হুলুধ্বনি দিয়া সকলে লক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। তারপর প্রসাদ লইয়া যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। প্রৌঢ়া পুরুষদের ডাকিয়া বলিল—যাও সব, প্রসাদ লাও গা। অর্থাৎ নাও গে যাও।

নিতাই একটা গাছতলায় বসিয়া ছিল, বসন নিজের ঘরে ঢুকিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া ডাকিল—শোন।

—আমাকে বলছ?

—হ্যাঁ।

আজ এই নিষ্ঠাবতী বসন্তর কাছে যাইতে নিতাইয়ের একটুকু সঙ্কোচ হইল না। ঘরে ঢুকিয়া সে পরমাত্মীয়ের মত স্নেহমধুর হাসি হাসিয়া বলিল—কি বলছ বল।

বসন্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ চোখ নামাইয়া মৃদু মিষ্ট স্বরে বলিল—একটু প্রসাদ খাও। বলিয়াই সে পরিপাটি করিয়া ঠাঁই করিয়া একখানি পাতায় ফলমূল সন্দেশ সাজাইয়া দিল। বসনের এই নূতন রূপ দেখিয়া নিতাই মুগ্ধ হইয়া গেল; সেই বসন এমন হইতে পারে?

নিতাই আসনের উপর বসিয়া পড়িল। খাইতে খাইতে বলিল—জয়-জয়কার হোক তোমার!

বসন বলিল—এক টুকরো পেসাদ রেখো যেন।

চকিত হইয়া নিতাই বলিল—পেসাদ ?

—হ্যাঁ, নাগরের পেসাদ খেতে হয়। সে হাসিল। বসনের মুখে এমন হাসি নিতাই কখ'ও দেখে নাই। সে অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বসন জিনিসপত্র গুছাইবার অজুহাতে তাহার দিকে পিছন ফিরিল। গুনগুন করিয়া সে গান করিতেছিল। নিতাই সে গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

'তোমার চরণে আমারই পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি,
জাতিকুলমান সব বিসর্জ্জিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।'

বা। বা। বা! এমন গান! নিতাই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল।

'কহে চণ্ডীদাস—'

—কি ? কি ? বসন। চণ্ডীদাস কে ?

দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বসন বলিল—মহাজনের গান—চণ্ডীদাসের পদ যে।

—চণ্ডীদাসের পদ তুমি জান ?

—ঝুমুরদের হাতে খড়ি যে কেত্তনের পদে গো। বসন্ত হাসিল—আমাদের গানের খাতায় কত পদ লেখা আছে।

পনেরো

রাত্রি নয়টার পর দুই দলে পাল্লা দিয়া গান আরম্ভ হইল। রাত্রির আলোকোজ্জ্বল মেলায় নৈশ-আনন্দ-সন্ধানী মানুষের জনতা। বক্ষোভাণ্ডের মধ্যে প্রবৃত্তির উত্তাপে আনন্দরস গাঁজিয়া যেন স-ফেন মদ্যরসে পরিণত হইয়াছে।

প্রথম আসর পাইয়াছিল বিপক্ষ দল। সে দলের কবিয়ালটি রঙ-তামাসায় দক্ষ লোক। আসরে নামিয়াই সে নিজে হইল বৃন্দে দূতী—নিতাইকে করিল কৃষ্ণ ;

পালা ধরিল—মানের, 'খণ্ডিতা' নায়িকার দূতীরূপে সে গান আরম্ভ করিল—

"কা-দা জা-মের বো-দা—কষের রসে ওলো মজেছে কালা,
আমের গায়ে মিছে—ধরিল রঙ—মিছে শ্বাস ঢালা।
চন্দ্রাবলী কাদা জাম—
রাধে আমার পাকা আম—"

তাহার পরেই সে আরম্ভ করিল খেউড। চন্দ্রাবলীর রূপ গুণ কাদা জামের সহিত তুলনা উপলক্ষ্য করিয়া সে বসনের রূপ-গুণের অশ্লীল বিকৃত ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিল। তবে লোকটার ছন্দে দখল আছে, আসরটাকে অশ্লীল রসে মাতাল করিয়া তুলিল। এ দলের পুরানো কবিয়াল, বসন্তের চড খাইয়া যে দল ত্যাগ করিয়াছে, সেই লোকটাই বসন্তের প্রতিটি দোষ ও খুঁতের সংবাদ ওই দলের কবিয়ালকে দিয়াছে। কবিয়ালটা বসন্তের দিকে আঙুল দেখাইয়া চন্দ্রাবলীর খেউড গাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীল ভঙ্গিতে নৃত্য। তাহাদের দলের যে মেয়েগুলি নাচিতেছিল তাহারা পর্য্যন্ত বসন্তের দিকে প্রায় আঙুল দেখাইয়া নাচিল।

নিতাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এই খেউড়ের আসরে তাহার গান জমিবে না, জমাইতে সে পারিবে না। খেউড় তাহার যেন আসে না। মুখে যেন বাধে। কিন্তু শঙ্কা তাহার নিজের পরাজয়ের জন্যে নয়; সে বসন্তর কথা ভাবিয়াই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। যে মেয়ে বসন্ত! একদণ্ডে সে আগুন হইয়া উঠে। আসরেই সে একটা কাণ্ড না করিয়া বসে! বার বার সে বসন্তর মুখের দিকে চাহিতেছিল। কিন্তু এই পাল্লার ক্ষেত্রে আশ্চর্য্য ধৈর্য্য বসন্তের; চুপ করিয়াই বসন্ত বসিয়া আছে—যতবার নিতাইয়ের চোখে চোখ মিলিল, ততবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসির অর্থ বুঝিতে নিতাইয়ের ভুল হইল না, হাসিয়া বসন্ত ইঙ্গিতে বলিতে চাহিতেছে···শুনছ? এর শোধ দিতে হবে। নিতাইয়ের মনে পড়িল গত রাত্রের কয়টি কথা, বসন্ত তাহাকে প্রথম সম্ভাষণে বলিয়াছিল—কয়লা-মাণিক নয়, তুমি আমার কালোমাণিক। আমার ছিদ্দ

কুম্ভে জল রেখেছ, আমার মান রেখেছ তুমি।

বসন্তকে আজ বড় ভাল দেখাইতেছে। নাচের আসরের সাজসজ্জা করিবার অবকাশ হয় নাই; এলোচুলই পিঠের উপর পড়িয়া আছে, লালপেড়ে তসরের শাড়ীখানিই সে একটু আঁটসাট করিয়া পরিয়াছে; সকলের চেয়ে ভাল লাগিতেছে তাহার চোখের সুস্থ দৃষ্টি। মেয়েরা আজ কেহই মদ খায় নাই, সেও খায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য! বসনের চোখের দৃষ্টিই সকলের দৃষ্টির চেয়ে সাদা মনে হইতেছে। অদ্ভুত দৃষ্টি বসন্তের! চোখে মদের নেশার আমেজ ধরিলে তাহার দৃষ্টি যেন রক্তমাখা ছুরির মত রাঙা এবং ধারালো হইয়া উঠে। আবার সুস্থ বসন্তের চোখের দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইতেছে—এ চোখ যেন রূপার কাজললতা।

বিপক্ষ দলের ওস্তাদ গান শেষ করিয়া বসিল। আশেপাশে শ্রোতার দল জমিয়াছিল, পচা মাছের বাজারে মাছির মত। পয়সা-আনি-দোয়ানি-সিকি-আধুলিতে প্যালার থালাটা একেবারে ভরিয়া উঠিল, গোটা টাকাও পড়িল দুই তিনটা। গান শেষ হইতেই তাহারা হরিবোল দিয়া উঠিল—ওই উহাদের সাধুবাদ।

পাশেই সস্তা তেলেভাজা ও মাংসের দোকান—মদও বিক্রী হয় গোপনে—সেখানে আর এক দফা.ভিড় জমিয়া গেল—এবং দলের দুইটা মেয়েকে লইয়া দোকানের ভিতর চেয়ার টেবিলে আদর করিয়া বসাইয়া কয়েকটি শৌখিন চাষী খাবার খাইতে বসিয়া গেল।

কপালে হাত ঠেকাইয়া মা চণ্ডীকে প্রণাম করিয়া নিতাই উঠিল। কিন্তু হাত-পা তাহার ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে। গলা যেন শুকাইয়া যাইতেছে:—এই এত বড় মদ্যতৃষাতুর জনতা, ইহাদের কি দিয়া সে তৃপ্ত করিবে? অনেক ভাবিয়া সে গান ধরিল—

“মদ সে সহজ বস্তু নয়,
চোখেতে লাগায় ধাঁধা—কালোকে দেখায় সাদা—
রাজা সে থানায় পড়ে রয়।”

কবিয়ালদের সকলের চেয়ে বড় বুদ্ধি হইল দুষ্টবুদ্ধি ; এবং বড় শক্তি হইল গলাবাজি, অর্থাৎ জোর করিয়া আপন বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। হয়-কে নয় এবং নয়-কে হয় করিয়া গলার জোরেই কবিয়ালরা জিতিয়া যায়। বুদ্ধি করিয়া অশ্লীল রসের গালিগালাজ বাদ দিয়া নিতাই সেই চেষ্টা করিল। সে ধরিল—

"বৃন্দে তুমি নিন্দে আমার কর অকারণ,
নয় অকারণ—কারণ খেয়ে মত্ত তোমার মন।"

'নতুবা ওগো মাতাল বৃন্দা, তুমি নিশ্চয় চন্দ্রাবলীর নিন্দা করিতে না। চন্দ্রাবলী কে ? যে রাধা, সেই চন্দ্রাবলী। যে কালী, সেই কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলীর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ। আগে তেঁতুল খাও, মাথায় জল দাও—নেশা ছুটাও, তারপর চন্দ্রাবলীর দিকে চাও। দেখিবে চন্দ্রাবলীর মধ্যে রাধা, রাধার মধ্যেই চন্দ্রাবলী। রাধাতন্ত্রের মানের পালার দশ পৃষ্ঠার দশম লাইন পড়িয়া দেখিও।' তারপর সে আরম্ভ করিল—চন্দ্রাবলীর রূপবর্ণনা। অর্থাৎ বসন্তের রূপকেই সে বর্ণনা করিল। একেবারে সপ্তম স্বর্গের বস্তু করিয়া তুলিল। বসন্ত নাচিতেছিল। সুস্থ দেহমনে আজ সে বড় ভাল নাচিতেছিল ;—কিন্তু রূপ-যৌবন আজ কামনাময় লাস্যে তীব্র তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে নাই। সেটা নেশার অভাবেও বটে এবং নিতাইয়ের গানে ঐ রসের অভাবেও বটে। শুধু বসন্তের নাচই নয়, ক্রমে ক্রমে আসরটা ধীরে ধীরে ঝিমাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল ; জনতা কমিয়া আসিতে সুরু হইল। দুই চারি জন যাইবার সময় বলিয়া গেল -দূর। থালায় প্যালা পড়িল না বলিলেই হয়।

প্রৌঢ়া কয়েকবার নিম্নস্বরে নিতাইকে বলিল—রঙ চড়াও, ওস্তাদ, রঙ।

ঢুলিদার বসন্তের কাছে গিয়া বলিল—একটুকুন হেলেদুলে, চোখ একটুকুন খেলাও!

বসন্তর চোখ খেলাইবে কি, চোখ ভরিয়া তার বার বার জল আসিতেছে। হেলিয়া দুলিয়া হিল্লোল তুলিবে কি, দেহ যেন অবসাদের ভারে ভাঙিয়া পড়িতেছে। আসরে নামিয়া শ্রোতাদের এমন অবহেলা তাহাকে বোধ করি

কখনও সহ্য করিতে হয় নাই। নিতাইয়ের গানের তত্ত্বকথায় বিরক্ত হইয়া তাহার দিকে লোকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। নিতাইয়ের ধর্ম্মকথার জ'লো রসে তাহার নাচে রঙ ধরিতেছে না। সর্ব্বোপরি দলের পরাজয়টাই তাহার কাছে মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে। নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী রূপ-পসারিনী তাহারা, দেহ ও রূপ লইয়া তাহাদের অহঙ্কার আছে, কিন্তু সে শুধু অহঙ্কারই—জীবনের মর্য্যাদা নয়। কারণ তাহাদের দেহ ও রূপের অহঙ্কারকে পুরুষেরা আসিয়া অর্থের বিনিময়ে পায়ে দলিয়া চলিয়া যায়। পুরুষের পর পুরুষ আসে। দেহ এবং রূপকে এতটুকু সম্ভ্রম করে না, রাক্ষসের মত ভোগই করে, চলিয়া যাইবার সময় উচ্ছিষ্ট পাতার মত ফেলিয়া দিয়া যায়। তাই ইহাদের জীবনের সকল মর্য্যাদা পুঞ্জীভূত হইয়া আশ্রয় লইয়াছে নৃত্যগীতের অহঙ্কারটুকুকে আশ্রয় করিয়া। ওই দুইটা বস্তুই যে তাহাদের জীবনের একমাত্র সত্য—সে কথা তাহারা বুঝে; তাহারা বেশ ভাল করিয়াই জানে যে, ভাল নাচগানের যে কদর—তাহা মেকী নয়। হাজার মানুষ চুপ করিয়া শোনে তাহাদের গান, বিস্ফারিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে তাহাদের রূপের সেই অপরূপ অভিব্যক্তি। মরুভূমির মত জীবনে ওই সাধনাই তাহাদের একমাত্র শ্যামল সজল আশ্রয়কুঞ্জ। সমাজের সাধারণে এই তত্ত্বটি সঠিক ধরিতে বা বুঝিতে পারে না। এই শ্রেষ্ঠত্ববোধেই তাহারা অগণ্য শ্রোতার উপস্থিতিকে নগণ্য করিয়া মাথা তুলিয়া নাচে, গায়। সমাজে গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লোকের সঙ্গেও অকুণ্ঠিত দাবীতে গানের তাল মান লইয়া তর্ক করে! খেউড় কবির দলের অপরিহার্য্য অঙ্গ, বিশেষ করিয়া ঝুমুরযুক্ত কবির দলের পক্ষে। খেউড় না জানিলে এ দলে গাওনা করার অধিকারই হয় না। মাসী বলে—কত বড় বড় মুনি ঋষি কাম শাস্ত্রে হার মানিয়া—শেষ তাহাদের কাছে শিষ্যত্ব লইয়াছে। আজ দলের পরাজয়ের সঙ্গে—সেই মর্য্যাদা ধুলায় লুটাইয়া পড়িতেছে বলিয়া অবসাদে বসন্ত যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে।

কোন মতে গান শেষ করিয়া পরাজয়ের বোঝার ভারে মাথা হেঁট করিয়া নিতাই বসিল। ঢোলের বাজনায় তেহাই পড়িল—বসন্তও নাচ শেষ করিল।

নাচ শেষ করিয়া সে আসরে আর বসিল না, শ্রান্ত শিথিল পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। প্রৌঢ়া দলনেত্রী তাহার দিকে চাহিয়া কেবল প্রশ্নের সুরে বলিল—বসন ?

শরীর খারাপ করেছে, মাসী।

প্রৌঢ়া হাসিল, বলিল—দেখ না, দোসরা আসরে বাবা আমার কি করে।

বসন্ত একবার ফিরিয়া চাহিল ; এবার চোখে তাহার ক্ষুরের ধার। সে বাহির হইয়া গেল।

প্রৌঢ়া কিন্তু অদ্ভুত। সে যেন এতটুকু বিচলিত হয় নাই। দলের বেহালাদারকে নির্বিকার ভাবেই বলিল—প্যালার থালাটা আন।

লোকটি প্যালার থালা আনিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল—কয়েকটা দোয়ানার বেশী আর পড়ে নাই। সবসুদ্ধ দু টাকাও হইবে না।

প্রৌঢ়া বলিল—গুনে দেখ কত আছে। তারপর সে পানের বাটাটা টানিয়া লইয়া বলিল—মেলার আসর, রঙ-তামাশা-খেউড়-খোরাকী লোকেরই ভিড়। নইলে বাবার গানে আর ওই ফচকে ছোঁড়ার গানে ? গান তো বোঝ তুমি, তুমিই বল কেনে ?

বেহালাদার বলিল—তা বটে। তবে রঙেরই আসর যখন, তখন না গাইলে হবে কেনে বল ? রঙের গানও তো গান।

প্রৌঢ়াকে স্বীকার করিতে হইল—তা বটে। একটা মোটা পান মুখে পুরিয়া সে আবার বলিল—ওস্তাদের মার শেষ আসরে। দেখ না, বাবা আমার কি করেই দেখ না।

নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল।

নির্ম্মলা, ললিতা মেয়ে দুইটির মুখেও হাসি নাই, পরস্পরে তাহারা কথা বলিতেছে—বোধ হয় এই হারজিতের কথাই তাহারা বলিতেছে। তাহাদের মুখেও এই পরাজয়ের লজ্জা সুপরিস্ফুট। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই মাথা হেঁট করিল। সকলের লজ্জা যেন জমিয়া জমিয়া বোঝা হইয়া তাহার মাথার উপর

প্রচণ্ড ভারে চাপিয়া বসিতেছে। শুধু তো লজ্জাই নয়, দুঃখেরও তাহার সীমা ছিল না। মানুষ সংসারে মদই চায়? অমৃতরস চায় না? হায় রে।

ওদিকে বিপক্ষদলের ঢুলী বাজনা আরম্ভ করিয়া দিল; লোকটার বাজনার মধ্যে যেন জয়ের ঘোষণা বাজিতেছে। বাজানোর ভঙ্গির মধ্যেও হাতের সদম্ভ আস্ফালন। ও দলের কবিয়াল বোধ হয় বাহিরে ছিল—সে একেবারে নাটকীয় ভঙ্গীতে একটা ছড়া কাটিতে কাটিতে ছুটিয়া আসরে আসিয়া প্রবেশ করিল—

"হায়—হায়—হায়—হায় কালাচাঁদ বলে গেল কি?"

'কুকুরী আর ময়ূরী, সিংহিনী আর শূকরী, শিমুলে আর বকুলে, কাকে আর কোকিলে, ওড়না আর নামাবলী, রাধা আর চন্দ্রাবলী—তফাৎ নাইক, একই?' ইহার পরই সে আরম্ভ করিল অশ্লীলতম উপমা। সঙ্গে সঙ্গে আসরে যেন বৈদ্যুতিক স্পর্শ বহিয়া গেল। লোকে হরিবোল দিয়া উঠিল। এবার লোকটা একটু থামিয়া সুর ভাঁজিয়া গান ধরিল—

"আ—কালাচাঁদের কালো মুখে আগুন জ্বেলে দে গো—
টিকেয় আগুন দিয়ে রাধে তামুক খেয়ে লে গো!"

অর্থহীন উপমায় যে-কোন প্রকারে কতকগুলা গালি-গালাজ দিয়া এবং অশ্লীল কদর্য্য ভাব ও উপমার অবতারণা করিয়া সে আসরটাকে অল্প সময়ের মধ্যেই জমাইয়া তুলিল।

নিতাই আসর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ও দলের একটা মেয়ে নাচিতে নাচিতে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া নিজেই আখর দিয়া গাহিয়া উঠিল—

"ধর—ধর কালাচাঁদে, পলায়ে যায় গো!"

আসরে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। নিতাই কিন্তু রাগ করিল না, সে হাসিমুখেই মেয়েটির এই তীক্ষ্ণ উপস্থিতবুদ্ধির জন্য আন্তরিক প্রশংসা করিয়া বলিল—ভাল, ভাল! ভাল বলেছ তুমি।

*　　*　　*

নিতাই আসিয়া বাসায় বসন্তের ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইল। ভিতরে আলোর ক্ষীণ আভাস। বাহিরে মুক্ত আকাশের নীচে বিস্তীর্ণ অন্ধকারের মধ্যে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া তাহারই সম্মুখে মহিষের মত প্রচণ্ডকায় লোকটা পূর্ণ-উদর হিংস্র পশুর মত বাসা আগলাইয়া একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। পদশব্দে সে ফিরিয়া চাহিল, এবং নিতাইকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আবার মুখ ফিরাইয়া ঝিমাইতে লাগিল। নিতাই বসন্তের ঘরের দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইল, ঢুকিতে সাহস করিল না। দেহব্যবসায়িনীর ঘর! সে বাহির হইতেই ডাকিল—বসন!

—কে? ঘরের ভিতর হইতে বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বরে বসন্ত উত্তর দিল।

—আমি নিতাই। রসিকতা করিয়া 'কমলা-মাণিক' বলিতেও তাহার মন উঠিল না।

—কি?

—ভিতরে যাব?

কি দরকার?

—একটু'ন কাজ আছে।

মুহূর্তে বসন্ত নিজেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অধীর অস্থির ক্ষিপ্র পদক্ষেপে সে ঘরের ভিতর হইতে নিতাইয়ের সম্মুখে আসিয়া ঝলকিয়া উঠিল, ঠিক খাপখোলা তলোয়ারের মত। বাহিরের অগ্নিকুণ্ডের আলোর রাঙা আভা পূর্ণ দীপ্তিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। নিতাই দেখিয়া শঙ্কিত হইল—আজিকার অপরাহ্ণের পূজারিণী, শান্ত স্নিগ্ধ নম্র সে বসন্ত আর নাই, এ সেই পুরানো চেনা বসন্ত। তাহার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষুরের ধার ঝলসিয়া উঠিয়াছে। রাঙা আলোর প্রতিচ্ছটায় সে যেন রক্তাক্ত। সে ফিরিয়া আসিয়া মদ খাইয়াছে। চোখে ছটা বাজিতেছে।

বসন্ত বলিল— আমি যাব না। আমি যাব না। কেনে এসেছ তুমি?

নিতাই কোন উত্তর দিতে পারিল না। শঙ্কিত দৃষ্টিতে বসন্তর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অকস্মাৎ কঠিনতম আক্রোশে বসন্ত তাহার গালে সজোরে একটা চড় বসাইয়া দিল, বলিল—ন্যাকার মত আমার ছামুতে তব্ দাঁড়িয়ে! কেনে, কেনে, কেনে? প্রশ্ন করিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে মুহূর্ত্তে যে অধীর অস্থির গতিতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল সেই গতিতেই সে ঘরে ঢুকিয়া গেল; এই আঘাত করিয়াও যেন তাহার ক্ষোভ মেটে নাই। ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া সে নিজের কপালে চাপড় মারিল; তাহার শব্দটাই সে কথা বলিয়া দিল।

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সেই আগলদার লোকটার কাছে আসিয়া ডাকিয়া বলিল—পালোয়ান!

লোকটা দলের মধ্যে পালোয়ান বলিয়া পরিচিত। নেশায় ভাম হইয়া লোকটা বসিয়া ছিল, সে কথার উত্তর দিল না। রাঙা চোখ তুলিয়া শুধু চাহিল মাত্র।

—তোমার কাছে মাল আছে? মদ?

নিরুত্তর লোকটা এদিক ওদিক হাতড়াইয়া একটা বোতল বাহির করিয়া আগাইয়া দিল। বোতলটা হাতে করিয়াও নিতাই একবার ভাবিল—তারপর এক নিঃশ্বাসে খানিকটা গিলিয়া ফেলিল। বুকের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া গেল; সমস্ত অন্তরাত্মা যেন চীৎকার করিয়া উঠিল; দুর্দ্দমনীয় বমির আবেগে—সমস্ত দেহটা মোচড় দিয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণপণে সে আবেগ সে রোধ করিল। ধীরে ধীরে আবেগটা যখন নিঃশেষিত হইল তখন একটা দুর্দ্দান্ত অধীরতাময় চঞ্চল অনুভূতি তাহার ভিতরে সদ্য জাগিয়া উঠিতেছে।

বার কয়েক সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই টলিল; সব যেন দুলিতেছে; ভিতরটা জ্বলিতেছে; দুনিয়া যেন তুচ্ছ হইয়া যাইতেছে! এখন সে সব পারে! সে-কালের ভীষণ বীরবংশী বংশের রক্তের বর্ব্বরত্বের মৃতপ্রায় বীজাণুগুলি, মদের স্পর্শে—জলের স্পর্শে মহামারীর বীজাণুর মত, পুরাণের রক্তবীজ হইয়া অধীর চঞ্চলতায় জাগিয়া উঠিতেছে। আবার সে খানিকটা মদ গলায় ঢালিয়া দিল।

দ্বিতীয়বার আসরে যখন সে প্রবেশ করিল তখন তাহার রূপই পাল্টাইয়া

গিয়াছে। সামাজিক জীবনে মানুষের যত কিছু পাপ যাহা কিছু কদর্য্য, যত কিছু উলঙ্গ অশ্লীলতা আবর্জ্জনা-স্তূপের মত যেখানে জমা হয়, সেই পরিবেশের মধ্যে তাহার জন্ম; দারিদ্র্য ও কঠিন দাসত্বের অনুশাসনের গণ্ডীর ভিতর বহু যুগ যাহারা বাস করিয়া আসিতেছে, সে তাহাদেরই সন্তান। মা সেখানে অশ্লীল গালি-গালাজে শাসন করে, উচ্ছ্বসিত স্নেহে অশ্লীল কথায় আদর করে, সন্তানকে সকৌতুকে অশ্লীলতা শিক্ষা দেয়। অশ্লীলতা, কদর্য্য ভাষা, ভাব নিতাইয়ের অজানা নয়। কিন্তু জীবনে সামান্য শিক্ষা এবং কবিয়ালির চর্চ্চা করিয়া সে-সব সে এতদিন ভুলিতে চাহিয়াছিল। সে-সবের উপর একটা অরুচি, একটা ঘৃণা জন্মিয়াছিল। কিন্তু আজ বসন্তের কাছে আঘাত খাইয়া—ক্ষোভে নির্জ্জলা মদ গিলিয়া উন্মত্তের মত সেই সমস্তকে সে উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিল। ছন্দ এবং সুরে তাহার অধিকার ছিল, কণ্ঠস্বর তাহার অতি সুমিষ্ট; দেখিতে দেখিতে আসর এবার জমিয়া উঠিল। আসর ঢুকিবার মুখেই সে কবিয়ালদের নাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া কহিল—দোহারগণ!

সকলে সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিল। নিতাই ফিরিবে এ প্রত্যাশা কেহ করে নাই।

মাসী চতুরা। সে মুহূর্ত্তে সাড়া দিল—বল সন্তান।

নিতাই বলিল—ধর্ম্ম কথায় যখন মন ওঠে না—বসে না—তখন দিতে হয় গাল!

ছুঁচের মত মিহি ধারে যখন কাজ হয় না তখন চালাতে হয় ফাল!
যখন ঠাণ্ডা জলে গলে না ডাল—
তখন কষে দিতে হয় তেঁতুল কাঠের জ্বাল।

ওদিকের কবিয়ালটা রসিকতা করিয়া বলিয়া উঠিল—বলিহারি কালাচাঁদ, টিকেয় আগুন দিয়েছ লাগছে; তেতেছ!

নিতাই বলিল—এমন তেমন তাতা নয় সিন্দে, জ্বলছি! সেই জ্বালাতে তোকে বলছি—শোন! সহজে তো তুই শুনবি না!—দোহারগণ!

—হাঁ—হাঁ!

নিতাই সুরু করিল—

বুড়ী দূতী নেড়ী কুত্তি জুত্তি ছাড়া নয় সায়েস্তা,
ছড়ির বাড়ি খাবলে ভাবে একি আমার সুখ অবস্থা!

বুড়িকে ছড়ি মেরে কিছু হয় নাই। এবার লাগাও জুতি—লাগাও পঁয়জার! তারপর প্রৌঢ় লোকটার মুখের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—বুড়ীর কোঁচকা মুখে টেরীর বাহার দেখুন, তেলকের বাহার দেখুন—

এ বুড়ো বয়সে কোঁচকা মুখে রসকলি কাটিস নে!
রসের ভিয়েন জানিস নেকো গেঁজলা তাড়ি ঘাটিস নে।

তারপর তার ফোকলা মুখের কাছে আঙুল নাড়িয়া বলিল—

ফোকলা মুখে লম্বা জিভে ঝরা লালা চাটিস নে।

আসরে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। আসর জমিয়া গিয়াছে। সে নিজেও সেই জমজমাটের মধ্যে হারাইয়া গিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

সে গান ধরিল—

বুড়ী মরে না—মরণ নাই।
হায়—হায়!

গানের সঙ্গে নাচিতে লাগিল।

সমস্ত আসর ও আলো তাহার চোখের সম্মুখে যেন দুলিতেছে। একটা মানুষ দুইটা বসিয়া বোধ হইতেছে—দুইটা নির্ম্মলা, দুইটা ললিতা; বাজাইতেছে দুইটা বায়েন; প্রৌঢ়াও দুইটা হইয়া বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। অকস্মাৎ এক সময়ে সে দেখিল—বসন্তও দুইটা হইয়া নাচিতেছে! বাহবা—বাহবা—সে কি নাচ! বসন্ত কখন আসিয়া আসরে নামিয়া নাচিতে সুরু করিয়া দিয়াছে।

চরমতম অশ্লীলতায় আসরটাকে আকণ্ঠ পঙ্ক-নিমগ্ন করিয়া দিয়া সে বসিল। এবার তাহাদের প্যালার থালাটা ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার গান শেষের সঙ্গে সঙ্গেই এবার বিপুল কলরবে হরিধ্বনি উঠিল।

প্রৌঢ়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—বাবা আমার! এই দেখ, মদ না খেলে কি মেলা-খেলায় গান হয়? যে বিয়ের যে মন্তর। বসন, বাবাকে আমার আর এক পাত্তর দে। গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

বসন! এতক্ষণে নিতাই স্থির দৃষ্টিতে বসন্তের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল।

রক্তরাঙা নিতাইয়ের চোখ, পায়ের তলায় সমস্ত পৃথিবী দুলিতেছে, শঙ্কা, সঙ্কোচ, সমস্ত ভুলিয়া নিতাই জয়ের আনন্দে অধীর। বসন্ত অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া চাহিয়া রহিল। আশ্চর্য্য বসন্ত! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে নিতাইয়ের গালে চড় মারিয়া যে নিষ্ঠুর অপমান করিয়াছে, তাহার জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছে না; বরং উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাহার চোখ মুখ ঝলমল করিতেছে। নিতাইয়ের গরবে সে গরবিনী হইয়া উঠিয়াছে।

—দাও, পাত্তর দাও। নিতাই হাসিল।

—এস, ঘরে এস, ভাল মদ আছে—বেলাতী। বসন্ত তাহার হাত ধরিয়া গরবিনীর মত উঠিয়া গেল। ঘরে কাচের গেলাসে বিলাতী মদের সঙ্গে জল মিশাইয়া বসন্ত নিতাইকে দিল। নিঃশব্দে গেলাসটি শেষ করিয়া নিতাই বসনের দিকে চাহিয়া হাসিল। এ বসন্ত যেন নূতন বসন্ত, নিতাইয়ের নেশার ঘোর ঝলমল করিয়া উঠিল।

সে আবার হাত বাড়াইল। তাহার তৃষ্ণা জাগিয়াছে। বলিল—দাও গো, আমাকে আর এক গেলাস দাও।

বসন্ত হাসিয়া আবার অল্প একটু তাহাকে দিল। সেটুকুও পান করিয়া নিতাই বলিল—দাঁড়াও, তোমাকে একটুকুন দেখি।

বসন হাসিয়া বলিল—না, চল আসরে চল।

—না। দাঁড়াও। সে বসন্তের হাত চাপিয়া ধরিল।

বসন্ত দাঁড়াইল। নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী, পথে পথে ব্যবসায়ের বিপণি পাতিয়া যাহাদের ব্যবসায় করিয়া ঘুরিতে হয়—লজ্জা তাহাদের থাকে না, পথের ধূলায় হারাইয়া যায়। কিন্তু বসন্তর মুখ তবু আজ রাঙা হইয়া উঠিল।

আরও আশ্চর্য্যের কথা, মুহূর্ত্ত পরেই তাহার চোখে জল দেখা দিল। মুখ ফিরাইয়া লইয়া সে বলিল—আমাকে দেখো না।

—কেনে?

—আমার কাশরোগ আছে। মধ্যে মধ্যে কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে। সন্ধ্যেবেলা-সন্ধ্যেবেলা জ্বর হয় দেখ না? টপ টপ করিয়া বসন্তর চোখ হইতে এবার জল ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া হাসিল।

—হোক। নিতাইয়ের বুকখানা তখন ফুলিয়া উঠিয়াছে; উচ্ছৃঙ্খল বর্ব্বর, বীরবংশীর সন্তান রূঢ়তম পৌরুষের ভয়াল মূর্ত্তি লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। সে রূপ দেখিয়া ঠাকুরঝি সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু বসন্ত ঝুমুর দলের মেয়ে, তার রক্তের মধ্যে বর্ব্বরতম মানুষের ভীষণতম ভয়াল মূর্ত্তি সহ্য করবার সাহস আছে। নিতাইকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

নিতাইয়ের বাহুবন্ধনের মধ্যে নির্ভয়ে নিজেকে সমর্পণ করিয়া সে মৃদুস্বরে গান ধরিল—

"বধু তোমার গরবে গরবিনী হাম গরব টুটাবে কে।
তেজিঃ জাতি কুল বরণ কৈলাম তোমারে সঁপিয়া দে'।"

নিতাইয়ের বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। গান শুনিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল—এ কি গান! তাহার নেশা যেন ফিকা হইয়া যাইতেছে। এ কি সুর! বসন্ত নিজে সে হাত আবার গলায় তুলিয়া গাহিল—

"পরাণ-বধুয়া তুমি,
তোমার আগেতে মরণ হউক এই বর মাগি আমি।"

অপূর্ব্ব। অপূর্ব্ব লাগিল নিতাইয়ের; চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। ধরা গলায় সে প্রশ্ন করিল—কোথা শিখলে এ গান? এ কোন্ কবিয়ালের গান?

হাসিয়া বসন্ত দুইটি হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া গাহিল—

"যে হোল সে হলো—সব ক্ষমা কর বলিয়া ধরিল পায়,
রসের পাথারে না জানে সাঁতার ডুবল শেখর রায়।"

গান শেষ করিয়া সে বলিল—মহাজনের পদ গো! আজই বলছিলে না—মহাজন-পদের কথা!

অধীর মত্ততার মধ্যেও কবিয়াল জাগিয়া উঠিল। বসন্তর দুই হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া নিতাই বলিল—আমাকে শেখাবে?

বসন্ত আবেগভরে নিতাইয়ের মুখ চুমায় চুমায় ভরিয়া দিল।

ষোল

সকালে নিতাই যখন উঠিল, তখন তাহার মুখের স্বাদ হইতে চোখের দৃষ্টি পর্য্যন্ত তেতো হইয়া উঠিয়াছে, জ্বলিতেছে। নিজের নিশ্বাসেরই একটা বীভৎস দুর্গন্ধ নিজের নাকে আসিয়া ঢুকিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ যেন ক্লেদাক্ত উত্তাপে উত্তপ্ত, বিষে বিষাক্ত! শীতের প্রারম্ভ—তাহার উপর সকালবেলা—এই শীতের সকালেও তাহার মৃদু-মৃদু ঘাম হইতেছে। মাথার মধ্যে অত্যন্ত রূঢ় একটা যন্ত্রণা—সমস্ত চেতনা যেন গ্রীষ্ম-দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত মাঠের ধূলায় আচ্ছন্ন আকাশের মত ধূসর। বুকের ভিতর হইতে জিভের ডগা পর্য্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে।

বসন্ত ঘরের মধ্যেই ছিল, সে আপন মনে অন্য কাজ করিতেছিল। কয়েক-দিনের বসবাসের জন্য তৈরী খড়ের ঘর, সেই ঘর সে গোছগাছ করিয়া পরিপাটি করিয়া সাজাইতে ব্যস্ত। মেলায় সে কয়েকখানা ছবি কিনিয়াছে, নূতন আমলের সাধারণ দেশীয় লঘুরুচি শিল্পীদের হাতের বিলাতী বর্ণসমাবেশে আঁকা—জার্ম্মানিতে ছাপা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার ছবি। দু'খানা উলঙ্গ মেম সাহেবের ছবি। ছবিগুলি সে ঘরের বাঁশের খোঁটার গায়ে টাঙাইতেছিল। রূপোপজীবিনীর আশ্চর্য্য ঘর-সাজাইবার নেশা! নিতাইকে উঠিতে দেখিয়া সে মৃদু হাসিয়া বলিল—উঠলে?

ওই হাসি এবং এই প্রশ্নেই নিতাইয়ের আজ রাগ হইয়া গেল—রাঙা চোখে

কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া সে তিক্ত-কণ্ঠে উত্তর দিল—হ্যাঁ।

কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় বসন্ত প্রথমটা তাহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, তারপর হাসিল, বলিল—শরীর খারাপ, মুখ হাত ধোও, চা খাও ; খেয়ে চান কর। বঁ'চা চা ক'রে দি। তুমি সেদিন দিয়েছিলে আমাকে, ভারি 'ওপকার' হয়েছিল।

নিতাই কথার উত্তর দিল না, টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল। তাহার পায়ের তলার মাটি এখনও যেন কাঁপিতেছে।

প্রাতঃকৃত্য সারিয়া যখন ফিরিল, তখন সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছে। দীঘির ঘাটে মাথার যন্ত্রণা উপশমের জন্য বার বার মাথা ধুইয়া ফেলিয়াছিল। ভিজা চুল হইতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে জল ঝরিতেছিল, জলের ধারাগুলি তাহার দেহে পড়িতেছিল যেন উত্তপ্ত লোহার পাত্রে জলবিন্দুর মত। বসন্ত তখন একগাদা কাপড় লইয়া কাচিবার জন্য বাহির হইতেছিল। নিতাইকে দেখিয়া সে কাপড় রাখিয়া তাড়াতাড়ি চা করিয়া দিল। লেবুর রস দিয়া কাঁচা চা নিতাইয়ের বড় ভাল লাগিল। চায়ের বাটিটা শেষ করিয়া সে আবার ঘরের মেঝেয় বিছানো খড়ের উপরেই শুইয়া পড়িল। বসন্ত ইতিমধ্যেই সমস্ত বিছানা বাহির করিয়া রৌদ্রে দিয়াছে। শুইবামাত্র সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল—ঠিক ঘুম নয়, অশান্ত তন্দ্রা।

—খড়ের ওপরেই ঘুমেয়েছ ?

বসন্তের সাড়ায় সে চোখ মেলিয়া চাহিল। একগাদা ভিজা কাচা কাপড় কাঁধে ফেলিয়া আপাদমস্তক-সিক্ত বসন্ত দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছিল।

—ওঠ, একটা মাদুর পেতে একটা বালিশ দি। অ ভাই নির্ম্মলা, তোর দাদাকে একটা মাদুর আর বালিশ দিয়ে যা, আমার সর্ব্বাঙ্গ ভিজে।

নিতাই চোখ বুজিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—না।

বসন্ত এবার আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া শাসনের সুরে

বলিল—না নয়, ওঠ, ওঠ।

নিতাই এবার উঠিয়া বিস্ফারিত চোখে বসন্তর দিকে চাহিল।

—কই? দাদা কই? বলিয়া হাসিমুখে নির্ম্মলা মেয়েটি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। যত্নে মাদুর ও বালিশ পাতিয়া দিতে দিতে বলিল—ওঃ, দাদা আমার আচ্ছা দাদা। যে গান কাল গেয়েছ!

নিতাইয়ের এতক্ষণে গত রাত্রির কথা মনে পড়িল। মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বিদ্যুৎচমক খেলিয়া গেল।

এই মুহূর্ত্তেই ও-পাশের খড়ের ঘর হইতে দলের নেত্রী প্রৌঢ়া বাহির হইয়া আসিল।—বাবা আমার উঠেছে? পরমুহূর্ত্তেই সে শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—ও মা-গো। তোর কি কাণ্ড বসন? এই ক'দিন জ্বর ছেড়েছে, আর আজ এই সকালেই তু এমনি করে জল ঘাঁটছিস।

মৃদু হাসিয়া বসন্ত বলিল—সব কাচতে হ'ল মাসী। এইবার চান করব।

—কাচবার কি দরকার ছিল?

নির্ম্মলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—পিরীতি সামান্য নয় মাসী। দাদা কাল বমি ক'রে বিছানা-পত্য ভাসিয়ে দিয়েছে।

প্রৌঢ়াও এবার মৃদু হাসিল, হাসিয়া বসন্তকে বলিল—যা, ভিজে কাপড় রেখে চান করে আয়। কাপড় ছেড়ে বরং ও-গুলান মেলে দিবি।

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া নিতাই প্রশ্ন করিল—আমি বমি করেছি?

নির্ম্মলা আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘাড় হেঁট করিয়া নিতাই ভাবিতেছিল—এই দুর্গন্ধ তাহা হইলে তাহারই বমির দুর্গন্ধ! অনুভব করিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ওই বমির ক্লেদ লাগিয়া আছে। সেই গন্ধই নিশ্বাসের সঙ্গে তাহার ভিতরটাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে! নিজের অঙ্গের ক্লেদ এইবার এক মুহূর্ত্তে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

—মাথা ধরেছে, লয় গো দাদা? তুমি শোও, আমি খানিক মাথা টিপে দি। নির্ম্মলা তাহার কপালে হাত দিল। বড় ঠাণ্ডা আর নরম নির্ম্মলার হাতখানি।

কপাল যেন জুড়াইয়া গেল। ভারি আরাম বোধ হইতেছে। কিন্তু নিতাই স্নান না করিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—না, চান করব আমি।

বসন্ত কাপড়গুলি রাখিতেছিল, সে বলিল—নির্ম্মলা, ওই দেখ, 'বাসকো'র পাশে ফুলেল তেলের বোতল রয়েছে, দে তো ভাই বার ক'রে। তারপর সে নিতাইকে বলিল—বেশ ভাল ক'রে তেল মাখো। দেহ ঠাণ্ডা হবে, শরীরের আরাম পাবে। আর সাবান লাও তো তাই লাও।

—না। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। ইচ্ছা হইতেছে তাহার জলে ডুবিয়া মরিতে! চীৎকার করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

সে যখন স্নান করিয়া ফিরিল, তখন বসন্ত স্নান করিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িয়া বাক্স লইয়া কিছু করিতেছিল। নিতাই ঘরে ঢুকিতেই সে হাসিয়া বলিল—আজ কেমন সাজব, তা দেখবা। ওই দেখ, আয়না আছে, চিরুণী আছে, হিমানী আছে, মুখে লাও খানিক।

স্নান করিয়া নিতাই সুস্থ হইয়াছে কিন্তু মনের অশান্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ছি! সে করিয়াছে কি! ছি! ছি! ছি! স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পথে সে সংকল্প করিয়া আসিয়াছে, আজই সে পলাইয়া যাইবে। ইহারা যাইতে দিবে না, সুতরাং পলাইয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। জিনিস থাক পড়িয়া থাক, 'বাজার ঘুরিয়া আসি' বলিয়া সে বাহির হইয়া চলিয়া যাইবে। অন্য জিনিসপত্রের জন্য দুঃখ নাই। কিই বা জিনিসপত্র! কয়েকখানা কাপড় দুইটা জামা, একটা কম্বল, দুইটা কাঁথা বালিশ। দুঃখ কেবল তাহার দপ্তরটির জন্য। দপ্তর তো তাহার এখন নেহাৎ ছোটটি নয় যে গায়ের আলোয়ানের আড়াল দিয়া বগলে পুরিয়া পালাইবে! শিশু-বোধ, রামায়ণ, মহাভারতের কথা, জানোয়ারের গল্প ও একখানা খাতা লইয়া সে ছোট দপ্তরটি তো আর নাই—ক্রমে ক্রমে অনেক বাড়িয়াছে। মেলায়, বাজারে—যেখানে সে গিয়াছে

—দুই একখানা করিয়া বই কিনিয়াছে। কবিগান, পাঁচালী, তর্জ্জার গান, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, মনসার ভাসান, চণ্ডীমাহাত্ম্য, সত্যপীরের গান—অনেক বই সে কিনিয়াছে। বাবুদের পাড়ায় ছেঁড়া পাতা কুড়াইয়া পড়িয়া ভাল লাগিলে সংগ্রহ করা তাহার একটা রোগ ছিল। বাবুদের থিয়েটারের আশপাশ ঘুরিয়া কয়েকখানা আদি-অন্তহীন নাটকও সে সংগ্রহ করিয়াছে। এ ছাড়া নিজের লেখা গানের খাতা, সেও যে এখন অনেক হইয়াছে—সব গানই সে যে খাতায় লিখিয়া রাখে।

একখানা কাপড় তুলিয়া ধরিয়া দেখাইয়া বসন্ত বলিল—উলঙ্গবাহার শাড়ী। এই কাপড় আজ পরব।

কথাটার ইঙ্গিত নিতাই বুঝিল। অর্থাৎ বসন্ত আজ প্রায় নগ্নরূপে নৃত্য করিবে। সে শিহরিয়া উঠিল।

বসন্ত বলিল—দেখব আজ কার জিত হয়. তোমার গানের, না আমার নাচের।

নিতাই আয়না-চিরুনিটা রাখিয়া দিয়া জামা পরিতে আরম্ভ করিল। মুহূর্ত্তে সে দ্বিধাশূন্য হইয়াছে, থাক তাহার দপ্তর পড়িয়া—সে চলিয়া যাইবে। এখানে সে থাকিতে পারিবে না।

—জামা পড়ছ যে? যাবে কোথা?

—এই আসি।

বসন্ত নিতাইয়ের আকস্মিক ব্যস্ততা দেখিয়া বিস্মিত হইল, বলিল—মানে?

—এই একটুকুন বাজার ঘুরে আসি।

—না। এখন বাজার যেতে হবে না। একটু'ন ঘুমিয়ে লাও। ওই দেখ খানিকটা মদ ঢেলে রেখেছি, খাও, খোঁয়ারি ছেড়ে যাবে।

—না। আমি একবার মন্দিরে যাব।

—মন্দিরে?

—হ্যাঁ।

—এই বলছ বাজার, এই বলছ মন্দির। কোথা যাবে ঠিক করে বল কেনে ?

—বাজারে যাব। রাধাগোবিন্দের মন্দিরেও যাব।

—চল। আমিও যাব।

নিতাই বিব্রত হইয়া চুপ করিয়া বসন্তর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রূপোপজীবিনীর কিন্তু অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—নিতাইয়ের মুখের দিকে সেও চাহিয়া ছিল, হাসিয়া সে বলিল—কি ভাবছ বল দেখি ? নিতাই উত্তর দিল না। বসন্ত এবার বলিল—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে মন সরছে না ? লজ্জা লাগছে ?

নিতাই এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অতর্কিত আকস্মিক প্রশ্নে সে চকিত হইয়া উঠিল; অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল—না—না—না। কি বলছ তুমি, বসন! এস—এস।

বসন্ত বলিল—মুখ দেখে কিন্তু তাই মনে হচ্ছে আমার, তুমি যেন পালাতে পারলে বাঁচ। কে যেন তোমাকে দড়ি বেঁধে টানছে। আচ্ছা, বাইরে চল তুমি, আমি কাপড় ছেড়ে যাই।

নিতাই অবাক হইয়া গেল। বসন্তর চোখের দৃষ্টি তো ছুরি নয়—সূঁচ, একেবারে বুকের ভিতর বিঁধিয়া ভিতরটাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পায়। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কেমন করিয়া বসন্তকে এড়াইয়া চলিয়া যাইবে সে তা-ই ভাবিতে আরম্ভ করিল।

ওদিকে নির্মলা, ললিতা তাহাদের প্রিয়জন বেহালাদার ও প্রধান দোহারকে লইয়া মদের আসর পাতিয়াছে। মহিষের মত বিরাটকায় লোকটা—প্রৌঢ়া দলনেত্রীর মনের মানুষ। লোকটা অদ্ভুত। উহাকে দেখিলেই নিতাই লোকটির সমস্ত কথা স্মরণ না করিয়া পারে না। লোকটা কথাবার্তা বলে না, আমড়ার আঁটির মত সৌষ্ঠবহীন রাঙা চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখে। রাক্ষসের মত খায়; সমস্ত দিনটা প্রায় ঘুমায়, রাত্রে আকণ্ঠ মদ গিলিয়াও ঠায় জাগিয়া বসিয়া থাকে। তাহার সামনেই থাকে একটা আলো—আর একটা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড; এই

ভ্রাম্যমান পরিবারটির পথে-পাতা ঘরের গণ্ডির ভিতর রূপ ও দেহের খরিদ্দার যাহারা আসে তাহাদের দৃষ্টি তাহার উপর না পড়িয়া পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচণ্ড মাতালগুলা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহাকে দেখিয়া—অনেকটা শান্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া ভদ্র সুবোধ হইয়া উঠে। লোকটা ভাম হইয়া একটা মদের বোতল লইয়া বসিয়া আছে, নির্বিকার উদাসীনের মত। রান্নাশালার চালায় প্রৌঢ়া তেলেভাজা ভাজিতে বসিয়াছে। ওই এক অদ্ভুত মেয়ে! মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, আবার মুহূর্ত্তে চোখ দুইটা রাঙা করিয়া এমন গম্ভীর হইয়া উঠে যে, দলের সমস্ত লোক ত্রস্ত হইয়া পড়ে। আবার পরমুহূর্ত্তেই সে হাসে। গানের ভাণ্ডার উহার পেটে। অনর্গল ছড়া, গান মুখস্থ বলিয়া যায়। গৃহস্থালি লইয়া [illegible] ঘণ্টাই ব্যস্ত। উন্মত্ত বুনো একপাল ঘোড়াকে রাশ টানিয়া চালাইয়া লইয়া চলিযাছে। রথ-রথী-সারথি সবই সে একাধারে নিজে।

নির্ম্মলা হাসিয়া ডাকিল—এস গো দাদা, গরীব বুনের ঘরে একবার এস।

হাসিয়া নিতাই বলিল—কি হচ্ছে তোমাদের?

—কালকে লক্ষীর বার গিয়েছে, পারণ করছি সকালে। বসন কই? সে আসছে না কেনে? মদের বোতলটা তুলিয়া দেখাইয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিতাই সবিনয়ে নীরবে হাত দুইটি কেবল জোড় করিয়া মার্জ্জনা চাহিল।

বেহালাদার হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ। তাকেই ডাক। কান টানলেই মাথা আসবে।

নিতাইয়ের পিছনেই বসন্তের সকৌতুক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—মাথা এখন পুণ্যি করতে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে কানকেও যেতে হবে। তবে যদি কেটে লাও কানকে, সে আলাদা কথা।

বসন্তর কথা কয়টি নিতাইয়ের বড় ভাল লাগিল। বাঃ, চমৎকার কথাটি বলিয়াছে বসন! খুশী হইয়া নিতাই পিছন ফিরিয়া দেখিল—গতকালকার

ভক্তিমতী পূজারিণীর সাজে সাজিযা বসন্ত দাঁড়াইযা আছে। বসন্ত হাসিয়া বলিল—চল।

পথের দুইধারেই দোকানের সারি।

বসন্ত সামগ্রী কিনিল অনেক। ফলমূল মিষ্টিতে পুরা একটা টাকাই সে খরচ করিযা ফেলিল। একটা সিকি ভাঙাইযা চার আনার আধলা লইযা নিতাইয়ের হাতে দিযা বলিল—পকেটে রাখ।

নিতাই আবার চিন্তাকুল হইযা উঠিযাছিল। সে ভাবিতেছিল—এ বাঁধন কেমন করিযা কাটিযা ফেলা যায়, সেই কথা। মন্দির হইতে ফিরিলেই তাহাকে লইযা আবার সকলে টানাটানি আরম্ভ করিযা দিবে। বসন্তও তখন আর এ বসন্ত থাকিবে না। হিংস্র দীপ্তিতে ক্ষুরধার বসন্তের রূপ তাহার চোখের উপর ভাসিযা উঠিল। সে ঠিক করিল, ফিরিবার পথে বসন্তকে বাসায পাঠাইযা দিযা পথ হইতেই সে সরিযা পড়িবে। অজুহাতের অভাব হইবে না। তাহার কোন গ্রামবাসীর সন্ধান করিবার জন্য মেলাটা একবার ঘুরিবার অজুহাত সে ঠিক করিযা ফেলিল। আধলাগুলি তাহার হাতে দিতেই ভ্রূ কুঞ্চিত করিযা সে প্রশ্ন করিল—কি হবে?

—ও মা গো! রাজ্যের কানা খোঁড়া মন্দিরের পথে বসে আছে। দান করব। মৃদু হাসিয়া নিতাইযের মুখের দিকে চাহিয়া সে বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিযা প্রশ্ন করিল—কি ভাবছ তুমি বল দেখি?

ব্যস্ত হইয়া নিতাই অভিনয় করিয়া হাসিযা বলিল—কিছু না।

—কিছু না?

—ভাবছি, তোমাকে চিনতে পারলাম না। নিতাই হাসিল।

বসন্তও এবার হাসিযা বলিল—আমার ভারি মাযা লাগে! আহা! কি কষ্ট বল দিকিনি কানা খোঁড়া রোগা লোকদের? বাপ রে! বলিতে বলিতে সে

শিহরিয়া উঠিল। নিতাই সত্যই এবার অবাক হইয়া গেল—বসন্তের চোখ মুহূর্ত্তে জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

চোখ মুছিয়া বসন্ত আবার হাসিয়া বলিল—সে হাসি বিচিত্র হাসি, এমন হাসি নিতাই জীবনে দেখে নাই—হাসিয়া বসন্ত বলিল—আমার কপালেও অনেক কষ্ট আছে গো! কাল তো তোমাকে বলেছি, আমার কাসির সঙ্গে রক্ত ওঠে। কাসের ব্যামো! এত পান-দোক্তা খাই তো ওই জন্যে। রক্ত উঠলে লোকে বুঝতে পারবে না। আর আমিও বুঝতে পারব না; দেখলেই ভয়, না দেখলেই বেশ থাকি। দলের কেউ জানে না, জানে কেবল মাসী। কিন্তু এখনও নাচতে গাইতে পারি, চটক আছে, পাঁচটা লোক দেখে বলেই দলে রেখেছে। যেদিন পড়ে হয়ে পড়ব, সেদিন আর রাখবে না, নেহাৎ ভাল মানুষের কাজ করে তো লোক দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। নইলে, যেখানে রোগ বেশী হবে, সেইখানেই ফেলে চলে যাবে, গাছতলায় মরতে হবে। তারপরেই হয়তো শ্যাল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে।

নিতাই শিহরিয়া উঠিল। বলিল—বসন!

বসন বলিল—সত্যি কথা কবিয়াল—এই আমাদের নেকন। তবে আমার নেকন আরও খারাপ। তুমি সেই ইস্টিশানে গেয়েছিলে—'ফুলেতে ধুলোতে প্রেম'।—কবিয়াল, তখন ধুলোর সঙ্গে মাটির সঙ্গে প্রেম হবে আমার। আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল—দুব্বো ঘাসের রসে আর কতদিন উপকার হবে! রোজ সকালে বসন দূর্ব্বাঘাস থেঁতো করিয়া রস খায়। অত্যন্ত গোপনে সে এই কাজটি করে। নিয়মিত খাওয়া হয় না। তাহার অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় সম্ভব হইয়া উঠে না। মধ্যে মধ্যে প্রৌঢ়া মনে করাইয়া দেয়—বসন, সকালবেলায় দুব্বোর রস খাস তো?

বসন্ত কখনও কখনও সজাগ হইয়া উঠে, কখনও বা ঠোঁট উল্টাইয়া বলে—ম'লে, ফেলে দিয়ো মাসী। ও আমি পারি না।

আবার কাসি বেশী হইলেই সে সভয়ে গোপনে দূর্ব্বাঘাস সংগ্রহ করিতে

ছোটে। ঘাস ছেঁচিতে ছেঁচিতে আপন মনেই কাঁদে।

নিতাইয়ের মনটা উদাস হইয়া উঠিল। সে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। হাসিতে হাসিতে বসন্ত বলিল তাহার কাসির অসুখের কথা, নিতাইয়ের মনে হইল, বসন্তের ওই ক্ষীণ হাসিতে ঈষৎ বিস্ফারিত ঠোঁট দুইটির কোলে-কোলে লাল কালির কলমে টানা রেখার মত রক্তের টকটকে রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'ফেলিয়া চলিয়া যাইবে; গাছতলায় মরিতে হইবে। জীবন্তেই হয় তো শেয়াল কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইবে।' অগ্র-পশ্চাৎ সে সব ভুলিয়া গেল, নীরবে মাথা হেঁট করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পরেই বসন্ত আবার কথা বলিল—তাহার সে কণ্ঠস্বর আর নাই; কৌতুক-সরস কণ্ঠে মৃদু শব্দে হাসিয়া বলিল—গাঁটছড়া বাঁধবে নাকি? গাঁটছড়া?

কথাটা বসন নেহাৎ ঠাট্টা করিয়া বলিল। আশ্চর্য্য বসন! মরণের এত কথা বলিয়া ইহারই মধ্যে সে ভুলিয়া গিয়াছে।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। স্থির দৃষ্টিতে বসন্তকে কিছুক্ষণ সে দেখিল। শাণিত ক্ষুরের মত ঝকঝকে ধারালো বসন্তের ধার ক্ষয় হইয়া একদিন টুকরা-টুকরা, হয়ত গুঁড়া হইয়া যাইবে উখায় ঘষা ইস্পাতের গুঁড়ার মত।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—দেখছ?

—হ্যাঁ!

—কি দেখছ? কেয়াফুলও শুকোয়। চোখের কোণে কালি পড়েছে।

বসন্তের মুখে তখনও হাসির রেখা। সে হাসি আশ্চর্য্য।

নিতাই কোন উত্তর না দিয়া সে বসন্তের আঁচলখানি টানিয়া নিজের চাদরের খুঁটে বাঁধিতে আরম্ভ করিল।

বসন্ত চমকিয়া উঠিল—ও কি করছ? সে-এক বিচিত্র বেদনার্ত্ত উত্তেজনাভরে সে আপনার কাপড়ের আঁচলখানা আকর্ষণ করিয়া বলিল—না না, না। ছি!

প্রসন্ন হাসিতে নিতাইয়ের মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে বলিল—গিঁঠ পড়ে গিয়েছে বসন। আমি যদি আগে মরি, তবে তুমি সেদিন খুলে নিও গিঁঠ; আর তুমি যদি আগে মর, তবে সেই দিন আমি খুলে নাব গিঁঠ।

বসন্তর মুখখানি মুহূর্তে কেমন হইয়া গেল।

ঠোঁট দুইটা, শীতশেষের পাণ্ডুর অশ্বত্থপাতা উতলা বাতাসে যেমন থরথর করিয়া কাঁপে, তেমনি করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার রক্তাভ সুগৌর মুখখানা যেন সঙ্গে সঙ্গে সাদা হইয়া গিয়াছে। গরবিনী দর্পিতা বসন্ত যেন এক মুহূর্তে কাঙালিনী হইয়া গিয়াছে।

নিতাই এবার হাসিয়া বলিল—এস এস, আমার আর তর সইছে না। ঠাকুরের দরবারে রাগ করে না।

—রাগ? বসন্ত বলিল—আমার রাগ সইতে পারবে তো তুমি?

—পায়ে ধরে ভাঙাব! নিতাই হাসিল।—এস এস।

—এই যে বাবা! কবিয়াল এস। আহ্বান করিল আখড়ার সেই বাবাজী।

হাতজোড় করিয়া নিতাই বলিল—আজ্ঞে হাঁ প্রভু! তারপর সে মুখ ফিরাইয়া বসন্তকে বলিল—পেন্নাম কর বসন। দুজনেই তাহারা একসঙ্গে প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া নিতাই স্মিতমুখে বলিল—বাবা উনিই আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

—প্রেমের গুরু তোমার? বেশ—বেশ। বাবাজী হাসিল।

বসন্ত ফলমূল মিষ্টান্নগুলি নামাইয়া দিল। আঁচল খুলিয়া সওয়া পাঁচ আনা পয়সা বাহির করিয়া নামাইয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আশীর্ব্বাদী দেবেন বাবা।

বাবাজী দুই গাছি ফুলের মালা আনিয়া দুইজনকে পরাইয়া দিলেন।

ফিরিবার পথে নিতাই বলিল—আমার গুরু হতে হবে কিন্তু।

—গুরু! বসন্ত চকিত দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিল। বসন্ত যেন পাল্টাইয়া গিয়াছে। গুরুগিরির রহস্যেও সে হাসিতে পারিল না।

—হ্যাঁ। আমাকে পদাবলী শেখাতে হবে।

—পদাবলী? মহাজনের পদ?

—হ্যাঁ।

বসন্ত চলিতে চলিতেই গান আরম্ভ করিল—অতি মৃদুস্বরে—নিতাই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল। গত রাত্রির সেই গানখানি। সমস্ত পথ ধরিয়া গানখানি সম্পূর্ণ গাহিয়া বসন্ত বলিল—এই হাতেখড়ি দিলাম।

নিতাই দেখিল, বসন্তের মুখ চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে।

বসন্ত হাসিতে হাসিতে চোখমুখ মুছিয়া বলিল—মহাজনের পদ। চোখ ফেটে জল আসে।

বাসায় ফিরিতেই একটা কলরব পড়িয়া গেল। মদের নেশা তখন তাহাদের জমিয়া আসিয়াছিল। ফুলের মালা গলায়—গাঁটছড়া বাঁধিয়া নিতাই ও বসন ফিরিতেই হুলুধ্বনি দিয়া তাহারা হৈ-চৈ করিয়া উঠিল। গাঁটছড়াটা খুলিবার কথা নিতাই বসন—দুইজনের কাহারও মনে হয় নাই।

নিতাই হাসিতেছিল। সে লজ্জা পাইল না—কোন গ্লানি অনুভব করিল না।

কিন্তু লজ্জা পাইল বসন্ত। সে গাঁটছড়াবাঁধা নিতাইয়ের কাঁধের চাদরখানা টানিয়া লইয়া লজ্জায় ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

অপরাহ্নে বসন্ত নিতাইকে ডাকিয়া বলিল—এই লাও। গেরুয়া কাপড়ের মলাট দেওয়া একখানা খাতা সে নিতাইয়ের হাতে তুলিয়া দিল।

—কি? নিতাই খাতাখানা উল্টাইল। ডগডগে লাল আলতার কালিতে মোটা কলমে গোটা গোটা সে-কেলে মোটা হরপে লেখা গান। গানে গানে খাতাখানি ভর্ত্তি।

—আমাদের গানের খাতা। পদাবলীর গান পেথমেই আছে দেখ।

নিতাই কিন্তু সে লেখার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না।

বসন্ত বলিল—পেথম পদ হ'ল—গৌরচন্দ—

"গৌরাঙ্গের দুটি পদ—যার ধন সম্পদ—সে জানে ভকতি রস সার।"

তারপরে হু লম্বর হ'ল কেত্তনের পদ। সে গড়গড করিয়া বলিয়া গেল—

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মুরছা পায়।"

নিতাই বলিল—সুর দিয়ে গেয়ে বল বসন—সুর দিয়ে, সুর দিয়ে।.

বসন্ত হাসিয়া মৃদু স্বরে গান ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও গুনগুন করিয়া সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতে আরম্ভ করিল। খাদেও নিতাইয়ের গলা বেশ মিষ্ট। গান শেষ করিয়া বসন্ত হাসিয়া বলিল—তোমার নাম আজ পাল্টিয়ে দিলাম। কয়লা-মাণিক আর বলব না।

হাসিয়া নিতাই বলিল—কেনে? কয়লা-মাণিক তো বেশ নাম, কালো মাণিক তো সবাই বলে।

সকৌতুকে বার বার ঘাড় নাড়িয়া বসন্ত বলিল—না। কালো-মাণিকও লয়

—তবে?

—ব্রজের নাগর। তুমি আমার ব্রজের নাগর। ধুলোতে ফুলেতে প্রেম—কবিয়াল—তুমিই তো গেয়েছ। আমি শুকিয়ে যখন ঝরব—তখন তোমার বুকেই তো ঝরব। তাই তুমি আমার ব্রজের নাগর। আমার ব্রজের নাগর

সতেরো

ভ্রাম্যমান দল। নাচ ও গানের ব্যবসার সঙ্গে দেহের বেসাতি করিয়া বেড়ায়—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে। কবে কোন পর্ব্বে কোন্ পথে কোথা হইতে কোথায় যাইতে হইবে সেও ইহাদের নখদর্পণে। বীরভূম হইতে মুর্শিদাবাদ, পদব্রজে, গরুর গাড়ীতে, ট্রেনে, নৌকায—মালদহ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আষাঢের প্রারম্ভে বাড়ি ফেরে।

প্রৌঢ়া বলে—আগে আমরা পদ্মাপার পর্য্যন্ত যেতাম। পদ্মাপারে বাঙাল

দেশে আমাদের ভারি খাতির ছিল।

নির্ম্মলা প্রশ্ন করে—পদ্মাপার তুমি গেযেছ মাসী ?

মাসী পদ্মাপারের গল্প বলিতে বসে। বেশ আরাম করিয়া পা ছড়াইযা বসিযা সুপারী কাটিতে কাটিতে বলে—বাতের 'ত্যাল' খানিক মালিশ ক'রে দে দেখি ; পদ্মাপারের কথা বলি শোন। আপসোস করিযা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিযা বলে—আঃ মা, তোরা আর কি দেখলি—কিই বা রোজগার করলি ! সে 'ছাশ' কি ! সোনার 'ছাশ' ! মাটি কি ! বারোমাস মা-নক্ষী যেন আঁচল পেতে বসে আছেন। সুপুরী কিনতে হয না মা। সুপুরীর বন। যাও—কুড়িযে নিযে এস। ডাব-নারকেল –আমাদের 'ছাশে'র তালের মতন। দু-ধারি পাটের 'ক্ষ্যাত'। সে একখানা হাত দীর্ঘ ভঙ্গিতে বাড়াইযা দিযা সুবিস্তীর্ণ পাট চাষের কথা বুঝাইযা দিতে চেষ্টা করে। তারপর আবার বলে—এক এক পাটের ব্যাপারী কি ! পযসা কত ! এই বড বড লৌকো। ব্যাপারীদের নজর কি, হাত দরাজ কত। প্যালা দেয আধুলি, টাকা, সিকির কম তো নয। আর তেমনি কি খাবার সুখ ! মাছই কত রকমের ! ইলিশ-ভেটকি—কত মাছ মা—'আছলি্য' মাছ। আঃ তেমন কি লঙ্কা খাবার ধুম !

ললিতা বলে—আমাদের একবার নিযে চল মাসী ওই ছাশে।

মাসী বলে—মা, সি রামও নাই আর সি অযুধ্যেও নাই ! সি ছাশে আর আমাদের আদরও নাই মা। সি কালে আমরা যেতাম—পালা গান গাইতাম। পদাবলীর গান—আমাদের সি কালের ওস্তাদেরা আবার বেশ রসান দিযে পালাগান 'নিকতো'—সেই সব গান আমরা গাইতাম। যে যেমন আসর আর কি ! তেলক কাটতে হ'ত, গলায কণ্ঠি পরতে হ'ত। আবার বাজারে হাটে হালফেশানী গান হ'ত। আজকাল আর পালাগান কে শোনে বল ? নইলে পালাগান নিযেই তো ঝুমুর !

নির্ম্মলার প্রযজন বেহালাদার বেশ মানুষ; সারাদিন বেহালাটি লইযাই ব্যস্ত। ছড়িতে রজন ঘষিতেছে, বেহালার কান টানিযা টানিযা তার ছিঁড়িতেছে

আবার তার পরাইতেছে, বেহালাখানি ঝাড়িতেছে, মুছিতেছে, মাঝে মাঝে সযত্ন-সঞ্চিত বার্নিশের শিশি হইতে বার্নিশ লইয়া মাখাইতেছে; কিন্তু বড় একটা বাজায় না। আসরে বাজায়, বাসায় নতুন গানের মহলা বসিলে বাজায়, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সারা দিন বেহালা লইয়া থাকিলেও আপন মনে সে বাজায় না, ছড়ি টানিয়া সুর বাঁধে মাত্র। গভীর রাত্রে সবাই যখন ঘুমায়, তখন সে মধ্যে মধ্যে এক-একদিন বেহালা বাজাইতে বসে। সে দিনটিও এখন নিতাই পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারে। নির্ম্মলার ঘরে আগন্তুক আসিয়া মহোৎসব জুড়িয়া দি[illegible] নিতাই বুঝিতে পারে যে, আজ বেহালাদার বেহালা বাজাইবে।

সে বাজনা অদ্ভুত। নিতাই সে বাজনা শুনিয়াছে। কিন্তু কাছে আসিয়া বসিলেই বেহালাদারের আর জমে না। নিতাই সে রাত্রে বাজনার জন্য ঘুমের মধ্যেও উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে, বাজনার সুর শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু সে উঠে না, শুইয়া শুইয়াই শোনে। মহিষের মত লোকটা অবশ্য থাকে—চুপ করিয়া রাঙা চোখ দুইটা মেলিয়া নেশা-বিহ্বল দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু বেহালাদার তাহাকে গ্রাহ্য করে না। তাহার উপস্থিতিটা যেন উপস্থিতিই নয়।

বেহালাদার মাসীর কথা শুনিতে শুনিতে বলিল—উ ত্যাগে[illegible] ঝিদের গান শুনেছ মাসী?

—শুনি নাই? ভারি মিষ্টি সুর। প্রৌঢ়া নিজের মনেই গুন গুন করিয়া সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। বার দুয়েক ভাঁজিয়া নিজেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু, আসছে না ঠিক।

বেহালাদার কি মনে করিয়া বার দুয়েক বেহালার উপর ছড়ি টানিল, প্রৌঢ়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ হ্যাঁ! ওই বটে। কিন্তু বেহালাদার সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া গেল।

নির্ম্মলা সুরটি শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, বেহালাদার থামিয়া যাইতেই সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—ওই এক ধারার মানুষ। বাজাতে

আরম্ভ করে থেমে গেল।

ললিতার প্রিয়জন দোহার লোকটি অত্যন্ত তার্কিক, তর্ক তাহার অধিকাংশ সময় ওই বাজনদার লোকটির সঙ্গে। বাজনার বোল ও তাল লইয়া তর্ক তাহাদের লাগিয়াই আছে। মধ্যে মধ্যে ললিতার সঙ্গেও তর্ক হইতে ঝগড়া বাধিয়া যায়। ললিতা তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়, লোকটা মাসীর কাছে নালিশ করে, মাসীর বিচারে পরাজয় যাহারই হউক, সে-ই ললিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে—দোষ হইছে আমার, ঘাট মানছি আমি। আর কখুনও এমন কম্ম করব না। কান মলছি আমি। লোকটা সত্যই কান মলে।

নির্ম্মলা, বসন্ত লোকটার নাম দিয়াছে—'ছুঁচো। ছি-চরণের ছুঁচো।' কথাটা অবশ্য আড়ালে বলিতে হয়, নহিলে ললিতা কোঁদল বাধাইয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া বসে। দোহার লোকটি কিন্তু রাগে না, হাসে।

বাজনদারটির প্রিয়তমা কেহ নাই। জুটিলেও টিকিয়া থাকে না। লোকটির কেমন স্বভাব—যে নারীটির সহিত সে প্রেম করিবে, তাহারই টাকা-পয়সা সে চুরি করিয়া বসিবে। লোকটি প্রৌঢ়। নির্ম্মলা, ললিতা দুইজনেই এক এক সময় তাহার প্রিয়তমা ছিল। কিন্তু ঐ কারণেই বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে। লোকটা কিন্তু বাজায় খুব ভাল—যেমন তাহার তালজ্ঞান, বাজনার হাতটিও তেমনি মিঠা। কতবার চুরি করিয়া ঝগড়া করিয়া দল হইতে চলিয়া গিয়াছে, আবার কিছুদিন পর ফিরিয়া আসিয়াছে। লোকটা অতিমাত্রায় চরিত্রহীন। রাত্রে বাজনা বাজায়, দিনে সে ঘুরিয়া বেড়ায় নারীর সন্ধানে।

নির্ম্মলা ললিতা নিতাইয়ের একটা নাম দিয়াছে।—বলে—'বসন্তের কোকিল'।

বসন্ত নিতাই দুজনেই হাসে।

এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিতাইয়ের দিন কাটিয়া যায়। ইহারই মধ্যে সে নিস্পৃহ নিরাসক্তির এমন একটি আবরণ তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে যে, সব কিছুই তাহার সহ্য হয়, অথচ সহনশীলতার গণ্ডী তাহাকে সঙ্কুচিত করে

না। অহরহ তাহার মনের মধ্যে ঘোরে গানের কলি। বসন্তের কোকিল নাম দেওয়ায় সে একটা গান বাঁধিয়াছে, কবিগানের পাল্লার আসরে যে কোন রকমে খাপাইয়া লইয়া সে সেই গানটি গায়—

“তোরা—শুনেছিস কি—বসন্তের কোকিল-ঝঙ্কার!
বাঁশী কি সেতার—তার কাছে ছার—
সে গানের কাছে সকল গানের হার।”

‘কোকিল’ নামটাই তাহার চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে। ওই নামেই সে এখন চারিদিকে পরিচিত। ইহারই মধ্যে সে অনেক শিখিয়াছে, অনেক সংগ্রহ করিয়াছে। প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবিয়ালগণের অনেক প্রসিদ্ধ পালাগানের লাইন তাহার মুখস্থ। হরুঠাকুর, গোপাল উড়ে, ফিরিঙ্গী কবিয়াল অ্যাণ্টনী সাহেব, কবিয়াল ভোলা ময়রা হইতে নিতাইয়ের মনে মনে বরণ করা গুরু কবিয়াল তারণ মণ্ডল পর্য্যন্ত কবিয়ালদের গল্প গান সে সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে। অবসর সময়ে কত খেয়ালই হয় নিতাইয়ের! বসিয়া বসিয়া ঝুমুর দলের মেয়েদের ‘লক্ষ্মীর কথা’টিকে সে পয়ার ছন্দে কবিতা করিয়া ফেলিয়াছে।

লক্ষ্মীর বারের দিন সে বসন্তকে অবাক করিয়া দিয়াছিল। বসন্ত যখন কথা শুনিয়া ঘরে আসিয়া সযত্নে ঠাঁই করিয়া প্রসাদ খাইতে দিল, তখন নিতাই বলিল—কথা শোনা হ’য়ে গেল?

—হ্যাঁ।

—তবে আমার কাছে একবার শুনে লাও।

সবিস্ময়ে বসন্ত বলিল—কি?

—লক্ষ্মীর কথা! বলিয়াই নিতাই হাতখানি বসন্তের দিকে প্রসারিত করিয়া কবিগানের ছড়া বলার সুরে আরম্ভ করিয়া দিল—

“নমো নমো লক্ষ্মী দেবী—নমো নারায়ণী—
বৈকুণ্ঠের রাণী মাগো—সোনার বরণী।

শতদল পদ্মে বৈস—তেঁই সে কমলা।
সামান্য সহে না পাপ—তাই তো চঞ্চলা।"

বসন্ত নির্বাক হইয়া গিয়াছিল।—কোথা থেকে জোগাড় করলে? নতুন পাঁচালীর বই কিনেছ, তাতেই আছে বুঝি?

নিতাই কথার জবাব না দিয়া শুধু হাসিয়াছিল।

—বল কেনে?

—আগে শোনই কেনে। ভনিতেতেই সব পাবে।

"অধম নিতাই কবি বসন্তের কোকিল—
লক্ষ্মীর বন্দনা গায় শুনিবে নিখিল।"

মুখরা দর্পিতা বসন্ত উল্লাসে বিস্ময়ে অধীর হইয়া ছুটিয়া গিয়া সকলকে ডাকিয়া আনিয়াছিল—ওগো মাসী, কবিয়াল লক্ষ্মীর পাঁচালী নিকেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে সে আসর করিয়া সকলকে ডাকিয়া কবিয়ালের পাঁচালী শুনাইয়া তবে ছাড়িল।

নিতাইয়ের পাঁচালী শুনিয়া দলের সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই পাঁচালীটি ভাল হইয়াছিল। তাহা ছাড়া তাহাদের পরিচিত কবিয়ালেরা কবি গান করে, ছড়া কাটে, দুই-চারিটা গান লেখে, কিন্তু এমনভাবে ধর্ম্মকথা লইয়া পাঁচালী রচনা কেহ করে না। সে-কালের বড় বড় কবিয়ালরা করিয়া গিয়াছে, তাই আজ পর্য্যন্ত চলিয়াছে, ভনিতার সময়ে—সেই সব কবিয়ালদের উদ্দেশে—ইহারা প্রণাম জানায়। নিতাই তেমনি পাঁচালী রচনা করিয়াছে। সেই দিন হইতেই তাহার সম্ভ্রম আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

নিতাইয়ের পাঁচালীই এখন এই দলটিতে ব্রতকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু এই দলেই নয়, আর পাঁচ-সাতটা দলের ওস্তাদ এই পাঁচালী লিখিয়া লইয়া গিয়াছে। পূর্ণিমায় বৃহস্পতিবারে যখন মেয়েরা বসিয়া তাহার রচনা করা লক্ষ্মীর পাঁচালী বলে, তখন নিতাই বেশ একটু গম্ভীর হইয়া উঠে! মনে মনে ভাবে, আর কী এমন রচনা করা যায়, যাহা দেশে দেশে লোকের মুখে মুখে ফেরে!

তাহার দপ্তরটিও ক্রমশ বড় হইয়া উঠিতেছে। অনেক নূতন বই সে মেলায় কিনিয়াছে, আজকাল কলিকাতা হইতেও বই আনায়। এই সন্ধানটি শিখাইয়াছে দলনেত্রী ওই মাসী। মাসী অনেক জানে। নিতাই এক এক সময় অবাক হইয়া যায়। সে তাহাকে সত্যই শ্রদ্ধা করে। 'বিদ্যাসুন্দরে'র সন্ধান তাহাকে মাসীই দিয়াছিল। বসন্ত একদিন চুল বাঁধিতে বাঁধিতে খোঁপা না বাঁধিয়াই বেণী ঝুলাইয়া কি কাজে বাহিরে আসিয়াছিল; নিতাই বলিয়াছিল—বিনুনীতেই তোমাকে মানিয়েছে ভাল বসন, খোঁপা আর বেঁধো না।

মাসী সঙ্গে সঙ্গে ছড়া কাটিয়া দিয়াছিল—

"বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়,
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।"

নিতাই বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে মাসীর দিকে চাহিয়াছিল। তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া হাসিয়া মাসী বলিয়াছিল—'বিদ্যেসোন্দর' জান বাবা? রায় গুণাকরের 'বিদ্যেসোন্দর'?

বসন্ত, ললিতা, নির্ম্মলা ধরিয়া বসিয়াছিল—আজ কিন্তু 'বিদ্যেসোন্দর' বলতে হবে মাসী।

—সব কি মনে আছে মা! ভুলে গিয়েছি।

—তবে সেই তোমার কথাটা বল। সেটি তো মনে আছে। বসন্ত হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।

—মেলেনী মাসীর কথা? মাসী হাসিয়া আরম্ভ করিয়াছিল—

"কথায় হীরার ধার—হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।"

মাসী গড় গড় করিয়া বলিয়া যায়—

"বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে পাছে কন্দলের দায়।"

নিতাই মাসীর কাছে বসিয়া বিনয় করিয়া বলিয়াছিল—আমাকে বলবে মাসী,

আমি খাতায় লিকে রাখব ?

—আমার তো সব মনে নেই বাবা। তুমি বিত্তেসোন্দর বই আনাও কেনে। বটতলার ছাপাখানায় নিকে দাও, ডাকে চলে আসবে। তুমি দাম দিযে ছাড়িযে লেবে। বটতলার ঠিকানাটি পর্য্যন্ত মাসীর মুখস্থ।

বিদ্য সুন্দরের সঙ্গে সে অন্নদামঙ্গল পাইযাছে। বইযের পৃষ্ঠায বিজ্ঞাপন দেখিযা দাশু রাযের পাঁচালী, উদ্ভট কবিতার বইও আনাইযাছে। দাশু রায় পড়িয়া তাহার মনের একটা সংশয় কাটিযাছে। "ননদিনী, ব'লো নাগরে। ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।" এবং "গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,—স্বপ্নে দেখা দিযে, চৈতন্য করায়ে চৈতন্যরূপিনী কোথায লুকাল," দাশু রাযই লিখিযাছেন; আবার খেউড়েও দাশু রায চরম লেখা লিখিযা গিয়াছেন। আসরে খেউড়ের পালা গাহিবার আগে সে দাশু রাযকে স্মরণ করিযা মনে মনে প্রণাম করে।

খেউড় আর তাহাকে খুব বেশী গাহিতে হয না। কিছুদিনের মধ্যেই কবিয়াল এবং কবিগান-শ্রোতাদের মধ্যে তাহার বেশ একটা সুখ্যাতি রটিযা গিয়াছে। তাহার ফলে লোকে এখন তাহার গান মন দিযা শোনে; অশ্লীল খেউড়, গালীগালাজের উত্তরে সে চোখা-চোখা বাঁকা রসিকতায গান আরম্ভ করিলে লোকে এখন তাহারই তারিফ করে। কিছুদিন আগে একটা আসরে এমনি এক কবিযালের সঙ্গে আসর পড়িযাছিল। লোকটা বুড়া হইযাছে, তবুও যত তাহার টেরির বাহার তত লোকটা অশ্লীল। খেউড়ে নাকি বুড়ার নাম-ডাক খুব।

সেও একটা ঝুমুর দলের সঙ্গে থাকে। বুড়াই আগে আসর লইযা নিতাইকে কালাচাঁদ খাড়া করিয়া নিজে বৃন্দে সাজিয়া বসিল। চন্দ্রাবলীটি কে, সে কথা খুলিযা না বলিলেও সে যে বসন্ত একথা বুঝাইযা দিতে বাকী রাখিল না। এই সম্বন্ধটা কবির পাল্লায বড় সুবিধার সম্বন্ধ। বিশেষ যে আগে আসরে নামে, সে বৃন্দা হইয়া প্রতিপক্ষকে কালাচাঁদ করিয়া গালি-গালাজের বিশেষ সুবিধা করিযা

লয। তাহা ছাড়া প্রথম আসরে যেদিন বসন্ত তাহাকে চড় মারিযাছিল, সেদিন প্রতিপক্ষ কবিযাল নিতাইয়ের সঙ্গে এই সম্বন্ধ পাতাইযাই তাহাকে জব্দ করিযাছিল, সে কথাও কাহারও অজানা নাই। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই সুবিধা পাইলেই প্রতিপক্ষ এই সম্বন্ধ পাতাইযা বসে। লোকটা আসরে নামিযাই খেউড় আরম্ভ করিল। নিতাইযের চেহারা, বসন্তের চেহারা লইযা এবং অশ্লীল গালি গালাজ করিয়া আসর শেষ করিল।

নিতাই আসরে নামিতেই প্রৌঢ়া বলিল—বাবা, খানিকটা রঙ চড়াবে নাকি?

নিতাই হাসিয়া বলিল—দেখি এক আসর, তারপর হবে। বলিযাই সে আরম্ভ করিল—গানটা সেই পুরানো গান—

> "বুড়া বয়সে বৃন্দে—কুঁচকো মুখে—আর রসকলি কাটিস্ নে।
> সেবা ভিযেন না-জানিস যদি—গেঁজলা তাড়ি ঘাঁটিস্ নে।
> শোনের নুড়ি পাকা চুলে—কাজ নেই আর আলবোট তুলে—
> ও তোর—ফোকলা দাঁতে—পড়ছে লালা—জিভ দিযে আর চাটিস্ নে।
> —ও—হায়,—বুড়ি মরে না—মরণ নাই—
> ও—ভযে যম—আসে নাকো—ও—তাই মরণ নাই।"

—ভয কিসের? দোহারগণ, জান তোমরা—যমের ভযটা কিসের?

একজন বলিল—অরুচি, যমের অরুচি।

—উঁহু।

অন্য একজন বলিল—পাছে সেখানে পেজোমি করে, তাই।

—উঁহু। বলি চন্দ্রাবলী তুমি জান?

বসন্ত বিব্রত হইল, কি বলিলে কবিযালের মনোমত হইবে—সে জানে না, তবু সে ঠকিবার মেযে নয়, সে বলিল—বুড়ি বলছে যমের সঙ্গে পিরীত করতে চায, তাই সে ওকে নেয না।

নিতাই বাহা-বাহা করিয়া উঠিল। ঠিক ঠিক। বলিযাই সে গান ধরিয়া দিল—

> "ও পাছে, পিরীত করিতে চায—হ ওরে নেয না তাই—

ও তোর পায়ে ধরি—ওরে বুড়ি—ফোকলা দাঁতে হাসিস নে।"

নিতাইয়ের মিলের বাহারে, মিঠাগলার মাধুর্য্যে, ব্যঙ্গ শ্লেষের তীক্ষ্ণতায় জমিয়া উঠে বেশ। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত নাচে। বসন্তও আজকাল তেমন অশ্লীল ভঙ্গি করিয়া নাচে না, তবে নাচে সে বিভোর হইয়া। লোকে পছন্দ করে। জনতার এক-একটা অংশ অবশ্য অশ্লীল ইঙ্গিত করিয়া চীৎকার করে, কিন্তু বেশী অংশ তারিফই করে। দুই-দশজন ভদ্রলোককেও ক্রমে জমিতে দেখা যায় নিতাইয়ের পালার আসরে! নিতাইও অবসর বুঝিয়া গানকে আনিয়া ফেলে মিষ্ট রসের খাতে।

সে গান ধরে—

"তোমায় ভালোবাসি ব'লেই তোমার সইতে নারি অসৈরণ,
নইলে তোমায় কটু বলার চেয়ে ভাল আমার মরণ।"

সে আরম্ভ করে, তুমি বৃন্দে—তুমিই তো আমার প্রেমের গুরু—তুমিই তো আমাকে রাধাকে চিনাইয়াছ—তুমিই তো রচনা করিয়াছ—পূর্ণিমায় পূর্ণিমায়—কুঞ্জশয্যা, আমাদের সম্মুখে রাখিয়া—তুমিই তো গাহিয়াছ—যুগল-রূপের মাধুরী—! ওগো দূতী—সেই তোমার এই বৃদ্ধ বয়সে এই মতিভ্রংশ দেখিয়া মনের যাতনায় তোমাকে কটু কথা বলিয়াছি। তুমি নিজেই একবার ভাবিয়া দেখ তোমার নিজের কথা।

"রসের ভাণ্ডারী তুমি—কথা তোমার মিছরির পানা—
সেই তুমি আজ হাটে বেচ— সস্তা খেউড় ঘুগনীদানা।"

আসরের মোড় ফিরাইয়া দেয় নিতাই।

বসন্ত রাগ করে। কেন শেষকালে লোকটাকে এমন ধারার মিষ্ট কথা বলিলে?

সে বলে—ওকে বিঁধে বিঁধে মারতে হ'ত। খাতির কিসের?

নিতাই হাসিয়া বলে—বসন, নরম গরম পত্রমিদং, বুঝলে? নরম গরম—মিঠে কড়া—বুঝলে কিনা—ওতেই আসর মাৎ। তারপর বুঝাইয়া বলে—

লোকটার বয়েস হয়েছে—প্রাণে দুঃখ দিলে কি ভাল হ'ত? তুমিই বল!

বসন্ত ইহার পর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। নিতাই হাসিয়া বলে—রাগ করলে বসন?

বসন্ত হাসিয়া বলে—না।

—তবে?

—তবে ভাবছি, তুমি আমাকে সুদ্ধ নরম ক'রে দিলে।

নিতাই হাসে।

বসন্ত বলে—সে চড মনে পড়ে?

—সে চড় না খেলে কোকিল তোমার ডাকতে শিখত না। ও আমার গুরুর চড়।

বসন্ত আজ তাহার গলা জড়াইয়া ধরে। নিতাই তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দেয়।

খেউড়, যাহাকে বলে কাঁচা খেউড—সেও তাহাকে গাহিতে হয। না গাহিলে চলে না। এমন আসর আসে, এমন প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে হয যে, সেখানে উত্তরে খেউড় ছাড়া অন্য কিছু অচল হইয়া পড়ে। আসর ও প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝিয়া খেউড় গায় সে। আসরে একটা পালা গানের পরেই সে প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারা যায়। প্রথমেই সেদিন তাহার চেহারাটা হইয়া উঠে থমথমে। চোখ দুইটা উগ্র হইয়া উঠে। প্রথম হইতেই সে স্তব্ধ হইয়া যায়। দলের লোকেরাও বুঝিতে পারে, আজ লাগিল—বসন্ত এবং প্রৌঢ়া বুঝিতে পারে সর্ব্বাগ্রে।

প্রৌঢ়া বলে—বসন! ইঙ্গিত করিয়া সে হাসে।

বসন্ত উত্তর দেয়—হ্যাঁ মাসী।

সে আসর হইতে বাহির হইয়া যায়, সেখান হইতে নিতাইকে ডাকে—শোন।

প্রৌঢ়া তাহাকে সচেতন করিয়া দেয়—বাবা! ডাকছে তোমাকে। বাবা গো!

নিতাই চমকিয়া উঠে। তারপর গম্ভীর মুখেই বাহিরে যায়, বসন্তের কাছে দাঁড়াইয়া হাত বাড়ায়। গ্লাস পরিপূর্ণ করিয়া বসন্ত মদ ঢালিয়া হাতে তুলিয়া দেয়। নি াই ফিরিয়া আসিয়া আবার বসে—আর এক চেহারা লইয়া বসে সে।

তারপর রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আসর মাতিয়া উঠে—খেউড়ে অশ্লীলতায। প্রতি আসরের পূর্ব্বেই বসন্ত পরিপূর্ণ গ্লাস মদ তুলিয়া দেয় তাহার হাতে। সে খায। মধ্যে মধ্যে নিজে ঢালিয়া বসন্তকে খাওয়ায়। বসন্তর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। সেদিন আসরে আর কিছু বাকী থাকে না। নিতাইয়ের রক্তের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে সেদিন মদের বিশেষ স্পর্শ পাইয়া জাগিয়া উঠে—তাহার জন্মলব্ধ বংশধারার বিষ; সমাজের আবর্জ্জনা-স্তূপের মধ্য হইতে যে বিষ শৈশবে তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল, সে বিষ তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে রক্তবীজের মত। ভাষায়—ভাবে—ভঙ্গীতে অশ্লীল কদর্য্য কোন কিছুই তাহার মুখে বাধে না। শুধু তাই নয—সেদিন সে এমন উগ্র হইয়া উঠে যে, সামান্য কারণেই সে মারিতে উদ্যত হয়।

প্রৌঢ়া সেদিন দলের লোককে সাবধান করে। বলে—হাতী আজ মেতেছে বাবা। তোরা একটুকুন সমীহ ক'রে স'য়ে থাক। তোরা তো সব কত সমযে কত বলিস। ও তো সব সয়।

নির্ম্মলা হাসিয়া বলে—মাউতকে (মাহুত) বল মাসী।

প্রৌঢ়া হাসে—সে বসন্তের দিকে চায়। বসন্তও হাসে। এমন দিনে বসন্তর হাসি অদ্ভুত হাসি।

নির্ম্মলা খিলখিল করিয়া হাসে বসন্তের এই হাসি দেখিয়া; বলে—কি লো হাসতে গিয়ে যে গলে পড়েছিস বসন।

বসন্তের মস্তিষ্কেও মদের নেশা—চোখ তাহার ঢুলঢুল করে। সে তবুও হাসে কারণ এমন দিনটি তাহার বহু প্রত্যাশা করা দিন। এমন দিনেই নিতাই—

বসন্তকে পরিপূর্ণভাবে ধরা দেয়; বসন্তকে লইয়া সে অধীর হইয়া উঠে।

সবল বাহুর দোলায় বসন্তকে তুলিয়া লইয়া দোলায়; কখনও কখনও শিশুর মত উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার ধরিয়া লয়। মাথার উপর বসন্তকে তুলিয়া লইয়া নিজে নাচে। আর একটা অদ্ভুত খেয়াল আছে তার। সে হঠাৎ শুইয়া পড়িয়া বলে—নাচ বসন, আমার বুকের ওপর চড়ে কালীর মত নাচ। বসন্ত নির্জ্জীবের মত ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িলে তবে তাহার নিষ্কৃতি। এমন দিনটি বসন্তের বহু-প্রত্যাশার দিন।

সহজ-শান্ত নিতাই আর এক মানুষ—সে আদরে যত্নে বসন্তকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখে, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকে বসন্তের নাগালের বাহিরে।

যখন বসন্ত আপনা হইতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলে সে তাহাকে টানিয়াও লয় না, আবার ঠেলিয়া সরাইয়াও দেয় না। তাহার মাথায় কিংবা পিঠে হাত বুলাইয়া দেয়—বসন্ত যেন কত ছেলেমানুষ। কিন্তু তাহাকে উপেক্ষাও করা যায় না—এমন পরম সমাদর আছে তাহার মধ্যে।

বসন্ত ছুতানাতা করিয়া অভিমান করে, কাঁদে।

নিতাই হাসিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দেয়। বলে—তুমি কাঁদলে আমি বেথা পাই বসন।

তারপর গুন গুন করিয়া গান ধরে—

"তোমার চোখে জল দেখিলে সারা ভোবন আঁধার দেখি।
তুমি আমার 'জেবনাধিক' জেনেও তুমি জান নাকি?"

বসন্ত এবার খুশী হয়। তাহার মুখে হাসি ফোটে। নিজেই চোখ মুছিয়া সে বলে—হ্যাঁ, কোকিল বটে আমার! বাহারের গান হয়েছে। শেষ কর। নিকে রাখ।

এক-একদিন—এই সেদিন—নিতাই যে গান গাহিল, সে গান শুনিয়া বসন্তর কান্না দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

নিতাইয়ের মনে পড়িয়া গেল বসন্তর সেই প্রথম রূপ। বসন্তর চোখে সে

কি প্রখর চাহনি! আর সেই বসন্ত আজ কাঁদিতেছে!

নিতাই হাসিয়া গান ধরিয়া দিল—

"সে আগুন তোমার গে-লো কোথা শুধাই তোমারে?
ও তোমার নয়নকোণে আগুন ছিল জ্বলত ধিকি ধিকি হে,
আয়নাতে মুখ দেখতে গিয়ে—দেখো নি কি সখি হে?
ও হায়—সে আগুন আজ জল হ'ল কি পুড়াইয়ে আ-মারে?
শুধাই তোমারে!"

গান শুনিয়া বসন্তর কান্না দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া বসন্ত তবে ক্ষান্ত হইল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই কিন্তু বলিল—গানটি শেষ কর, আমি শিখে তবে উঠব। তারপর বলিল—তোমাকে চড় মেরেছিলাম, সে কথা তুমি ভোল নাই তা হ'লে?

নিতাই বলিল—ভগবানের দিব্যি বসন—

বাধা দিয়া বসন্ত বলিল—না না। আমি ঠাট্টা করছিলাম। আবার হাসিয়া বলিল—এই তো, তুমিও তো ঠাট্টা বুঝতে নার।

বসন্তও তাহাকে অনেক শিখাইয়াছে। পদাবলীর সঙ্গে সে তাহাকে টপ্পাগান শিখাইয়াছে। টপ্পাগান নিতাইয়ের বড় ভাল লাগে। এই তো গান! পদাবলীর 'পিরীতি' এক, আর টপ্পার ভালবাসা অন্য জিনিস—একেবারে খাঁটি ঘরোয়া পিরীতি। টপ্পার সঙ্গে নিধুবাবুর নামও সে জানিয়াছে। বসন্তই বলিয়া দিয়াছে। মনে মনে সে নিধুবাবুকে হাজার বলিহারি দেয়। এই না হইলে গান!

"তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে!"

কিংবা—

"ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসি নে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানি নে।"

আহা হা ! এ যেন মিছরীর পানা। নিতাই মিছরীর পানার সহিত তুলনা দেয়। নিতাইয়ের সাধ, সে এমনই গান বাঁধিবে—সে মরিয়া যাইবে, নূতন কবিয়াল নূতন ছোকরারা তাহার গান গাহিবে আর বলিবে—বাহবা ! বাহবা ! বাহবা ! অহরহই তাহার মনে গানের কলি গুন গুন করে।

মধ্যে মধ্যে নিতাই কেমন উদাসীন হইয়া উঠে।

গ্রামপথে চলিবার সময় দ্বিপ্রহরে—দূরে পথের বাঁকে—রোদের ছটায় ঝকমক করিয়া উঠে স্বর্ণবিন্দুর মত একটি বিন্দু বাংলা দেশে পল্লীগ্রামে—এই সময়টা জলখাবারের সময়, গরু খুলিবার বেলা, এই সময়েই কৃষকবধূরা মাঠে যায় পুরুষের জলখাবার লইয়া, গৃহস্থঘরে দুধের জোগান দিবার সময়ও এই। মাঠের পথে—গ্রামের পথে—ঘটি মাথায় লইয়া কৃষকবধূরা যায় ; দূর হইতে রৌদ্রছটাপ্রতিবিম্বিত ঝকমকে বিন্দুটি দেখিলেই নিতাইয়ের মন উদাস হইয়া উঠে।

তাহার মনে পড়ে কাশফুলের মাথায় সোনার টোপর। ঠাকুরঝিকে মনে পড়ে। এসব তাহার কিছুই আর ভাল লাগে না। ইচ্ছা হয়—সে আজই ফিরিয়া যায় সেই গ্রামে। কৃষ্ণচূড়ার তলাটিতে বসিয়া রেললাইনের বাঁকের দিকে তাকাইয়া থাকে। মনে পড়িয়া যায় পুরানো বাঁধা গান—"চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে ব'লে কে দেখে না চাঁদ !"

পরক্ষণেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—নাঃ। চাঁদ, তুমি আকাশে থাক। ঠাকুরঝি তুমি সুখে থাক। সংসার তোমার সুখের হোক।

আর ফিরিয়া যাইবারই বা তাহার সময় কই ? পাঁচদিন আবার আসর বসিবে, এবার আর ঝুমুরদলের কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা নয়। আসল কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা। তারণ কবিয়াল, মহাদেব কবিয়াল, নোটন কবিয়ালের মত দস্তুরমত কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা হইবে। একটা মেলার আসরে কবিয়াল

হিসাবে পাল্লা দিবার জন্য তাহাকেই শুধু বায়না করিতে আসিয়াছিল। ঝুমুর-দলের সঙ্গে কোন সংস্রবই নাই। তবু সে বলিয়াছে—উহারা ভিন্ন তাহার দোহারের কাজ কেহ করিতে পারিবে না। সুতরাং উহারাও যাইবে।

এ বায়নার পর দল চলিবে ধুলিয়ান অঞ্চলের দিকে। সে চলিয়া গেলে কি করিয়া চলিবে? দলটা কানা হইয়া যাইবে যে। সে যে তাহারই বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। তা ছাড়া—বসন্ত আছে। বসন্তকে সে কথা দিয়াছে। সে যতদিন বাঁচিয়া আছে ততদিন সে তো তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। মনে পড়ে গাঁটছড়া বাঁধার কথা। কথা আছে—যে কেহ একজন মরিলে তবে এ গাঁটছড়া খুলিয়া লইবে অপর জন। ভাবিতে ভাবিতেও সে শিহরিয়া উঠে। বসন্তের মৃত্যুকামনা করিতেছে সে? না না। ঠাকুরঝি, তুমি দূরেই থাক—সুখেই থাক—তোমার সঙ্গে দেখা হয়তো হইবে না। সে বসন্তের কালো-কোকিল—যেখানে বসন্ত সেইখানে ছাড়া অন্য কোথাও যাইতে পাবে না সে। বসন্ত বাঁচিয়া থাক—সে সুস্থ হইয়া উঠুক—বসন্তকে লইয়াই এ জীবনটা সে কাটাইয়া দিবে। এই তো কয়দিনের জীবন! কয়টা দিন। ইহার মধ্যে—বসন্তকে ভালবাসিয়াই কি শেষ করিতে পারিবে যে, ইহার পর আবার ঠাকুরঝিকে ভালবাসিবে? এমনি করিয়াই তো একদিন ঠাকুরঝিকে ছাড়িয়া—তাহাকে ভালবাসার লীলাটা অসমাপ্ত রাখিয়া—চলিয়া আসিয়া বসন্তকে পাইয়াছে, তাহাকে ভালবাসিতে সুরু করিয়াছে। আবার বসন্তকে ছাড়িয়া ঠাকুরঝির কাছে? না। এই ভাল।

তবুও তাহার ভাল লাগে না। সে দল হইতে বাহির হইয়া গিয়া মাঠে বসিয়া থাকে। কখনও আপনিই এক সময় চকিত হইয়া উঠিয়া ফিরিয়া আসে, কখনও বা দল হইতে কেহ যায়, ডাকিয়া আনে।

বসন্ত বলে—এই দেখ, এইবার তুমি ক্ষেপে যাবা।

নিতাই নিবিষ্টচিত্ততার মধ্যেই হাসে—কেনে? কি হ'ল?

—সকাল থেকে মাঠে মাঠে ঘুরে এলে। খেতে-দেতে হবে না?

—ভারি ভাল কলি মনে এসেছে বসন। শোন—

—না, এখন খাও দিকিনি।

—না। আগে শোন। বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে সুর ভাঁজিয়া আরম্ভ করে—

"এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
হায়, জীবন এত ছোট কেনে?"

মুহূর্ত্তে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বসন্ত স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এক মুহূর্ত্তে যেন পাথর হইয়া গেল।

নিতাই সচকিত হইয়া প্রশ্ন করিল—বসন! কি হ'ল বসন? বসন!

দুই চোখের কোণ হইতে দুটি জলের ধারা গড়াইয়া পড়িল বসন্তের। সে বলিল—এ গান তুমি কেনে লিখলে কবিয়াল?

—কেনে বসন?

—আমি তো এখন ভাল আছি কবিয়াল—তবে তুমি কেনে লিখলে, কেনে তোমার মনে হ'ল জীবন এত ছোট কেনে?

সত্যই বসন এখন ভাল আছে। অনেক ভাল আছে। দেহের প্রতি যত্ন এখন তাহার অপরিসীম। মদ এখন সে খুব কম খায়। দূর্ব্বাঘাসের রস আগে নিয়মিত খাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। এখন নিয়মিত সকালে উঠিয়াই দূর্ব্বাঘাসের রসটি খাইয়া তবে অন্য কাজে সে হাত দেয়। স্বাস্থ্যও তাহার এখন ভাল হইয়াছে। শীর্ণ রুক্ষ মুখখানি অনেকটা নিটোল হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, রুক্ষ দীপ্ত গৌরবর্ণে একটু শ্যাম আভাস দেখা দিয়াছে। কথার ধার আছে, জ্বালা নাই। এখন আর সে তেমন তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে খিলখিল করিয়া হাসে না। মুচকিয়া মৃদু-হাসি হাসে।

ললিতা নির্ম্মলা ঠাট্টার আর বাকি রাখে না। বসন্ত যখন নিতাইয়ের কোন কাজ করে তখন ললিতা নির্ম্মলাকে অথবা নির্ম্মলা ললিতাকে একটি কথা বলে—'হায়—সখি,—অবশেষে!' অর্থাৎ যে পিরীতিকে এককালে বসন্ত মুখ বাঁকাইয়া ঘৃণা করিত, সে পিরীতিতেই পড়িল অবশেষে!

বসন্ত রাগে না, মুচকি হাসিয়া শুধু বলে—মরণ!

প্রৌঢ়াও হাসে। মধ্যে মধ্যে সেও দুই চারিটা রহস্য করিয়া থাকে।

—বসন, ফুল তবে ফুটল। কোকিল নাম পাল্টে ওস্তাদের নাম দে বসন ভোমরা। . কোকিলও কালো, ভোমরাও কালো।

বসন্ত হাসে।

শুধু একটা সময়, বসন্ত—পুরানো বসন্ত। সেটা সন্ধ্যাব পর। সন্ধ্যাব পর হইতেই সে উগ্র হইয়া উঠে। দেহের বেসাতির সময় এটা। সন্ধ্যাব অন্ধকার হইলেই ক্রেতাদেব আনাগোনা সুরু হয। মেয়েরা গা ধুইয়া প্রসাধন কবিযা বসিয়া থাকে। তিনজনে তখন তাহারা বসে একটি জায়গায়। অথবা আপন-আপন ঘরের সম্মুখে পিঁড়ি পাতিয়া বসে—মোট কথা এই সময়ের আলাপ-রঙ্গরহস্য সবই তাহাদেব পরস্পরেব মধ্যে আবদ্ধ। পুরুষদের সঙ্গে ভাবটা যেন ছাড়া-ছাড়া। ইঙ্গিতময ভাষায অশ্লীল ভাবেব রঙ্গরহস্য চলে নিজেদেব মধ্যে।

নির্ম্মলা মৃদুস্বরে ডাকে—নি-ব, নি-স, নি-ন্ত। অর্থাৎ নি শব্দটাকে যোগ করিয়া সে ডাকে—বসন্ত!

বসন্ত উত্তর দেয—নি-কি? মানে—কি?

ওই নি শব্দটাকে যোগ কবিযা তারপর চলে অশ্লীল রহস্য। কোন এক দিনের ব্যভিচার-বিলাসেব গল্প। সকলেই তাহারা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। যেন সম্মুখের দেহব্যবসাযের আসরেব জন্য মনটাকে তাহারা শানাইয়া লয। এই কাজ হইতে তাহাদের নিষ্কৃতি নাই। একদিকে মাসী দেয় না, অন্যদিকে চিরজীবনের অভ্যাস—সেও দেয না। উপায নাই।

পুরুষেরা এ সময়ে স্বতন্ত্র আসন পাতে। তাহাদেরও যেন সামযিকভাবে মেয়েগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়া যায। নিতান্ত নির্লিপ্তের মত তাহারা বসিয়া থাকে।

নিতাই একটা নিরালা জায়গা বাছিয়া বসে, আপনার লণ্ঠনটি জ্বালিয়া দপ্তব খোলে, লেখে, পড়ে। বসন্তর ঘরে আগন্তুকদের মত্ত কণ্ঠের সাড়া জাগে—

নিতাই রামায়ণ পড়ে। কৃষ্ণলীলা পড়ে। গানও রচনা করে—

"আর কতকাল মাকাল ফলে ভুল্‌বি আমার মন ?"

অথবা—

"আমার কর্ম্মফল
দয়া ক'রে ঘুচাও হরি—জনম কর সফল।"

কখনও সে বসিয়া ভাবে। ভাবে, বড় বড় কবিয়ালদের কথা—যাহারা সত্যকারের কবিয়াল। ঝুমুরের আসরে যাহারা গান গায় না। তেমন বায়না ইদানীং তাহার ভাগ্যেও দুই-একটা করিয়া জুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইবার তাহার এ দল হইতে বাহির হইয়া পড়া উচিত। এক বাধা বসন্ত। বসন্ত যে রাজী হয় না। সে সবই বুঝিতে পারে। তবুও সে এ দল ছাড়িয়া যাইতে পারে না। আশ্চর্য্য। সে আপন মনেই একটু হাসে।

—কি রকম ? হাসছ যে আপন মনে !

নিতাই চাহিয়া দেখে—বেহালাদার তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিতেছে। সে বসিয়াছে অল্প দূরে। বেহালাদার বসিয়া আপনার বেহালাখানিকে লইয়া পড়ে। সুর বাঁধে। সে সুর-বাঁধা যেন তাহার ফুরায় না। সুর বাঁধিয়া একবার ছড়ি টানিয়াই আবার তার-বাঁধা কানটায় মোচড় দেয়। তার কাটিয়া যায়। বেহালাদার নূতন তার পরাইতে বসে। ছড়িতে রজন ঘষে। বেহালা-খানাকে ঝাড়ে। মাঝে মাঝে বার্নিশের শিশি হইতে বার্নিশ লইয়া বার্নিশ মাখায়।

নির্ম্মলার ঘরে কলরব উঠে।

বেহালাদার বেহালায় ছড়ি চালায়। রাত্রি একটু গভীর না হইলে—বাজনা তাহার ভাল জমে না। বারোটা পার হইলেই তাহার যেন হাত খুলিয়া যায়। একটা অদ্ভুত বাজনা সে বাজায়। বেহালাদারের সেই আড়ৎ বাজে না—লম্বা টানা সুর। সুরটা কাঁপে। মধ্যে মধ্যে এমন বিষম কোমলের ধাপে খাদে নামিয়া আসে যে, শরীর সত্যই ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া উঠে। মনে হয় যেন সমস্ত নিঝুম হইয়া

গিয়াছে, চারিদিক যেন হিম হইযা গেল। যে শোনে তাহার নিজের শরীরের হাতপায়ের প্রান্তভাগও যেন ঠাণ্ডা হইযা গিযাছে মনে হয। অসাড হইযা যায সব চিন্তা ভাবনা।

দোহারটা তর্ক করে বাজনাদারেব সঙ্গে।

বাজনাদারটার উপরে কোন কিছুরই ছাযা পডে না। তাহার কেহ ভাল-বাসার জন নাই। সে চোর, ভালবাসিলেই ভালবাসার জনেব টাকাপযসা সে চুরি করে। সে হা-হা করিযা হাসে—বাজনা বাজায। দোহারটার তর্কের জবাব দেয। মধ্যে মধ্যে গিয়া মদ খাইযা আসে। বেহালাদারের জন্য মদ লইযা আসে। তারপর ঘুম পাইলেই বিছানা পাড়িযা শুইযা পড়ে।

দোহারটি এখন ললিতার ঘরে গিয়া ললিতার সঙ্গে ঝগডা বাধাইবার চেষ্টা করে।

মহিষের মত লোকটা ধুনির সম্মুখে বসিয়া থাকে। প্রৌঢা ঘরগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বসিযা সুপারি কাটে। লোকজন আসিলে মেযেদেব ডাকিযা দেখায, দরদস্তুর করে, টাকা আদায করে! গোপনে মদ বিক্রী করে। প্রৌঢাব এই সময়ের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। গম্ভীর, কথা খুব কম কয, চোখেব ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া ভ্রূকুটি উদ্যত করিযাই থাকে; দলের প্রত্যেকটি লোক সন্ত্রস্ত হয়। বসন্ত উগ্র হইযা ঝগডা করে, বসন্তকে সে প্রায ধমক দেয।

—এই বসন! ও কি হচ্ছে? ঝগডা করছিস কেনে?

—বেশ করছি। আমি মদ খাব না।

—এক-আধটু খেতে হবে বৈকি। তা না হ'লে হবে কেনে? নোকে আসবে কেনে?

—না আসে, না-ই এল। আমার ঘরে লোক এসে দবকার নাই।

—দরকার নাই!

—না!

—বেশ, কাল সকালে তুমি ঘর চলে যেযো। আমার এখানে ঠাঁই হবে না।

শুধু বসন্তই নয়, নির্ম্মলা ললিতাও মধ্যে মধ্যে ক্লান্ত হইয়া হাঁপাইয়া পড়ে। তাহারাও বলে—দরকার নাই, আর পারি না। মাসী কিন্তু অনড়। তাহার সেই এক উত্তর—তাহ'লে বাছা আমার এখানে ঠাঁই হবে না। পথ দেখ।

সকলকেই চুপ করিতে হয়, বসন্তকেও হয়। আশ্চর্য্যের কথা, আবার দশ-পনেরো দিন ব্যবসায় মন্দা ও মন্থর হইয়া উঠিলে তাহারাই চিন্তিত হইয়া পড়ে। আপনাদের মধ্যেই আলোচনা হয়।

—আর ভাই রোজগার নাই—কিছু নাই; ভাল লাগছে না মাইরি।

—ললিতে।

—কি ?

—এ কেমন জায়গা বল তো ?

—কে জানে ভাই। পাঁচটা টাকা রেখেছিলাম—নাকছাবি গড়াব ব'লে চার টাকা তার খরচ হয়ে গেল। বসন।

বসন চুপ করিয়াই থাকে। তাহার দেহ মন দুই-ই ক্লান্ত। নির্ম্মলা ললিতা আবার ডাকে!—কি লো চুপ করে রয়েছিস যে। তারপর বলে—তোর ভাই অনেক টাকা।

কোন দিন ইহার উত্তরে বসন ফোঁস করিয়া উঠে; ঝগড়া বাধিয়া যায়। কোন দিন বিষণ্ণ-হাসি হাসিয়া উঠিয়া যায়। মেয়েটার মতিগতি কখনও অস্থির কখনও শান্ত, বুঝিয়া ওঠা যায় না। ঝগড়া বাধিলে নিতাইকে আসিয়া থামাইতে হয়। বসনকে ঘরে লইয়া গিয়া বুঝাইয়া শান্ত করে। শান্ত হইলে প্রশ্ন করে—কেন এমন কর বসন ?

বসন বলে—জানি না।

খুব বেশী মন্দা পড়িলে—মাসী নূতন পথ ধরে। তাহাদের ডাকিয়া বলে—আজ সাজগোজ কর দেখি ভাল ক'রে। গাঁয়ের বাজারে বেড়াতে যাব।

অর্থাৎ মেয়েগুলিকে বাজারের পথে পথে দেখাইয়া ঘুরাইয়া আনিবে।

মেয়েরা উৎসাহিত হইয়া সাবান লইয়া পুকুরঘাটে যায়। স্নো, সিঁদুর,

পাউডার, টিপ লইয়া সাজিতে বসে। হাঙ্গামা হয় বসনকে লইয়া। সে কোনদিন যাইতে চায়—কোনদিন চায় না। মাসী ইহার ওষুধ জানে। সে আগে হইতেই বসনকে খানিকটা মদ খাওয়াইয়া রাখে। অবশ্য মদ খাওয়াইবার জন্য অনেক ছলনা করিতে হয়, ভুলাইতে হয়।

প্রৌঢ়া—ধোয়া ধপ্‌ধপে কাপড় পরিয়া—গালে পান পুরিয়া তাহাদের লইয়া বাহির হয়।

এই দেহের বেসাতির উপার্জ্জনেও ওই প্রৌঢ়ার স্বার্থ আছে। এই উপার্জ্জনই তিন ভাগ হইবে। দুই ভাগ পাইবে উপার্জ্জনকারিণী মেয়েটি, এক ভাগ পাইবে ওই প্রৌঢ়া—এই নিয়ম। গানের আসরের উপার্জ্জনও এমনি ভাগ করিয়া বিলি হয়। আসরের উপার্জ্জন হয় আট ভাগ—আট ভাগ হইতে—এক ভাগ হিসাবে—মেয়ে তিনটি পায় তিন ভাগ—এক ভাগ প্রৌঢ়ার—দুই ভাগ কবিয়ালের, এক ভাগ বেহালাদারের—এক ভাগ আধ ভাগ হিসাবে দোহার ও বাজনদার পায়। উপার্জ্জন যে লোক হইতে হইবে না—প্রৌঢ়া তাহাকে দলে রাখিবে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে উপার্জ্জনের পথগুলির দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। ক্ষীণতম সাড়ায় সে মিষ্টিমুখে সরস বাক্যে সাদর আহ্বান করে—কে গো বাবা? এস, এগিয়ে এস। লজ্জা কি ধন? ভয় কি? এস এস। আগন্তুক আগাইয়া আসিলে সে একটা মোড়া পাতিয়া বসিতে দেয়, পান দিয়া সম্মান করে, তারপর মেয়েদের ডাকে—ওলো বসন, নির্ম্মলা ইদিকে আয়। বলি ললিতে, ক'ভরি সোনা পরেছিস কানে লো?

এমনি একদিন। মাসী তাহাকে ডাকিল—বসন। শোন—তোকে ডাকছে লো, বলে তোকে চেনে।

বসন্ত সেদিন বলিল—আমার গা কেমন করছে মাসী! শরীর ভাল নাই।

—শরীরে আবার কি হ'ল তোর? কিছু হয় নাই। শোন ইদিকে। একটু মদ খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে শরীর। শোন, ইদিকে আয়।

কবি

আহ্বান—আদেশ। উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। বসন্ত বাহির হইয়া আসিল। পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, গায়ে সুগন্ধি মাখিয়া একটি রীতিমত ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিল। মাসী বলিল—দেখি, তোর গা দেখি।...ওমা। গা যে দিব্যি—আমার গা তোর চেয়ে গরম! ওগো বাবা, মেয়ের আমার শরীর খারাপ একটু মদ খাওয়াতে হবে। সহসা কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া হাসিয়া বলিল—আমার কাছেই আছে।

রূপোপজীবিনী নারীর আজীবনের বহু ভোগের নেশা। সুরুচিসম্পন্ন বেশভূষা, সুশ্রী লোকটিকে দেখিয়া তাহার মনে অভ্যাসের নেশা জাগিয়া উঠিল। কটাক্ষ হানিয়া মুচকি হাসিয়া বসন্ত তাহাকে হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল।

মাসীও হাসিল। সে তো জানে, বিষ একবার ঢুকিলে—প্রেমের অমৃত সমুদ্রেও তাহাকে শোধন করা যায় না। বসন্তের শরীর ভাল হইয়া গিয়াছে।

লোকটা চলিয়া গেলে বসন্তেরও নেশা ছুটিয়া যায়। মদের নেশার প্রতিক্রিয়ার মতই একটা প্রতিক্রিয়া জাগিয়া ওঠে। নেশার ভান করিয়া সে পড়িয়া রহিল, কাঁদিল। এমন ক্ষেত্রে সে কল্পনা করে, কালই সে নিতাইকে লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইবে। আজও করিল। কিন্তু যাওয়া সহজ কথা নয়, কোথায় যাইবে? ওই মাসী—ওই নির্ম্মলা—ওই ললিতা ছাড়া—কে কোথায় আপন জন আছে তাহার?

দিন সাতেক পর।

বসন্ত থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া মাসীকে বলিল—মাসী!

বসন্তর কণ্ঠস্বরে মাসী চমকিয়া উঠিল। এ যে দীর্ঘকাল পরে পুরানো বসন্তর কণ্ঠস্বর!—কি, বসন?

কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বসন্ত—সেই পুরানো বসন্ত বলিল—ওষুদ, মাসী। আমার ব্যামো হয়েছে!

—ব্যামো? কাসি?

—না না না। বসন্তর চোখে ছুরির ধার খেলিতেছিল—সে দৃষ্টির দিকে

চাহিয়াই প্রৌঢ়া নিজের ভুল বুঝিল,—সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া আশ্বাস দিয়া মাসী বলিল—তার জন্যে ভয় কি? আজই তৈরি করে দোব। তিন দিনে ভাল হয়ে যাবে, মাছটা খাস না।

ইহাদের জীবনের এই একটা অধ্যায়। এ অধ্যায় অনিবার্য্য, আসিবেই। মানুষের জীবনে কোন্ কালে কেমন করিয়া এ ব্যাধির উদ্ভব হইয়াছিল—সে তত্ত্ব বিশেষজ্ঞের গবেষণার বিষয়। ইহাদের জীবনে এ ব্যাধি অনিবার্য্য। শুধু অনিবার্য্যই নয়, এই ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হইয়াও বাকী জীবনটা কাটায়; মানুষের মধ্যে ছড়াইতে ছড়াইতে পথ চলে। ডাক্তার কবিরাজ দেখায় না। নিজেরাই চিকিৎসা করে। ইহাদের মধ্যে ওই চিকিৎসাবিদ্যাটি নাচগানের ধারার মত চলিয়া আসিতেছে। চিকিৎসা অর্থে—ব্যাধিটা বাহ্যিক অন্তর্হিত হয়, কিন্তু রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ফেরে। ফলে ভাবী জীবনে অকস্মাৎ কোন একটা ব্যাধি আসিয়া হতভাগিনীদের জীবনটাকে পথের ধূলার উপর আছাড় মারিয়া অর্দ্ধমৃত করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সে সব কথা ইহারা ভাবে না। এইটাই যে সে-সব ব্যাধির হেতু তাহাও তাহারা বুঝে না। শুধু ব্যাধি হইলে তাহারা সাময়িক ভাবে আকুল হইয়া উঠে।

বসন্তও আকুল হইয়া মাসীর কাছে আসিয়া পড়িল। মাসী রোগের চিকিৎসা জানে।

সংবাদটায় ইহাদের মধ্যে লজ্জার কিছুই নাই। শুধু ছোঁয়াচ বাঁচাইবার জন্য সাবধান হয়, রোগগ্রস্তার গামছা কাপড়ের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলে; তাহারই মধ্যে খানিকটা ঘৃণার বা অস্পৃশ্যতা-দোষের আভাস ফুটিয়া উঠে।

গামছা-কাপড় সাবধান করিয়া নির্ম্মলা ললিতা আসিল।

বসন্ত কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

নির্ম্মলা পাশে বসিয়া বলিল—চুল বাঁধা রাখতে নাই। খুলে দি আয়।

নিতাই, গত রাত্রের কয়েকটা উচ্ছিষ্ট পাত্র ছিল, লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল।

বসন্ত নির্ম্মলাকে বলিল—বারণ কর। সে আজ নিতাইয়ের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিতেছে না।

নির্ম্মলা বলিল—দাদা—দাদা—

নিতাই হাসিয়া বলিল—কেনে ব্যস্ত হচ্ছ বসন? কিছু ভয় ক'রো না তুমি। আমার কিছু হবে না।

নির্ম্মলা অবাক হইয়া গেল।

তিন দিনের স্থলে নয়দিন কাটিয়া গেল। বসন্ত বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল। সর্ব্বাঙ্গ তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকে ভরিয়া গিয়াছে, দেহে কে যেন [illegible] ঢালিয়া দিয়াছে। গভীর রাত্রে আলো জ্বালিয়া শিয়রে বসিয়া নিতাই বাতাস করিতেছিল। এমন ক্ষেত্রে রুগ্ন মেয়েগুলির দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। ভালবাসার পাত্র পুরুষেরা তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করে, কেহ কেহ হয়তো দল ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। রোগগ্রস্তা একা পড়িয়া থাকে। যেটুকু সেবা যেটুকু যত্ন জোটে, সেটুকু করে ওই দলের মেয়েরাই। নিতাই কিন্তু বসন্তর শিয়রে বসিয়া আছে—প্রশান্ত হাসিমুখে।

বাহিরে রাত্রি নিঃশব্দ গতিতে প্রথম প্রহর পার হইয়া দ্বিতীয় প্রহরের সমীপবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। অকস্মাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠিল একটি সুর। জাগিয়া বসিয়াই নিতাই মধ্যে মধ্যে ঢুলিতেছিল। সুরের সাড়ায় সে জাগিয়া উঠিল। একটু না হাসিয়া সে পারিল না। খেয়ালী বেহালাদার বেহালা বাজাইতেছে। আজ নির্ম্মলার ঘরে বীভৎস উৎসবের আসর বসিয়াছে। বেহালাদারের আজ খেয়াল জাগিবার কথা বটে। সন্ধ্যা হইতেই সে আজ এই সুর শুনিবার প্রত্যাশাও করিয়াছিল। বড় মিঠা হাত কিন্তু। অদ্ভুত সুর! বেহাগের আমেজ আছে। শুনিলেই মনে হয়, গভীর গাঢ় অন্ধকার রাত্রে সব যেন হারাইয়া গেল।

—আঃ ছি! ছি! ছি!—বসন্ত জাগিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল।

চকিত হইয়া নিতাই বলিল—কি বসন? কি হচ্ছে?

—আঃ। বারণ কর গো। বাজাতে বারণ কর।

—ভাল লাগছে না ?

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসন্ত বলিল—নাঃ, নাঃ। আমার হাত-পা যেন হিম হয়ে আসছে।

ছড়ির টানে একটি দীর্ঘ করুণ সুর কাঁপিযা কাঁপিয়া ওই রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে যেন মিশিয়া এক হইযা যাইতেছে।

আঠারো

মাসখানেক পর বসন্ত রোগশয্যা হইতে কোনরূপে উঠিয়া বসিল। তখন বসন্তকে আর সে বসন্ত বলিযা চেনা যায় না। ঘৃণিত কুৎসিত ব্যাধি তাহার প্রায় সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইযা গিয়াছে। বিষাক্ত জিহ্বার হিংস্র লেহনে উজ্জ্বল গৌরী বসন্তের অনুপম দেহবর্ণ যেন মুছিযা গিয়াছে। তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় —সর্ব্বাঙ্গে কে মাখাইয়া দিয়াছে অঙ্গারের গুঁড়া। মাথার সে চিকণ কালো দীর্ঘ চুলের রাশি হইয়া উঠিয়াছে কর্কশ পিঙ্গলাভ। শুধু বর্ণই নয—তাহার দেহের গন্ধ রস সবই গিযাছে। তাহার দেহে একটা উৎকট গন্ধ, রস-নিটোল কোমল দেহ কঙ্কালসার। বসন্তের গরব-করা রূপসম্পদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু ডাগর দুইটি চোখ ; শীর্ণ শুষ্ক মুখে চোখ দুইটা যেন আরও ডাগর হইয়া উঠিয়াছে। স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া সে বসিয়া থাকে। চোখ দুইটা জল্‌জল্‌ করিয়া জলে—ভস্মরাশির মধ্যে দুই টুকরা জলন্ত কয়লার মত।

সেদিন মাসী বলিল—বসন, বেশ ভাল ক'রে 'ত্যালে হলুদে' মেখে চান কর আজ।

বসন্ত নিষ্পলক চোখে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিযাছিল, সে কোন উত্তর দিল না, একটু নড়িল না, চোখের একটা পলক পর্য্যন্ত পড়িল না।

মাসী আবার বলিল—রোগের গন্ধ মরবে, কালচিটে খসখসে বদছিরি যাবে, শরীরে আরাম পাবি।

বসন্ত তবু তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

মাসী এবার তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে টানিয়া লইল—গায়ের কাপড় খুলিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিল; ললিতাকে ডাকিয়া বলিল—ললিতে, বাটিতে করে খানিক ত্যাল গরম করে দে তো মা। আর খানিক হলুদ। তারপর সে ডাকিল নিতাইকে—বাবা! বাবা কোথা গো?

নিতাই ঘরের মধ্যে বসন্তর রোগশয্যা পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত ছিল। বিছানা-পত্রগুলি বাহিরে আনিয়া রোদে ফেলিয়া দিয়া বলিল—আমাকে বলছ মাসী?

হাসিয়া প্রৌঢ়া বলিল—বাবা মানুষের একটাই গো, বাবা, সে আমার তুমি। ভাল বাবা তুমি, মেয়ে ডাকছে—বুঝতে লারছ?

হাসিয়া নিতাই বলিল—বল।

—বসনের চিরুনি আর তেলের শিশিটা দাও তো বাবা, মাথায় জট বেঁধেছে—আঁচড়ে দি।

বসন্ত এতক্ষণে কথা বলিল—বিছানার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—ওসব কি হবে?

ঘরের মধ্যে তেলের শিশি ও চিরুনির সন্ধানে যাইতে যাইতে নিতাই বলিল—কাচতে হবে।

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বসন্ত চীৎকার করিয়া উঠিল—না! বলিয়াই সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে কান্না তাহার আর থামে না।

নিতাই আশ্চর্য্য মানুষ! সে হাসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল—মাসী যা বলছে তাই শোন বসন। এ সব এখন তুমি ভেবো না।

বসন্ত কেবল কাঁদিয়াই চলিল।

নিতাই আবার বলিল—আমারও তো মানুষের শরীর! আমার রোগ হ'লে, তুমি সুদে-আসলে পুষিয়ে দিয়ো। আমি মহাজনের মত হিসেব ক'রে

শোধ নোব। না কি বল মাসী?

সে হাসিতে হাসিতে বিছানাগুলা লইয়া চলিয়া গেল।

ললিতা, নির্ম্মলা গালে হাত দিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। প্রৌঢ়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বসন আমাদের ভাগ্যিমানী।

রোগ-ক্লেদ-ভরা বিছানা-কাপড়—সমস্ত ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া নিতাই কাচিয়া পরিষ্কার করিল। ললিতা নির্ম্মলা—দেহোপজীবিনী—তাহাদের জীবনে প্রেম শরতের মেঘ, আসে চলিয়া যায়; যদি বা কোনটা কিছুদিন স্থায়ী হয়—তবে হেমন্তের শীতের বাতাসের মত দেহোপজীবিনীর দুর্দ্দশার আভাস আসিবামাত্র —সেও চলিয়া যায়। নির্ম্মলার এ ব্যাধি হইয়াছে—তিনবার, ললিতার হইয়াছে দুইবার। রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র তাহাদের ভালবাসার জন পলাইয়াছে। নির্ম্মলার একজন প্রেমিক আবার—রোগের সুযোগে—তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলাইয়াছিল। আজ নিতাইয়ের আচরণ দেখিয়া তাই তারা অবাক হইয়া গেল। শুধু নিজেদের নয়—তাহাদের সমব্যবসায়িনীদের জীবনেও এমন ঘটনা তাহারা দেখে নাই।

বিছানা-কাপড় পরিষ্কার করিয়া ফিরিয়া নিতাই দেখিল, বসন্ত তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে তাহার দিকে চাহিয়া খানিকটা আশ্বস্ত হইল। তেলহলুদ মাখিয়া স্নান করিয়া বসন্ত খানিকটা শ্রী ফিরিয়া পাইয়াছে: মাথার চুল আঁচড়াইয়া প্রৌঢ়া একটি এলোখোঁপা বাঁধিয়া দিয়াছে—কপালে একটি সিঁদুরের টিপও দিয়াছে।

রোগক্লিষ্টা হতশ্রী বসন্ত সুস্থ হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়াছে দেখিয়া নিতাই সত্যই খুশী হইল। বলিল—বাঃ, এই তো বেশ মানুষের মত হয়েছে।

বসন্ত হাসিল। তারপর ফেলিল একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস, নিতাইয়ের কথাগুলো যেন বসন্তর ওই হাসির ধারের মুখে কাটিয়া খান খান হইয়া গেল। তাহার সমস্ত আশ্বাস বসন্তর দীর্ঘনিঃশ্বাসে যেন ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া গেল।

বসন্তর হাসির মধ্যে যত বিদ্রূপ তত দুঃখ, নিতাই বিচলিত না হইয়া পারিল না।

আত্মসম্বরণ করিয়া নিতাই বলিল—আমি মিথ্যে বলি নাই বসন। তোমার রং ফিরেছে—দুর্ব্বল হোক, রোগা চেহারা গিয়েছে—বিশ্বাস না হয়, আয়নায় তুমি নিজে দেখ। সে আয়নাখানা পাড়িয়া বসন্তর সম্মুখে ধরিল।

মুহূর্ত্তে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

বসন্তর বড় বড় সাদা চোখের কোণ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরিয়া, শুষ্ক কালো বারুদের মত—তাহার দেহে যেন আগুন ধরাইয়া দিল—মুহূর্ত্তে বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র গতিতে নিতাইয়ের হাত হইতে আয়নাটা ছিনাইয়া লইয়া- পাগলের মত তাহার মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। কিন্তু দুর্ব্বল হাতের লক্ষ্য—আর নিতাইও মাথাটা খানিকটা সরাইয়া লইয়াছিল—তাই সে আঘাত হইতে বাঁচিয়া গেল। আয়নাটা ছুটিয়া গিয়া একটা বাঁশের খুঁটিতে লাগিয়া—তিন-চার টুকরা হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

নিতাই একটু হাসিল। সে কাচের টুকরা কয়টা কুড়াইতে আরম্ভ করিল। সেই মুহূর্ত্তেই একটি কঠিন কণ্ঠস্বর রণ রণ করিয়া বাজিয়া উঠিল।—বসন!

নিতাই মুখ তুলিয়া দেখিল, মাসী। গম্ভীর কঠোরস্বরে মাসী আবার বলিল—বসন!

বসন্ত তেমনি নীরব অচঞ্চল; চোখের দৃষ্টি তাহার স্থির নিষ্পলক।

—বলি, রোগ না হয় কার? তোর একার হয়েছে? জানিস—এই মানুষটা না থাকলে তোর হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতি হ'ত?

বসন্ত তবু উত্তর দিল না। আর মাসীর এ মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর করিবার শক্তি বা সাহস হইবার তাহার কথাও নয়। এ মাসী আলাদা মাসী। নিষ্ঠুর কঠোর শাসনপরায়ণা দলনেত্রী। মেয়েরা হইতে পুরুষ—এমন কি তাহার নিজের ভালবাসার জন—ওই মহিষের মত বিশালকায় ভীষণদর্শন লোকটা পর্য্যন্ত প্রৌঢ়ার এই মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে ভয় পায়।

নিতাইও এ স্বর—এ মূর্ত্তির সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া গেল, কাচ কুড়াইতে কুড়াইতে স্তব্ধ হইয়া মাসীর দিকে চাহিয়া রহিল।

মাসী আবার কঠোরতর স্বরে ডাকিল—বসন! কথার জবাব দিস না যে বড় ?

বসন্ত এবার দাঁড়াইল, নিষ্পলক চোখে স্থির দৃষ্টি মাসীর দিকে ফিরাইয়া চাহিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাই আসিয়া দাঁড়াইল—দুইজনের মাঝখানে। মাসীর চোখ দুইটা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে—রাত্রির অন্ধকারে বাঘিনীর চোখের মত। বসন্তর চোখে আগুন—তাহার চেতনা নাই—কিন্তু ভয়ও নাই—শুধু দাহিকাশক্তি লইয়া সে জ্বলিতেছে। নিতাই সবিনয়ে হাসিযাও দৃঢ় স্বরে বলিল—বাইরে যাও মাসী। ছি! রোগা মানুষ—

—রোগা মানুষ! রোগ সংসারে আর কারও হয় না? ওর একার হয়েছে? ঝাঁটা মেরে—

—ছি মাসী, ছি!

—ছি কেনে—ছি কেনে শুনি?

—রোগা মানুষ। তা ছাড়া তোমার কাছে অপরাধ তো কিছু করে নাই।

—আমার দলের নোকের ওপর করেছে। এতে আমার দল থাকবে কেনে? তুমি আমার দলের নোক কবিয়াল।

নিতাই শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে—একটু হাসিযাই বলিল—বসনের জন্যেই তোমার দলে আছি মাসী। নইলে—। একটু চুপ করিযা থাকিযা আবার বলিল—যাও, তুমি বাইরে যাও।

প্রৌঢ়া নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল। এ দলের প্রত্যেকটি লোক আপনার অজ্ঞাতসারেই প্রৌঢ়ার আনুগত্য স্বীকার করিযা লয। দলনেত্রী এ কথাটা ভাল করিয়াই জানে। দলের সর্ব্ববিষযে তাহার ব্যবস্থার অধিকার, প্রতিটি কপর্দ্দক তাহার হাত দিযা বিতরণের বিধি—তাহার আসন, তাহার সাজ-সরঞ্জামের আভিজাত্য, প্রত্যেক জনকে অধীন অনুগত করিয়া তোলে।

নিজের যৌবনে—তাহার দলনেত্রীর দলে সে নিজেও এমনই করিয়া আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছে; তাহার দলেও এতদিন পর্য্যন্ত সকলেই তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে; আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ ক্ষেত্রে তাহার দুর্দ্দান্ত রাগ হইবার কথা, সক্রোধে ওই ভীষণদর্শন লোকটাকে আহ্বান করাই উচিত। কিন্তু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দুইটার একটাও তাহার মনে হইল না। মনে হইল—এ লোকটি আনুগত্য স্বীকার করে নাই কোনদিন, এবং আজ সে তাহাকে যে লঙ্ঘন করিল তাহারও মধ্যে রূঢ় কিছু নাই, উদ্ধত কিছু নাই, নিতাই তাহার কোনমতেই অপমান করে নাই।

তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—আশীর্ব্বাদ করি বাবা, তুমি চিরজীবী হও। মাসী ছেড়ে আজ তোমার সঙ্গে মা-বেটা সম্বন্ধ পাতাতে ইচ্ছে করছে। তা হ'লে শেষকালটার জন্মে আর ভাবনা থাকে না।

নিতাই হাসিয়া বলিল—মা-মাসী তো সমান কথা গো! এখন ঘরে যাও, বউ-বেটার ঝগড়া মা-মাসীকে শুনতে নাই।

আর কোন কথা না বলিয়া সে এ অনুরোধ মানিয়া লইল, চলিয়া গেল।

নিতাই এবার বসন্তর দিকে ফিরিয়া বলিল—ছি! রে! শরীরে কি এত রাগ করে। রাগে শরীর খারাপ হয় বসন।

অকস্মাৎ বসন্ত সেই মাটির উপরেই উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

সস্নেহে নিতাই বলিল—আজ সকাল থেকে এমন করে কাঁদছ কেন বসন?

বসন্তর কান্না বাড়িয়া গেল; সে-কান্নার আবেগে শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

নিতাই তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল—কাল কলকাতায় ওষুদের দোকানে চিটি লিখেছি; সালসা আনতে দিয়েছি তিন শিশি। সালসা

খেলেই শরীর সেরে উঠবে, রক্ত পরিষ্কার হবে—সব ভাল হয়ে যাবে।

শ্বাসরোধী কান্নার আবেগে বসন্ত কাসিতে আরম্ভ করিল। কাসিয়া খানিকটা শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিয়া অবসাদে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। ধীরে ধীরে একটা আঙুল দিয়া কি যেন দেখাইয়া দিল।

— ক ?

এতক্ষণ পরে বসন্ত কথা বলিল—অদ্ভুত হাসিয়া বলিল—রক্ত।

—রক্ত ?

—সেই কাল রোগ! বসন্ত আবার হাসিল। এতক্ষণ ধরিয়া এই কথাটা বলিতে না পারিয়াই সে কাঁদিতেছিল। কথাটা বলিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কান্নাও তাহার শেষ হইয়াছে।

নিতাই স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—টকটকে রাঙা আভাস সুস্পষ্ট। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

বসন্ত বলিল—কেনে তুমি দলে এসেছিলে, তাই আমি ভাবছি; মরতে তো আমার ভয় ছিল না। কিন্তু আর যে মরতে মন চাইছে না। রোগক্লিষ্ট শীর্ণ মুখে মৃদু-হাসি মাখিয়া সে একদৃষ্টে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার কপালে মুখে হাত বুলাইয়া নিতাই বলিল—ভয় কি ? রোগ হ'লেই কি মরে বসন ? শরীর সারলেই—ও রোগও ভাল হয়ে যাবে।

আবার সেই বিচিত্র হাসি হাসিয়া বসন্ত নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল—না না না।

কিছুক্ষণ পরে মুখ ফুটিয়াই বলিল—আর বাঁচব না।

তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল—আমি জানতাম কবিয়াল। যেদিন সেই গান তোমার মনে এসেছে—সেই দিন জেনেছি আমি।

—কোন্ গান বসন ?

—জীবন এত ছোট ক্যানে—হায়!

ঝর ঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

নিতাইয়ের চোখেও এবার জল আসিল। সঙ্গে সঙ্গে অসমাপ্ত গানটা আবার মনে গুঞ্জন করিয়া উঠিল—

এই খেদ মোর মনে,
ভালবেসে মিটল না আশ পুরিল না এ জীবনে।
জীবন এত ছোট ক্যানে, হায়!

তারপর?

বসন্ত আবার বলিল—আমি জানতে পেরেছি। বেহালাদার রাত্রে বেহালা বাজায়. আগে কত ভাল লাগত। এখন ভয় লাগে। মনে হয়, আমার আশেপাশে দাঁড়িয়ে কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে! অতবড় মনে আমার মরণের ভাবনা! মনের কথা কি মিথ্যে হয়?

বসন্তের মনের কথা সত্যসত্যই সত্য, মিথ্যা নয়; দিন কয়েক পরেই সন্ধ্যার দিকে তাহার দেহের উত্তাপে স্পষ্ট জ্বর বুঝিতে পারা গেল। এই অবস্থাতেই স্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রার তাহাদের বিরাম ছিল না। সেদিন তাহারা একটা ছোটখাটো শহরে আসিয়া বাসা গাড়িয়াছিল। ঘর এবার খড়ের নয়, বাজারে জীর্ণ একটা মাটির বাড়ি তাহারা ভাড়া লইয়াছিল। নিতাই বলিল—ললিতাকে একবার ডাকি, তোমার কাছে বসুক। আমি একজন ডাক্তার ডেকে আনি।

—না। আকুল হইয়া বসন্ত বলিয়া উঠিল—না।

—এই আধ ঘণ্টা। আমি দণ্ডের মধ্যে ফিরে আসব।

—না—গো—না! যদি কাসি ওঠে? রক্ত যদি দেখতে পায়! তবে এই পথের মধ্যেই ফেলে আজই এখুনই পালাবে সব! যেযো না, তুমি যেযো না।

নিতাই অগত্যা বসিল। রক্ত উঠার কথা আজও সকলের কাছে লুকানো আছে।

জ্বরটা যেন আজ বেশী বেশী বাড়িতেছে। অন্য দিন রাত্রি প্রহর খানেক হইতেই খানিকটা ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়ে, বসন্ত অনেকটা সুস্থ হয়। আজ ঘামও

হয নাই—সে সুস্থও হইল না। মধ্যে মধ্যে জ্বরজর্জ্জর অসুস্থ বিহ্বল ব্যগ্র দৃষ্টি মেলিযা সে চারিপাশে খুঁজিযা নিতাইকে দেখিতেছিল—আবার চোখ বন্ধ করিযা এ-পাশ হইতে ও-পাশে ফিরিযা শুইতেছিল। অস্থিরতা আজ অতিরিক্ত।

নিতাই সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিযাছিল। তাই যতবার সে চোখ মেলিযা তাহাকে খুঁজিল, ততবার সে সাড়া দিযা বলিল—আমি আছি। এই যে আমি।

রাত্রির তখন শেষ প্রহর। নিতাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইযা দেওযালে ঠেস দিযা বসিযাই ঘুমাইযা পড়িয়াছিল।

রাত্রির শেষ প্রহর অদ্ভুত কাল। এই সময দিনের সঞ্চিত উত্তাপ নিঃশেষে ক্ষযিত হইযা একটা রহস্যময ঘন শীতলতা জাগিযা উঠে, সেই স্পর্শ ললাটে আসিযা লাগে, চেতনা যেন অভিভূত হইযা পড়ে। ধীরসঞ্চারিত নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দিয়া একটা হিমরহস্য সমস্ত সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিযা ফেলে, নিস্তরঙ্গ বাযুস্তর মধ্যে নিঃশব্দসঞ্চারিত ধূমপুঞ্জের মত। মাটির বুকের মধ্যে, গাছে-পাতায় থাকিযা যে অসংখ্য কোটি কীটপতঙ্গ অবিরাম ধ্বনি তুলিযা থাকে, তাহারা পর্য্যন্ত অভিভূত হইযা পড়ে, আচ্ছন্নের মত. এ সময কিছুক্ষণের জন্য তাহারাও স্তব্ধ হয। আকাশে জ্যোতির্লোক হয পাণ্ডুর ; সে লোকেও যেন হিম-তমসার স্পর্শ লাগে। কেবল অগ্নিকোণে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলে শুকতারা—অন্ধ রাত্রিদেবতার ললাটচক্ষুর মত। সকল ইন্দ্রিয আচ্ছন্ন-করা রহস্যময এই গভীর শীতলতার স্পর্শে নিতাই শত চেষ্টা সত্ত্বেও—জাগিযা থাকিতে পারে নাই। আচ্ছন্নের মত দেওযালের গাযে কখন ঢলিয়া পড়িযাছিল।

অকস্মাৎ সে জাগিযা উঠিল—বসন্তর আকর্ষণে। বসন্ত কখন উঠিযা বসিযাছে। দুই হাত দিযা তাহার গলা জড়াইযা ধরিযা সে ডাকিতেছে—ওগো! ওগো। আর্ত্তবিহ্বল তাহার কণ্ঠস্বর।

—কি বসন? কি? উঠে বসলে কেনে? শোও, শোও। বসন্তর হাত দুইটি হিমের মত ঠাণ্ডা ; পৃথিবীর বুক ব্যাপ্ত করিয়া যে হিমানীপ্রবাহ ভাসিযা উঠিয়াছে, সেই হিমানীপ্রবাহ যেন সরীসৃপের মত বসন্তের হাতের মধ্য দিযা

নিঃশব্দ সঞ্চারে সর্ব্বদেহে সঞ্চারিত হইতেছে। বসন্তর সর্ব্বাঙ্গে ঘাম।

—বারণ কর। বারণ কর।

—কি ?

—বেহালা। বেহালা বাজাতে বারণ কর গো।

—বেহালা ? কই ? নিতাই বেশ কান পাতিয়া শুনিল। কিন্তু রাত্রির স্তব্ধ শেষ প্রহরেও—তাহাদের দুই জনের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া—আর কোন ধ্বনি সে শুনিতে পাইল না।

—আঃ, শুনতে পাচ্ছ না ? ওই যে, ওই যে! কেবল বেহালা বাজছে, কেবল বেহালা বাজছে।

চাকতের মত একটা কথা নিতাইয়ের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

বসন্তর দেহের স্পর্শই তাহাকে সচেতন করিয়া দিল। তাহার মণিবন্ধ স্পর্শ করিয়া সকরুণ দৃষ্টিতে বসন্তর মুখের দিকে চাহিয়া নিতাই বলিল—গোবিন্দের নাম কর বসন।

—কেনে ? বসন্ত অস্থির ভাবে প্রশ্ন করিল—কেনে ?

কেন, সে কথা নিতাই কিছুতেই বলিতে পারিল না।

মৃত্যুকালীন অস্থিরতার মধ্যেও হঠাৎ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য শান্ত স্থির হইয়া বড় বড় চোখ আরও বড় করিয়া মেলিয়া বসন্ত প্রশ্ন করিল— 'মি মরছি ?

নিতাই ম্লান হাসিমুখে তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া এবার বলিল—ভগবানের নাম—গোবিন্দের নাম করলে কষ্ট কম হবে বসন।

—না। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত সজোরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বসন্ত বলিল—না। কি দিয়েছে ভগবান আমাকে ? স্বামীপুত্র ঘরসংসার কি দিয়েছে ? না।

নিতাই অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল। ভগবানের বিরুদ্ধে যে নালিশ বসন্ত করিল, সে নালিশের সব দাযদাবী, কি জানি কেন, তাহারই মাথার উপর চাপিয়া বসিয়াছে বলিয়া যেন অনুভব করিল।

বসন্ত আবার পাশ ফিরিয়া বলিল—গোবিন্দ, রাধানাথ, দয়া ক'রো। আসছে জন্মে দয়া ক'রো। তাহার বড় বড় চোখ দুইটা জলে ভরিয়া টলমল করিতেছিল, বর্ষার প্লাবনে ডুবিয়া-যাওয়া পদ্মের পাপড়ির মত। নিতাই সযত্নে আপনার খুঁটে সে জল মুছাইয়া দিয়া বলিল—বসন!

—না, আর ডেকো না। না! বলিতে বলিতেই সে আবার অধীর আক্ষেপে শূন্য বায়ুমণ্ডলে কিছু যেন আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য দুই হাত প্রসারিত করিয়া নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিল।

পরক্ষণেই সে নিতাইয়ের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া গেল

উনিশ

গঙ্গার তীরবর্ত্তী শহর। গঙ্গার তীরবর্ত্তী শ্মশানেই, নিতাই-ই বসন্তর সৎকার করিল। সাহায্য করিল দলের মেয়েরা। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, পুরুষেরা শব স্পর্শ পর্য্যন্ত করিল না। এ ক্ষেত্রে আপন আপন জাতি সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইয়া উঠিল। দোহার—ললিতার ভালবাসার মানুষ—সে মুখ ফুটিয়া বলিল—ওস্তাদ, যা করছে ওরাই করুক। করলে তো অনেক! আবার কেনে?

নিতাই হাসিল, প্রতিবাদ করিল না। তাহার কথা শুনিবার লক্ষণও দেখাইল না। তার্কিক দোহার ছাড়িল না, বলিল—হাসির কথা নয় ওস্তাদ। পরকালে—

বেহালাদারটি হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল—যাক ভাই, ও কথা যাক। বলিয়াই সে বেহালায় ছাড়র টান দিল।

চিতার উপর শবদেহ চাপাবার পূর্ব্বে প্রৌঢ়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ! বসন, আমার সোনার বসন! দুই ফোঁটা চোখের জলও তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। পাশেই বালুচরের উপর বসিয়া ছিল নির্ম্মলা ও

ললিতা। নিঃশব্দ কান্নায় তাহাদের চোখ হইতে শুধু জল ঝরিয়া পড়িতেছিল অনর্গল ধারায়।

নিতাই দেহটা চিতার উপর চাপাইবার উদ্যোগ করিল, প্রৌঢ়া বলিল—দাঁড়াও বাবা, দাঁড়াও। সে আসিয়া বসন্তর আভরণ খুলিতে বসিল। নিম্ন-শ্রেণীর দেহোপজীবিনীর কিই বা আভরণ। কানে দুইটা ফুল, নাকে একটা নাকছাবি, হাতে দুইগাছা শাঁখা বাঁধা, তাহার উপর বসন্তর গলায় ছিল একছড়া হালকা বিছাহার।

নিতাই হাসিল। বলিল—খুলে নিচ্ছ মাসী?

মাসী কেবল তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল, তারপর আপনার কাজে মন দিল। গহনাগুলি আঁচলে বাঁধিয়া সে বলিল—বুকের নিধি চলে যায় বাবা, মনে হয় দুনিয়া আঁধার, খাদ্য বিষ, আর কিছু ছোঁব না—কখনও কিছু খাব না। আবার এক বেলা যেতে না যেতে চোখ মেলে চাইতে হয়, উঠতে হয়, পোড়া পেটে দুটো দিতেও হয়, লোকের সঙ্গে চোখ জুড়তে হয়। বাঁচতেও হবে, খেতে পরতেও হবে—এগুলো চিতেয় দিয়ে ফল কি বল? বক্তব্য শেষ করিয়া হাসিয়া সে বলিল—এগুলি আমার পাওনা বাবা।

নিতাই আবার একটু হাসিল, হাসিয়া সে বসন্তর নিরাভরণ দেহখানি চিতায় চাপাইয়া দিল।

প্রৌঢ়া আবার বলিল, কপালে হাত দিয়া আক্ষেপ করিয়াই বলিল—আমার অদেষ্ট দেখ বাবা। আমিই হলাম ওয়ারিশান। প্রৌঢ়ার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ললিতা, নির্ম্মলা অদূরে সজল চোখে উদাস দৃষ্টিতে বসন্তর চিতার দিকে চাহিয়া ছিল। বসন্তর বিয়োগে বেদনা তাহাদের অকৃত্রিম, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতে তাহারা ভাবিতেছিল নিজেদের কথা। তাহাদেরও হয়তো এমনি করিয়া যাইতে হইবে, মাসী এমনি করিয়াই তাহাদের দেহ হইতে সোনার টুকরা কয়টা খুলিয়া লইবে। বহুভাগ্যে যদি বুড়া হইয়া বাঁচে, তবে ওই মাসীর

মতই তাহারাও দলের কর্ত্রী হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কল্পনা তাহাদের ততদুর গেল না, আশার চেয়ে নিরাশাই তাহাদের বড়। শুধু তাহাই নয়, নিরাশ পরিণাম কল্পনা করিতেই এই মুহূর্ত্তটিতে বড় ভাল লাগিতেছে। তাহারাও এমনি করিয়া মরিবে, মাসী বাঁচিয়া থাকিবে।

সংকার শেষ করিয়া ফিরিয়া নিতাই দেখিল, মহিষের মত লোকটা বসন্তর ঘরে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া আছে। বসন্তর জিনিসপত্রগুলি ইহারই মধ্যে এক জায়গায় স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়া গিয়াছে।

আবারও নিতাই একটু হাসিয়া ঘরের একপাশে একটা মাদুর বিছাইয়া চিতাগ্নির উত্তাপজর্জ্জর, পরিশ্রমক্লান্ত দেহ ছড়াইয়া দিল।

ভাবিতেছিল মরণের কথা।

মরণ কি? পুরাণে পড়া মরণের কথা তাহার মনে পড়িল। মানুষের আয়ু ফুরাইলে ধর্ম্মরাজ যম আদেশ দেন তাঁহার অনুচরগণকে, মানুষের আত্মাকে লইয়া আসিবার জন্য। ধর্ম্মরাজের অদৃশ্য অনুচরেরা আসিয়া মানুষের অঙ্গুলি-প্রমাণ আত্মাকে লইয়া যায়। ধর্ম্মরাজের বিচারালয়ে ধর্ম্মরাজ তাহার কর্ম্ম বিচার করেন, স্বর্গ অথবা নরকে তাহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বিভিন্ন কর্ম্মের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার—বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থাও সে পড়িয়াছে। নিতাইকেও একদিন সেখানে যাইতে হইবে। বসন্তর সঙ্গে তাহার কর্ম্মেরই বা পার্থক্য কোথায়? সুতরাং বসন্ত যেখানে গিয়াছে, সেখানেই সে যাইবে। অনন্ত নরকে হয়তো! সেদিন আবার তাহার সঙ্গে দেখা হইবে। কিন্তু আজ তাহাতে তাহার মন ভরিল না। তাহার কোলের উপরেই বসন্ত মরিয়া লুটাইয়া পড়িল, সে নিজহাতে তাহার দেহখানা পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিল। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আর বসন্তকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এই একটা কথাই বার বার মনে ঘুরিতেছে।

বসন্ত চলিয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না। সেই বসন্ত! ঝক্‌মকে ক্ষুরের মত মুখের হাসি, আগুনের শিখার মত তাপ,

তেমনি রঙ, তেমনি রূপ, বসন্তকালের কাঞ্চনগাছের মতই বসনের বেশভূষার বাহার। সেই বসন চলিয়া গেল! গায়ের গহনাগুলা প্রৌঢ়া টানিয়া খুলিয়া লইল, সে নিজে তাহার দেহখানা আগুনে তুলিয়া দিল, বসন একটা প্রতিবাদও করিল না। মরণ সত্যসত্যই অদ্ভুত। গহনার উপর বসন্তর কত মমতা! সেই গহনা প্রৌঢ়া লইল। বসন্ত একটা কথাও বলিল না। দেহের জন্য তাহার কত যত্ন, এতটুকু যন্ত্রণা তাহার সহ্য হইত না—সেই দেহ আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখের এতটুকু বিকৃতি হইল না। দুঃখ, কষ্ট, লোভ, মোহ সব এক মুহূর্ত্তে মরণ ঘুচাইয়া দিল! মরণ অদ্ভুত! থাকিতে থাকিতে তাহার মনে গানের কলি গুন গুন করিয়া জাগিয়া উঠিল।—

এই খেদ মোর ম-নে—
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
জীবন এত ছোট ক্যানে—হায়!

বসন বলিযাছিল—কবিয়াল—তোমার গান আমার জীবনে ফলে যায়। এ গান তুমি ক্যানে বাঁধলে কবিয়াল! গানটা বসনের জীবনে সত্য হইয়া গেল। হায়! হায়! বসন কি মরিয়া শান্তি পাইয়াছে? এ-জগতের যত তাপ—যত অতৃপ্তি সব কি ও-জগতে গিয়া জুড়াইল? জীবনে যা পাওয়া যায় না—মরণে কি তাই মেলে? গুন গুন করিয়া উঠিল সুর।

জীবনে যা মিটল না কো মিটবে কি হায় তাই মরণে!

মেটে? তাই মেটে? বসন কি মরণের পরেও বসন হইয়া আছে? এ আকাশে যে চাঁদ ডোবে—সে চাঁদ কি সেখানকার আকাশে ওঠে? এ ভুবনে যে ফুলটি ঝরিয়া পড়ে, সে ফুল কি সে ভুবনে—পারিজাত হইয়া ফুটিয়া ওঠে? এ জীবনের এ জগতের যত কান্না সে কি অনাবিল আনন্দে খিল খিল করিয়া হাসি হইয়া বাজিয়া ওঠে ওপারে—সে জগতে? ওঠে? ওঠে?

এ ভুবনে ডুবল যে চাঁদ সে ভুবনে উঠল কি তা?
হেথায় সাঁঝে ঝরল যে ফুল হোথায় প্রাতে ফুটল কি তা?

এ জীবনের কান্না যত—হয় কি হাসি সে ভুবনে ?
জীবন এত ছোট ক্যানে ? হায় !

হঠাৎ একটা কলহ কোলাহলে তাহার গানের তন্ময়তা ভাঙিয়া গেল। মনটা ছি-ছি করিয়া উঠিল। বাহিরে দলের লোকেদের মধ্যে চেঁচামেচি সুরু হইয়া গিয়াছে। নির্ম্মলা তীক্ষ্নস্বরে চীৎকার করিতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা শুনিয়া সে আরও মর্ম্মাহত হইল। ঝগড়া বাধিয়াছে বসনের স্থান পূরণ লইয়া। ছি! ছি! ছি!

বসন্ত আজই মরিয়াছে, দুপুরবেলা পর্য্যন্ত দেহটাও তাহার ছিল। এখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, ইহারই মধ্যে দল হইতে বসন্ত মুছিয়া গেল! তাহার স্থান কে লইবে সেই সমস্যা এখনই পূরণ না করিলেই নয় ? প্রৌঢ়া বসন্তর জিনিসপত্র লইয়া আপনার ঘরে পুরিয়া খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। ললিতা, নির্ম্মলা আজ নিজেরা খরচ দিয়া মদ কিনিয়া খাইতে বসিয়াছে। বেহালাদার, দোহার ও ঢুলীটা আলোচনা করিতেছে কোন্ দলে কে গানে-নাচে-রূপে-যৌবনে সেরা মেয়ে আছে। সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে 'প্রভাতী' নাম্নী কে একজন তরুণীর নাম স্থির হইয়াছে ; তাহাকেই আনা উচিত। বিশ ত্রিশ এমন কি পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দিয়াও তাহাকে দলে আনা প্রয়োজন। নতুবা এ দল অচল হইয়া যাইবে।

ঢুলীটা এই কথায় বলিয়াছে—ললিতা নির্ম্মলা মুখপাত হ'লে চোখ বুজে গান শুনতে হবে।

ললিতা নির্ম্মলা ফোঁস করিয়া উঠিয়া ঝগড়া সুরু করিয়া দিয়াছে। মদের নেশায় উত্তেজিত রূপোপজীবিনী নারী, রূপের নিন্দায় গালিগালাজে স্থানটা হইয়া উঠিয়াছে অসহনীয়।

বসন্ত ইহারই মধ্যে মুছিয়া গেল।

নিতাই ধীরে ধীরে অলক্ষিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আসিয়া বসিল গঙ্গার ধারে।

এত কাছে হইতে এমন করিয়া একা বসিয়া দুচোখ ভরিয়া নিতাই মৃত্যুকে

কখনও দেখে নাই। পাড়ায়—গ্রামে মানুষ মরিয়াছে, সে শুনিয়াছে। মরণ সম্বন্ধে সকল মানুষের মতই একটা ভয়—একটা সকরুণ অসহায় দুঃখই তাহার ছিল। কিন্তু বসন্ত তাহার কোলের উপর মরিয়া মরণের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় করিয়া দিয়া গেল যেন। বসন্তর হাতে কপালে হাত রাখিয়া সে যেন মরণের ছোঁয়াচ অনুভব করিয়াছে। মরণ যেন বসন্তকে লইয়া তাহার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া গেল।

বসন্ত কিন্তু মরিতে ভয় পায় নাই, তবে বাঁচিতে তাহার সাধ ছিল। অনেক গোপন সাধ তাহার ছিল। হঠাৎ মনে হইল—বসন্তের আত্মা যদি—। দেহ ঘর সংসার স্বজন পৃথিবী হারাইয়া অসহায় মানুষের আত্মা তো দেহের মমতায় অনেক দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরে। গভীর নিশীথ-রাত্রে বসন্ত যদি আসে—চিতার পাশে তাহার অনেক সাধের অনেক যত্নের দেহখানির সন্ধানে?

সে এবার আসিয়া বসিল—শ্মশানে—বসন্তের চিতার পাশে! রাত্রি তখন প্রায় প্রহরেক কাটিয়াছে। সব স্তব্ধ, সব অন্ধকার! শুধু ঝিঁঝি পোকা ডাকিতেছে। মনে মনে ডাকিল—বসন এস!

বসন কিন্তু আসিল না।

সমস্ত রাত্রি শ্মশানে শিয়াল, শকুন, কুকুর প্রভৃতি শ্মশানচারীদের মধ্যে কাটাইয়া দিল, কিন্তু বসন্তর দেখা মিলিল না। সারারাত বালুচরের ধার ঘেঁষিয়া গঙ্গা কলকল করিয়া বহিয়া গেল। কলকল-কুলকুল শব্দ কখনও উঁচু কখনও মৃদু, আকাশে দুই-তিনটা তারা খসিয়া গেল; গঙ্গার ওপারে সড়কটায় কত গরুর গাড়ী গেল। গাড়ীর নীচে ঝুলানো আলো দুলিয়া দুলিয়া একটা আলো তিন চারিটার মত মনে হইল; সারারাত্রি জোনাকীগুলা জ্বলিল, নিবিল; গঙ্গার কিনারার জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া শিয়ালগুলা বালুর চরের উপর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল, গাছে শকুন কাঁদিল, চিতার কাছে কতকগুলা বসিয়া রহিল উদাসীর মত। নিতাই বসিয়া বসিয়া সব দেখিল, মুহূর্তের জন্য কোন কিছুর মধ্যে বসন্তর আভাস মিলিল না, বসন্ত বলিয়া কিছুকে ভ্রম হইল না।

আকাশের তারাগুলা পুব হইতে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, বড় কাস্তেটা পাক খাইয়া ঘুরিয়া গেল, বিছের লেজটা গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া গেল ; পুব আকাশে শুকতারা উঠিল। গঙ্গার পূর্ব্ব পাড়ের ঢালু চরটা প্রায় ক্রোশখানেক চওড়া, তার ওপারে সারি-সারি গ্রাম, গ্রামের গাছপালাগুলার মাথায় আকাশে ক্রমে ফিকে রঙ ধরিল, কল-কল-কল-কল করিয়া পাখীগুলা একবার রোল তুলিয়া ডাকিয়া উঠিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। নাঃ, বসন্ত দুনিয়া হইতে মুছিয়াই গিয়াছে। হঠাৎ তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। সে চোখ বন্ধ করিয়া আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা করিতেই মুহূর্ত্তে বসন্তর মুখ স্পষ্ট হইয়া তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল, বসন্ত যেন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—বসন্ত! বসন্ত!

চোখ খুলিতেই নিতাইয়ের ভ্রম ভাঙিয়া গেল। আকাশের অন্ধকারের ঘোর আরও কাটিয়াছে। গঙ্গা, শ্মশান, গাছপালা, চিতার আঙরা, কুকুরের পাল নিতাইয়ের সম্মুখে। উদাস মনে আবার সে চোখ বুজিল। অদ্ভুত! এ কি! আবার বসন্তকে সে দেখিতে পাইতেছে। বসন্ত আসিয়াছে। চোখ বন্ধ করিলেই সে দেখিতেছে স্পষ্ট বসন্তর ছবি ; ছবি নয়--সত্যকারের বসন্ত, সে হাসিতেছে, সে কথা বলিতেছে। পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি নয়, বসন্ত নূতন ভঙ্গিতে কত নূতন কথা বলিতেছে, নূতন বেশভূষায় সাজিয়া নূতন রূপে দেখা দিতেছে।

নিতাই খুশী হইয়া উঠিল। থাকিতে থাকিতে নূতন কলি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল।—

"মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে
ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে
মনের মাঝেই বসে আছে।
আমার মনের ভালবাসার কদমতলা—
চার যুগেতেই আছে সেথা আমার বংশীওলা।

বিরহের কোথায় পালা—
কিসের জ্বালা ?
চিকন-কালা দিবানিশি রাধায় যাচে।"

পরিপূর্ণ মন লইয়া সে উঠিল। বসন্ত তাহার হারায় নাই। গঙ্গার ঘাটে মুখ-হাত ধুইয়া সে ফিরিল বাসার দিকে।

বাসায় তখন বাঁধাছাঁদা তোড়জোড় পড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সকলে হৈ-চৈ করিয়া উঠিল—এই যে! এই যে!

দোহারটি রসিকতা করিয়া বলিল—আমি বলি, ওস্তাদ বুঝি বিবাগী হয়ে গেল।

নিতাই মৃদু হাসিয়া ছড়ার সুরে তাহারই পুরানো একটা গানের দুইটি কলি আবৃত্তি করিয়া দিল—

"সে বিনে প্রাণে বাঁচিনে—ভবনে-ভুবনে রহি কেমনে ?
আমি যাব সেই পথে, যে পথ লাগে ভাল নয়নে।"

ললিতা ঠোঁটে পিচ কাটিয়া বলিল—বল কি বোনাই, অঙ্গে তবে তোমার ছাই কই ?

নির্ম্মলা কিন্তু আসিয়া সস্নেহে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—ব'স দাদা, আমি চা ক'রে দি।

বাজনদারটি আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—কাল ছিলে কোথা বল তো ? কার বাড়ীতে ? সে কেমন হে ? অর্থাৎ তাহার ধারণা, নিতাই কাল রাত্রে বসন্তকে ভুলিবার জন্য শহরের কোন দেহব্যবসায়িনীর ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল।

বেহালাদার ধমক দিল—থাম হে, থাম তুমি। যেমন তুমি নিজে, তেমনি দেখ সবাইকে। ব'স ওস্তাদ, ব'স। নিতাই হাসিয়া বসিল।

প্রৌঢ়া এতক্ষণ কাজে ব্যস্ত ছিল। একজন পুরনো কাপড়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে বসন্তর কাপড়গুলি বেচিবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। দাম-দস্তর শেষ করিয়া সে বাহিরে আসিল। নিতাইকে বলিল—ওঠ বাবা, এই বেলাতেই উঠছি।

গুছিয়ে জিনিসপত্তর বেঁধে-ছেঁদে লাও।

নির্ম্মলা একটি বাটিতে মুড়ি তেল মাখিয়া নামাইয়া দিযা বলিল—চাযের জল ফুটেছে, মুড়ি কটি খেয়ে লাও। সারা রাত কাল খাও নাই।

তাহাব মুখের দিকে চাহিযা নিতাই বলিল—বোন নইলে ভাইযেব দুঃখ কেউ বোঝে না।

—আর মাসী বেটীর কথা বুঝি ভুলেই গেলে বাবা? প্রৌঢা আসিযা একটি মদেব বোতল, গোটা দুয়েক গত রাত্রের সিদ্ধ ডিম, খানিকটা মাংস আনিযা নামাইযা দিল।—কাল রাত থেকে আনিযে রেখেছি। খাও, শরীলেব জুৎ হবে।

নিতাই তাহাব মুখেব দিকে চাহিযা মৃদু হাসিযা বলিল—মা-মাসীকে কি কেউ ভোলে, না—ভোলা যায? চিরদিন তোমার কথা মনে থাকবে মাসী।

প্রৌঢা হাসিযা বলিল—তুমি খাও, আমি আসছি।

প্রৌঢা চলিযা যাইতেই দুলীটা আবও কাছে আসিযা বসিল। নিতাই হাসিযা বলিল—লাও, ঢেলে লাও,। আরম্ভ কব।

কৃতার্থ হইয়া মদ ঢালিতে ঢালিতে দুলীটা চুপি চুপি বলিল—বসনেব কাপড চোপড় বিক্রী হযে গেল।

নিতাই কোন উত্তর দিল না।

অভিযোগ করিযা দুলীটা আবার বলিল—গযনা দু-এক পদ রেখে খুলে লাও নাই কেনে, বল দেখি? এমুন মুখ্যুমি করে, ছি!

নিতাই বেহালাদার ও দোহারকে বলিল—এস, লাও।

তাহারাও এবার অপরিমেয সহানুভূতি লইযা কাছে ঘেঁষিযা বসিল। কিছুক্ষণ পরেই বেহালাদার সচকিত হইয়া বলিল—ওই! বোতল শেষ হযে গেল! তুমি? তুমি তো কই—

নিতাই হাসিযা বলিল—দরকার নাই, ও আর খাব না।

—খাবে না?

—নাঃ।

সকলে অবাক হইয়া গেল।

নিতাই বলিল বেহালাদারকে—তোমার কাছে একটি জিনিস শিখবার সাধ ছিল। রাত্রে তুমি যে বেহালা বাজাও, ওই বাজনাটি শিখতে।

বেহালাদার বলিল—নিশ্চয়। তোমাকে শেখাব না ওস্তাদ? দেখ দেখি! তিন দিনে শিখিয়ে দোব।

নিতাই হাসিয়া বলিল—তিন দিন আর পাচ্ছি কোথায় তোমাকে?

—কেন? কথাটা বলিল দোহার। বেহালাদার স্থির দৃষ্টিতে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—আজই আমি চলব।

—সে তো আমরাও। তুমি—।

দোহারের মুখের উপর হাত দিয়া বেহালাদার বলিল—থাম তুমি, থাম।

নিতাই কিন্তু দোহারের কথারই জবাব দিল—তোমরা এক পথে, আমি আর এক পথে।

বেহালাদার তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিল, শুধু বলিল—ওস্তাদ।

নিতাই একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বেশ গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়া দিল;—নূতন পদ আসিয়াছে তাহার—

"বসন্ত চলিয়া গেল হায়,
কালো কোকিল আর কেমনে গান গায়
বল—কেমনে থাকে হেথায়!"

হঠাৎ বেহালাদার বেহালাটা টানিয়া লইয়া বলিল—শোন ওস্তাদ, শোন, সেই সুর তোমাকে শোনাই, শোন। এসেছে।

সে ছড়ি টানিল—লম্বা টানা সুর। সেই সুর।

ইহারই মধ্যে আসিয়া হাজির হইল মাসী।

—বাবা!

নিতাই হাত তুলিয়া ইসারায় জানাইল—এখন নয় একটু পরে। কিন্তু বেহালাদার থামিয়া গেল। সে মাসীর মুখ দেখিয়া থামিয়া গিয়াছে।

মাসী বলিল—কি শুনছি বাবা?

—কি মাসী?

—তুমি—? তুমি চলে যাবে? আমাদের সঙ্গে যাবে না?

—না মাসী। খেলার একপালা শেষ হল। এবার নতুন পালা।

—অন্য দলে—?

—না—মাসী। এবার পথের পালা। এবার পথে-পথে।

প্রৌঢ়া অনেক বুঝাইল। অনেক প্রলোভন দেখাইল। বসন্তর গহনা কাপড়-চোপড়ের দামের অংশ দিতে চাহিল। আরও বলিল—বসনের চেয়ে ভাল নোক আমি দলে আনছি বাবা। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কাছেই সে থাকবে।

নিতাই বলিল—না মাসী, আর লয়।

নির্ম্মলা কাঁদিল।

নিতাইও একবার চোখ মুছিয়া বলিল—না ভাই, তুমি কেঁদো না, তুমি কাঁদলে আমি বেথা পাব।

বেহালাদার বলিল—তুমি কি বিরাগী হবে ওস্তাদ?

নিতাই এ প্রশ্নের জবাবে তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাই তো! বসন্তের সঙ্গে যে গাঁটছড়া ও গিঁঠ সে বাঁধিয়াছিল, সে গিঁঠ খুলিয়া গিয়াছে। বসন্ত আজ তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। এবার একটা নতুন ডাক যেন সে শুনিয়াছে। পথে পথে! চলো মুসাফের! বেহালাদারের প্রশ্নে তাহার মনে অকস্মাৎ সুরটি বাজিয়া উঠিল।—বিরাগী?

বৈরাগ্যই তাহার ভাল লাগিল।

কুড়ি

ঝুমুরের দল ধরিল দেশের পথ।

বাংলা দেশে, মেলা এবং সমারোহ-সম্পন্ন পর্ব্ব গাজন উৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় শেষ হয়। বৈশাখ হইতে চাষের কাজ সুরু হয়, অন্যদিকে উৎপন্ন-সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ ব্যয়িত হইয়া সম্বল ক্ষীণ হইয়া আসে. কাজেই সমারোহের পর্ব্বের ব্যবস্থা এ সময়ে নাই। করিলেও চলে না। আবার আশ্বিনের পর উৎসব-সমারোহ আরম্ভ হইবে। বৈশাখে একটি পর্ব্ব আছে--সেটি বুদ্ধপূর্ণিমায় ধর্ম্মরাজ-পূজা। সেও শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন শহর বাজারে গেলে কিছু কিছু . . . চলে। কিন্তু বসন্তের নৃত্য তাহাদের আসরটা যেন ভাঙিয়া দিয়া গেল। এবার আর জমিবে না। তাহারা তাই দেশের পথ ধরিল।

নিতাই কোন্ পথে কোথায় যাইবে ঠিক করে নাই, কিন্তু ওই দলটির বন্ধন কাটাইবার অন্য পথে দাঁড়াইবার জন্যেই ভিন্ন একটা পথ ধরিল

নির্ম্মলার কান্নার বিরাম ছিল না।

শেষ মুহূর্ত্তে ললিতাও কাঁদিল।

প্রৌঢ়া কিন্তু আশা ছাড়ে নাই; সে বলিল—চিরকাল তো মানুষের মন বিবাগী হয়ে থাকে না বাবা, আবার চোখে রঙ ধরবে। তখন ফিরে এস। মাসীকে ভুলো না।

বেহালাদার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা!

মহিষের মত লোকটাও কথা বলিল—চললে? তা—। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—সন্ন্যেসী হওয়ার কষ্ট অনেক হে। ভিক্ষে করে পেট ভরে না—তা নইলে—বেশ, এস তা হ'লে।

তাহারা যাইবে ছোট লাইনের ট্রেনে—যে লাইনের উপর নিতাইয়ের নিজের বাড়ী। ওই লাইনের ট্রেনেই নিতাই আসিয়াছিল—গ্রাম ছাড়িয়া। ট্রেনে চড়িয়াও মাসী বলিল—এস বাবা, এই গাড়ীতেই চড। এই লাইনেই তো

বাড়ী। মন খারাপ হয়েছে—বাড়ী ফিরে চল বাবা!

বাড়ী! সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছ! ঠাকুরঝি! সোনার-বরণ ঝক্‌ঝকে ঘটি মাথায় ক্ষারে-ধোওয়া মোটা কাপড় পরা কালো মেয়েটি। মনে পড়িয়া গেল কতকালের পুরানো গান—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?
কালো চুলে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?"

নিতাইয়ের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। অদ্ভুত হাসি! কত কথা মনে পড়িতেছে, কত কথা—কত পুরানো গান!

নিতাই ঘাড় নাড়িয়া নীরবেই জানাইল—না।

তাহার মনের মধ্যে সেই গানের কলি গুঞ্জন করিতেছিল—"চাঁদ তুমি আকাশে থাক।" মনে ঘুরিতেছিল—"তাই চলেছি দেশান্তরে—।"—সে আবার একবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না। ঠাকুরঝি এতদিন ভাল হইয়াছে, ঘর সংসার করিতেছে। সে গিয়া আর নূতন অশান্তির সৃষ্টি করিবে না। না। না সে যাইবে না।

নিতাই নীরবেই বিদায় লইল। এই বিদায় তাহার শোকাচ্ছন্ন মনকে আরও উদাস করিয়া তুলিল। দলের প্রত্যেক জনটির মুখ তাহার চোখের সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছিল—বিদায়-ব্যথা-কাতর ম্লান মুখ! কাহারও সহিত কোনদিন তাহার ঝগড়া হয় নাই কিন্তু তাহারা যে এত ভাল—এ কথা আজিকার দিনের এই মুহূর্ত্তটির আগে একদিন একটিবারের তরেও মনে হয় নাই। বরং যখন তাহাদের কাছে ছিল তখন দোষই অনেক চোখে পড়িয়াছে। মাসীকে দেখিয়া মনে হইত মুখে মিষ্ট কথা বলিলেও সমস্ত অন্তরটা বিষে ভরা, মিথ্যা ছাড়া সত্য বলিতে জানে না। পৃথিবীতে খাদ্য এবং অর্থ ছাড়া আর কিছুকে ভালবাসে না মাসী। আজ মনে হইল—না, না, মাসী—মাসীর মত, মায়ের মত ভালবাসিত তাহাকে। তাহার চোখের ওই কয় ফোঁটা জল বসন্তের মরণকালের ভগবানের নামের মতই সত্য।

নির্ম্মলা চিরদিন ভাল। মায়ের পেটের বোনের মতই ভাল।

ললিতার চোখা চোখা ঠাট্টাগুলি—শ্যালিকার মুখের ঠাট্টার মতই মিষ্ট ছিল।

বেহালাদারের কথা মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিল। কানের কাছে বাজিয়া উঠিল সেই সুর।

সে ফিরিয়া আসিয়া বসিল গঙ্গার ঘাটে। গঙ্গায় স্নান করিয়া সে মনে মনে একখানি গঙ্গাস্তব রচনা করিল। ঘাটের উপরেই একটা গাছের তলায় আসিয়া বসিল। কিন্তু কোথায় সে যাইবে? পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরিবে বাউল দরবেশের মত? না। এ কল্পনা তাহার ভাল লাগিল না। তবে? কিই বা করিবে - কোথায়ই বা যাইবে? হঠাৎ তাহার মনে হইল—হায় হায় হায়, হায় রে পোড়া মন। এ কথা কি ভাবিতে হয়? ঠাকুর, ঠাকুরের কাছে যাইবে সে? গোবিন্দ! বিশ্বনাথ! প্রভু, প্রভুর কাছে যাইবে সে? মায়ের কাছে যাইবে? মা অন্নপূর্ণা! রাধারাণী রাধারাণী রাধারাণী। সে কবিয়াল—সে কবি। সে সেই সব দেবতার দরবারে বসিয়া গান গাহিবে—মহিমা কীর্ত্তন করিবে—ভগবানকে গান শুনাইবে—শ্রোতারা শুনিয়া চোখের জল ফেলিবে—সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও কিছু কিছু দিয়া যাইবে—তাহাতেই তাহার দিনগুজরান হইবে। ভাবনা কি? হায় রে পোড়া মন, এতক্ষণ তুমি এই কথাটাই ভাবিয়া পাইতেছিলে না? সমস্ত দিন ধরিয়া সে কল্পনা করিল—যতটা সে পারিবে পথে পথে হাঁটিয়াই চলিবে, অপারগ হইলে ট্রেন ধরিবে, শরীর সুস্থ হইলে আবার হাঁটিবে। এখান হইতে কাশী, বাবা বিশ্বনাথ—মা অন্নপূর্ণা। কাশী হইতে অযোধ্যা, সীতারাম—সীতারাম। সীতারামের রাজ্য হইতে রাধাগোবিন্দ, রাধারাণী—রাধারাণীর রাজ্য বৃন্দাবন। তারপর মথুরা—না, না, মথুরা সে যাইবে না। রাধারাণীকে কাঁদাইয়া রাজ্যলোভী শ্যাম রাজা হইয়াছে সেখানে, সে রাজ্যে নিতাই যাইবে না। মথুরা হইতে বরং কুরুক্ষেত্র—হরিদ্বার। হরিদ্বারের পরই হিমালয়—পাহাড় আর পাহাড়। তাহার

ভুগোল মনে পড়িল—পৃথিবীর মধ্যে এত উঁচু পাহাড় আর নাই—হিমালযের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর। হিমালযের মধ্যেই মানস-সরোবর। সেখান পর্য্যন্ত নাকি মানুষ যায়। নিতাই মানসসরোবরে স্নান করিবে। তারপর জনশূন্য হিমালযের কোথাও একটা আশ্রয় বানাইয়া সেইখানেই থাকিয়া যাইবে। নিত্য নূতন গান রচনা করিবে—গাহিবে, পাহাড়ের গাযে খুদিয়া খুদিয়া লিখিয়া রাখিবে। সে মরিয়া যাইবে—তাহার পর যে সে-পথ দিয়া যাইবে সে তাহার গান পড়িবে—মনে মনে নিতাই-কবিকে নমস্কার করিবে।

বৈশাখের দ্বিপ্রহর। আগুনের মত তপ্ত ঝ'ড়োহাওয়া গঙ্গার বালি উড়াইয়া হু-হু করিয়া বহিয়া চলিযাছে। দুই পারের শস্যহীন চরভূমি ধূসরবর্ণ—যেন ধূ ধূ করিতেছে। মানুষ নাই, জন নাই; কেবল দুই-একটা চিল আকাশে উড়িতেছে—তাহারাও যেন কোথায় কোন্ দূর দূরান্তরে চলিযাছে। সব শূন্য—সব উদাস—সব স্তব্ধ—একটা অসীম বৈরাগ্য যেন সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নিতাই সেই অগ্নিগর্ভ রৌদ্রের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িল। "চলো মুসাফের বাঁধো গাঁঠোরী—বহুদূর যানা হৈ।"

নিতাই কাশীতে আসিয়া উঠিল।

ব্রিজের উপর ট্রেনের জানালা দিয়া কাশীর দিকে চাহিয়াই সে মুগ্ধ হইয়া গেল। বাঁকা চাঁদের ফালির মত গঙ্গার সাদা জল ঝক্‌মক্ করিতেছে—সমস্ত কোল জুড়িয়া মন্দির, মন্দির আর ঘাট, আরও কত বড় বড় বাড়ী। নিতাইয়ের মনে হইল মা-গঙ্গা যেন চোখঝলসানো পাকা বাড়ীর কণ্ঠি গাঁথিয়া গলায় পরিয়াছেন। ট্রেনের যাত্রীরা কলরব তুলিতেছে—জয় বিশ্বনাথ—অন্নপূর্ণামায়ী কি জয়!

সেও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলাইয়া দিল।

স্টেশনে নামিয়া অকস্মাৎ তাহার মনের ছন্দ কাটিয়া গেল। সে বিব্রত এবং বিহ্বল হইয়া পড়িল। বাংলা দেশের শেষ হইতেই সে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিল। ট্রেনে ক্রমশই ভিন্ন-ভাষাভাষী ভিন্ন রকমের বেশভূষায় ভূষিত লোকের ভিড় বাড়িতেছিল। কাশীতে নামিযাই সে ভিন্ন ধরণের মানুষের মেলার মধ্যে মিশিয়া গিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিল যে, এখানকার মানুষের সঙ্গে তাহার জীবনের ছন্দ কোনখানে মিলিতেছে না। তাহার উপর কাশী-কাশী-কাশী—তাহার কল্পনার কাশী কোথায়? সে তো এই দোকানদানিভরা বিকিকিনির কোলাহলে মুখর এই নগরীটি নয়।

বিহ্বলের মতই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিহ্বলের মত চারিদিকে চাহিতে চাহিতে এক পথ হইতে অন্য পথে চলিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার মুখ চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পূজার থালা হাতে ধপধপে সাদা থান পরিয়া যাইতেছিলেন একটি মহিলা। সে আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া গেল। তাহার মনে হইল—এ যে তাহাদের গ্রামের সেই রাঙা মা-ঠাকৃরুণ। হ্যাঁ—তিনিই তো! তেমনি ঢলমল করিয়া সম্ভ্রমভরা কাপড় পরিযাছেন, তেমনি আধ-ঘোমটা মাথায়, মাথার চুলগুলি ভালভাবে ছাঁটা—তিনিই তো! হারাইয়া-যাওয়া ছেলে যেন মাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। কাছে আসিয়া সে তাঁহার আগে গিয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। না, রাঙা মা-ঠাকৃরুণ নন, তবে ঠিক রাঙামায়ের মতই। ইনিও তাহাদের দেশের অন্য কোন গ্রামের রাঙামা—তাহাতে নিতাইয়ের সন্দেহ রহিল না। সে হিসাবে তাহার ভুল হয় নাই—তিনি বাঙালী মহিলাই বটেন। বিধবা বাঙালীর মেয়েটি পূজা করিয়া ফিরিতেছিলেন। নিতাই আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—মা-ঠাকৃরুণ!

নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া তিনি বলিলেন—কে বাবা?

নিতাই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, মা, আমি এখানে বড় 'বেপদে' পড়েছি।

—বিপদ ?

—হ্যাঁ মা, গরীব 'নোক', আশ্রয় নাই ; তা ছাড়া আমি কথাবার্ত্তা কিছুই বুঝতে পারছি না।

হাসিয়া তিনি বলিলেন—এস, আমার সঙ্গে এস। দেশ থেকে বুঝি সদ্য এসেছ ?

—হ্যাঁ মা ! নিতাই যেন বাঁচিয়া গেল।

তাহার এই নূতন মা—মানুষটি বড় ভাল।

নিতাই মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। ভাগ্যবিধাতাকে বলিল —প্রভু, তোমার মত দয়াল আর হয় না। অধমের ওপর দয়ার তোমার শেষ নাই। নইলে এমন বিদেশে বিভুঁয়ে যশোদার মত মায়ের আশ্রয়ে এসে পড়লাম কি ক'রে ?

এই নূতন মা তাহাকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। কোন এক আদি-অন্তহীন আঁকাবাঁকা গলির ভিতর তাঁর বাসা—একখানি ঘর, এক টুকরা বারান্দা। আর রান্না করিবার জন্য ছোট আর একটা বারান্দার একটা কোণ। নিতাই সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—আমি বরং বাড়ীর বাইরে বসি।

—কেন বাবা ? এই বারান্দায় ব'স। হ'লেই বা ডোম।

নিতাইয়ের চোখে জল আসিয়া গেল। সত্যই মা যশোদা। বৃন্দাবনের মায়েরা—যশোমতীর দেশের মায়েরা কেমন সে জানে না, কিন্তু তাহার দেশের মায়েরা ছাড়া যশোদার মত মা অন্য কোন দেশে আছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। সে দেখিয়াছে এই দেশের কত লোক—হিন্দুস্থানী কথা যাহারা বলে—তাহারা তাহাদের দেশে যায়—অনায়াসে এক বৎসর, দুই বৎসর এক নাগাড়ে কাটাইয়া দেয়, কই মাকে দেখিবার জন্য তো তাহারা ছুটিয়া যায় না ! মায়েরাও নিশ্চয় দেশে দিব্য থাকে ! যে যশোদা গোপালকে এক বেলার জন্য গোষ্ঠে পাঠাইয়া কাঁদিতে বসিতেন, সে যশোদার মত মা তাহারা কি করিয়া হইবে ? তা ছাড়া এমন মিষ্ট কথা—আহা-হা-রে !—মা গো মা ! না—কি বাবা গোপাল ? এমন ডাক—এমন সাড়া—আর কোথায় মেলে ?

মা তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।—কোন্ জেলা কোন্ গাঁয়ে ঘর তোমার বাবা? তোমাদের গ্রামে কত ঘর ব্রাহ্মণ—কত ঘব কোন্ জাত বাবা মাণিক? তোমাদের কোন্ স্টেশন? তোমাদের ওদিকে গেল বার ধান কেমন বাবা? ধান ছাড়া আর কোন ফসল হয়? বর্ষা কেমন হয় বাবা? বাদলা হয ঘন-ঘন?

মায়েব চোখ ছুইটি স্বপ্নাতুর হইযা উঠিল।

—বর্সায কাদা কেমন হয বাবা? তোমাদের দেশে ডাবেব গাছ বেশী. না তালেব গাছ বেশী? ডাবের দর কি রকম? মাছ কেমন—কোন্ মাছ বেশী? তোমাদেব দেশের মুড়ি কেমন হয বাবা?

নিতাই একে একে জবাব দিযা গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল এক একটি ছবি।—তোমাদেব গ্রামের কাছে নদী আছে বাবা? বড দীঘি আছে গ্রামে? আঃ, কতদিন দীঘিব জলে স্নান করি নাই। দীঘিতে পদ্মফুল ফোটে? শালুক সব গ্রামেই আছে। নীল শালুক আছে বাবা তোমাদের গ্রামে? কলমী-শুশুনীর শাক হয বাবা?

মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন ফুবাইযা যায। মা চুপ কবিযা থাকেন উদাস মনে, বোধ হয, তাঁহারও মনে পড়ে দেশের কথা। আবার হঠাৎ মনে আসে একটা প্রশ্ন. সেইটার পিছনে পিছনে আসে—আবার এক ঝাঁক প্রশ্ন।

—তোমাদেব ওদিকে সজনের ডাঁটা খুব হয? 'নজনে' আছে? পানের বরজ আছে? কেযা-র গাছ আছে তোমাদের গ্রামে, সাপ থাকে গোডায? গোখরো কেউটে সাপ খুব বেশী ওদিকে, না? নদীর ধারে শামুকভাঙা কেউটে থাকে? গাঙ-শালিক আছে? 'বউ কথা কও' পাখী আছে? থাকবেই তো। 'চোখ গেল' অনেক আছে, না? 'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখী? অনেকে বলে 'গেরস্তের খোকা হোক', হলুদ রঙ গাযের, মাথাটি কালো, ঠোঁটটি লালচে! আমরা বলি—'কৃষ্ণ কোথা রে'—আছে?

হঠাৎ মাযের চোখ জলে ভরিযা গেল। চুপ করিযা তিনি বসিযা রহিলেন

কিছুক্ষণ। ফোঁটা দুই জলও তাঁহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

নিতাই প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। কিন্তু 'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখীর সন্ধানে চোখে জল আসিল দেখিয়া তাহার মনে হইল—তাঁহার কৃষ্ণও কোথায় চলিয়া গিয়াছে বোধ হয়।

মা বলিলেন—মা যশোদা গোপালের জন্য কাঁদছিলেন আর হলুদ বাটছিলেন। বাটা হলুদ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই গড়লেন এক পাখী। সেই পাখীর মাথায় ঝরে পড়ল—তাঁর চোখের এক ফোটা জল। সেই জলের তাপে পুড়ে তার মাথাটি হয়ে গেল কালো—আর জলের সঙ্গে ছিল যে চোখের রক্ত, সেই রক্তে তার ঠোঁট হয়ে গেল লাল। পাখাটিকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—পাখী, তুই দেখে আয় আমার কৃষ্ণ কোথায়। পাখী ডেকে ডেকে ফিরতে লাগল—'কৃষ্ণ কোথা রে?' 'কৃষ্ণ কোথা রে?'

নিতাইয়ের চোখ দিয়াও জল ঝরিতে আরম্ভ করিল।

মা বলিলেন—আমার কৃষ্ণও চলে গেছে বাবা। ব্রহ্মাণ্ডেও আর কেউ নেই। তাই এসেছি বাবার চরণে। নইলে দেশ ছেড়ে—। অর্দ্ধপথেই থামিয়া মা চোখ মুছিলেন। আবার প্রশ্ন করিলেন—বাবা, তোমার কে আছে ঘরে? মা আছে?

—আছে, মা।

—তবে তুমি—এই বয়সে? কিছু মনে ক'রো না বাবা—তোমাদের জাতের কেউ তো এমন ভাবে আসে না! তাই জিজ্ঞাসা করছি।

হাত দুটি জোড় করিয়া নিতাই বলিল—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল—হয়তো আমার কর্ম্মফের, নইলে—

—কি বাবা?

নিতাই বলিল—বাবা দাদা চাষ করেছে। একটু থামিয়া আবার বলিল—লুকোব না মা আপনার নেকটে, চুরি ডাকাতিও করেছে। সেই বংশে জন্ম আমার, মা—আমি—সে আবার থামিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে আবার

বলিল—বলিতে সে লজ্জা বোধ করিতেছিল, বলিল—দেশে কবিগান শুনেছেন মা? দুই কবিয়ালে মুখে মুখে গান বেঁধে পাল্লা দিয়ে গান করে?

—শুনেছি বইকি বাবা। কত শুনেছি। আমাদের গাঁয়ে নবান্নের সময় বারোয়ারী অন্নপূর্ণাপুজো হ'ত। কবিগান হ'ত পুজোয়। দুর্গাপুজোয় হ'ত যাত্রাগান, কৃষ্ণযাত্রা—শখের যাত্রা। নীলকণ্ঠের গান—"সাধে কি তোর গোপালে চাই গো? শোন যশোদা!" সে সব গান কি ভুলবার! মনসার ভাসান গান হ'ত মনসাপুজোয়। চব্বিশ প্রহরের কীর্ত্তন হ'ত। বাউল বৈরেগীরা খঞ্জনী একতারা নিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করত—"আমি যদি আমার হতাম কুড়িয়ে পেতাম হেমের ঘড়া।" আহা-হা। বাবা সেই কীর্ত্তন-গানে শুনেছিলাম—"অমিয় মথিয়া কেবা লাবনি তুলিল গো তাহাতে গড়িল গোরাদেহ"—গোরাচাঁদের দেহ অমৃত ছেঁকে তৈরী হয়েছে। এ সব গান যে অমৃত-ছাঁকা জিনিস বাবা। কবিগান শুনেছি বইকি!

নিতাই চুপ করিয়া গেল। ইহার পর আর নিজেকে কবিয়াল বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস হইল না।

বিধবাই জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি কবির দলে থাকতে বাবা? নিজে কবিগান করতে?

হাত জোড় করিয়া নিতাই বলিল—হ্যাঁ মা, অধম একজন কবিয়াল।

—তবে তো তুমি ভাল লোক বাবা। তীর্থ করতে বেরিয়েছ?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাই বলিল—আর ফিরব বলে বেরুই নাই মা। ইচ্ছে আছে ভগবানের দরবারে পথে পথে গান করব, তাতেই দিন কটা কেটে যাবে আমার।

বিধবা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—তাতে তো তুমি সুখ পাবে না বাবা। তুমি কবিয়াল—গান গাইবে—লোককে আনন্দ দেবে, হাসাবে, কাঁদাবে, মেডেল পাবে, কত লোক কত প্রশংসা করবে—তবে তো তোমার আনন্দ হবে, সুখ হবে! বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন।—সুখ

সংসারে মেলে না বাবা। যদি মেলে, যদি বিশ্বনাথ দেন তো তোমার আপন কাজের মধ্যেই পাবে।

অপরাহ্ণে সে বিদায় লইল মায়ের কাছে।

মায়ের বৃত্তান্ত সে সব জানিল। আপনার জন মায়ের কেউ নাই, একমাত্র সন্তানকে হারাইয়া মা এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। দেশ হইতে জ্ঞাতিরা যাহারা তাঁহার শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইয়াছে, তাহারা মাসে দশটি করিয়া টাকা পাঠায়, তাও অনিয়মিত। মা হাসিয়া বলিলেন—পেটের জন্মে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয় না বাবা, লজ্জা হয়। আহার কমিয়ে আধপেটা অভ্যেস করলে এক মাসের খোরাকে দু-মাস যায়। তার মধ্যে উপোস করতে পারলে —বিধবার উপোস তো অনেক।

নিতাই অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ওঃ—সে মায়ের এই আধপেটা অন্নের ভাগ লইয়াছে।—মা তাহাকে হাসিমুখে দিয়াছেন। ওঃ। সে বলিল—আমি এইবার উঠি মা! থাকলে আবার আসব।

নিতাই প্রণাম করিল দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, বলিল—আপনি দু পা পিছিয়ে যান মা। আমি ওই ঠাঁইটির ধুলো নেব।

মা বলিলেন—তুমি আমার পা ছুঁয়েই নাও বাবা। আমি তো চান করব এখুনি।

—না। নিতাই তাঁহার পা ছুঁইল না।

মা বলিলেন—অনেক সত্র আছে, জায়গা মিলবে। আমার ঘর এই তো দেখছ—তা ছাড়া এ বাড়ীতে আর দশজন থাকে। সবাই মেয়েছেলে এখানে—

নিতাই হাসিয়া বলিল—দেবতার দেখা খানিকক্ষণের জন্যই বটে মা। চিরকালের পুণ্যি তো আমার নয় মা অন্নপূর্ণা। আপনি আমার সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা।

মা বলিলেন—তোমার কচি বয়স, তুমি কবিয়াল—তুমি দেশে ফিরে যাও

বাবা। চমৎকার তোমার গলা। গানও তোমার ভাল। দেশে তোমার কদর হবে। এ তো বাংলা গানের দেশ নয় বাবা। অবিশ্যি গঙ্গার ঘাটে—ঘাট তো এখানে অনেক—সেখানে বসে গান করলে অনেক শুনবার লোক পাবে—কিছু কিছু হয়তো পাবেও। কিন্তু সংসারে পেট চলাই তো সব নয় বাবা! একটু বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে কথাটি শেষ করিলেন মা।

এই কথাটায় নিতাই একটু ক্ষুণ্ণ হইল। এই লইয়া মা তাহাকে দুইবার কথাটা বলিলেন।

* * * *

বিশ্বনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে সে সন্ধ্যায় আসিয়া বসিল। ডোমের ছেলে সে, মন্দির-প্রবেশের অধিকার নাই—সে জন্য তাহার আক্ষেপও নাই। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে বসিয়া মন্দিরশীর্ষের ধ্বজার দিকে চাহিয়াই সে ধন্য হইয়া গেল। সোনার পাত দিয়া মোড়া মন্দির!

চারিদিকে আরতি ও শৃঙ্গার-বেশ দর্শনার্থীর ভিড়। হাজার কণ্ঠে বিশ্বনাথের জয়ধ্বনি, সেই ধ্বনির সঙ্গে সে নিজের কণ্ঠও মিশাইয়া দিল—জয় বিশ্বনাথ!

তারপর সে গান রচনা আরম্ভ করিল—

"ভিখারী হয়েছে রাজা দেখ রে নয়ন মেলে।
সাতমহলা সোনার দেউল গড়েছে সে শ্মশান ফেলে।"

গুন্‌গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিয়া গানখানি রচনা শেষ করিয়া সে গলা চড়াইয়া গান আরম্ভ করিল—আহা! প্রাণ ঢালিয়া সে গাহিতেছিল।

গান শেষ হইলে—অল্প কয়েকজন লোক, যাহারা শেষে আসিয়া জমিয়াছিল—তাহাদের একজন তাহাকে কিছু বলিল—তাহার বক্তব্য সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া নিতাই সবিনয়ে বলিল—কি বললেন প্রভু? আমি বুঝতে পারতা নাই।

একজন হাসিয়া বাংলায় বলিল—তুমি বুঝি সবে এসেছ দেশ থেকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—উনি বলছেন হিন্দী ভজন গাইতে। তোমার এমন মিষ্টি গলা, তোমার কাছে হিন্দী ভজন শুনতে চাইছেন।

—হিন্দী ভজন? নিতাই জোড়হাতে বিনয় করিয়া বলিল—আজ্ঞে প্রভু, আমি তো হিন্দী ভজন জানি না।

বাঙালীটি হিন্দী-ভাষী প্রশ্নকারী লোকটিকে যাহা বলিল, আন্দাজে নিতাই সেটা বুঝিল; বোধ হয় বলিল—হিন্দী ভজন ও জানে না।

জনতার অধিকাংশই এবার চলিয়া গেল। যেন তাহার মধ্যে উপেক্ষা ছিল বলিয়া নিতাইয়ের মনে হইল।

* * *

মন্দির হইতে সরাসরি আসিয়া সে গঙ্গার ঘাটে হাজির হইল।

চোখ তাহার জুড়াইয়া গেল। আহা এ যে দিন-রাত্রি মেলা লাগিয়াই আছে। আর একি বিচিত্র মেলা! মা গঙ্গাকে সামনে রাখিয়া এ যেন ভবের খেলার হাট বসিয়া গিয়াছে! একদিকে মণিকর্ণিকা অন্যদিকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে শ্মশানচুল্লী জ্বলিতেছে অবিরাম; ধ্বনি উঠিতেছে রাম-নাম সত্য হ্যায়। লোকে বলে এখানে যাহারা ভস্ম হইল তাহারা শিবলোকে চলিয়া গেল; শিবরাম! শিবরাম! শিবশম্ভু! মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া হঠাৎ সে পুঁটলীটা খুলিয়া বাহির করিল একটা পিতলের আংটি। আংটিটা বসনের। বসনের এই একটি মাত্র স্মৃতিচিহ্ন তাহার কাছে আছে। সেটিকে এই রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে। এই পুণ্যে বসনের সকল পাপ মুছিয়া যাক। বসন তুমি স্বর্গে যাও। কিন্তু ফেলিতে গিয়াও সে ফেলিতে পারিল না। হাত গুটাইয়া কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে প্রায় ছুটিয়া পলাইয়া আসিল। বসনের আর কিছু নাই। শুধু এইটুকু! না—থাক এটুকু। থাক। তাহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাক। ওঃ! বসন দিন-দিন হারাইয়া যাইতেছে। কাশী আসিয়া অবধি বসনকে তাহার বোধ করি মনেই পড়ে নাই। স্বপ্নও দেখে নাই। কাটোয়ার ঘাটে বসিয়া সে চোখ বুজিলেই বসনকে দেখিয়াছিল। গান বাঁধিয়াছিল—

মরণ তোমার হার হ'ল যে মনের কাছে !
ভাবলে যারে—কেড়ে নিলে—সে যে আমার মনেই আছে !

কিন্তু কই ? ওঃ। মনের কদমতলাও শুকাইতে শুরু করিয়াছে ! বসনের মুখটা পর্য্যন্ত ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। মনের মধ্যে সেই গানটি আবার গুন্‌গুন্ করিয়া উঠিল।—

এই খেদ মোর মনে !
ভালবেসে মিটল না সাধ কুলাল না এ জীবনে।
জীবন এত ছোট ক্যানে—? হায়।

আংটিটা সে হাতের কড়ে আঙুলে পরিয়া ফিরিয়া আসিল। দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া বসিল। ধীরে ধীরে মনটা তাহার জুড়াইয়া আসিল। বড় ভাল স্থান দশাশ্বমেধ ঘাট। এত বড় তীর্থ আর হয় না। কত দেশের কত মানুষ। কত পাঠ। কত গান। কত দান। কত ভিক্ষা। কত কামনা। কত দুঃখ। মনে হইল—এই ভাল। বাকী দিনগুলা এই ঘাটে বাসা বাঁধিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়াই কাটাইয়া দিবে।

পরদিন অপরাহ্নে সামনে গামছা পাতিয়া বসিয়া গান ধরিয়া দিল—

এই খেদ মোর মনে !

কণ্ঠস্বর তাহার অতি মিষ্ট। লোক জমিল। পয়সাও কিছু পড়িল। কিন্তু গান শেষে একজন বলিলেন—কাশীতে এসে এ খেদ কেন হে ছোকরা ?

একজন মহিলা বলিলেন—হ্যাঁ বাবা, ভাল গান গাও। মহাজনের পদ গাও। রামপ্রসাদের গান—কমলাকান্তের গান—এই সব গান !

সে এবার ধরিল—

"আমার কাশী যেতে মন কই সরে ?
সর্ব্বনাশী এলোকেশী—সে যে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে !"

গান শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মন যেন তাহার বিকল হইয়া গেল। তাহার সমস্ত অন্তরটা এক গভীর বেদনার উদাসীনতায় ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে

পড়িল গ্রামের মা চণ্ডীকে। রামপ্রসাদের এলোকেশীর মত মা চণ্ডী আজ এই কাশীতে আসিয়া তাহার আশে-পাশে ফিরিতেছেন। মায়ের পিছু পিছু যেন বসন ফিরিতেছে; ঠাকুরঝি ফিরিতেছে; রাজন ফিরিতেছে। বিপ্রপদ ফিরিতেছে। মাসী বেহালাদার—ভিড় করিয়া ফিরিতেছে।

নিতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আষাঢ়ের সন্ধ্যা। এখানে এখন প্রচণ্ড গরম। ঘাটে ও ঘাটের উপর পথে দলে দলে লোক আসিতেছে যাইতেছে, আলাপ-আলোচনা চলিতেছে—কিন্তু সবই যেন নিতাইয়ের নিকট হইতে বহুদূরের কথা বলিয়া মনে হইতেছে, স্বরধ্বনির রেশ কানে আসিতেছে, কিন্তু শব্দের কথা অস্পষ্ট। মানুষগুলিও যেন অনেক দূরের মানুষ।

ভাল লাগিতেছে না। এ তাহার ভাল লাগিতেছে না। হোক কাশী; বিশ্বনাথের রাজত্ব; স্বর্গের সিংহ-দরজা, তবু তাহার ভাল লাগিতেছে না। ভিক্ষা তাহার ভাল লাগিতেছে না। মহাজনের পদ তাহার ভাল জানা নাই আর নিজের গান ছাড়িয়া ওসব গান যত ভাল হোক গাহিয়া কাল কাটাইবার কল্পনাও করিতে পারে না সে। নিজের যেন ও রকম পদ ঠিক আসে না। তাহার উপর এই ভিক্ষায় সে ঠিক আনন্দ পাইতেছে না। কোথায় আনন্দ। সে অন্তত পাইতেছে না। কবিগানের আসর! ঝলমলে আলো! হাজার লোক! ভাল লাগিতেছে না তাহার।

মনে পড়িল মায়ের কথা কয়টি। কবিয়াল তুমি—দেশে ফিরে যাও! স্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ সে বসিয়াই রহিল। কতক্ষণ পরে—তাহার খেয়াল ছিল না —অকস্মাৎ সে অনুভব করিল—জনকোলাহল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সচেতন হইয়া—চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—লোকজন নাই; বোধ হয় যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। ঘাটের উপর দুই-চারিজন লোক ঘুমে অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। সেও ঘাটের উপর শুইয়া পড়িল। এই গভীর রাত্রে অচেনা শহরের পথ চিনিয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে না। আর কোথায়ই বা যাইবে? চারিদিক

নিস্তব্ধ। কেবল ঘাটের নীচে গঙ্গার নিম্ন কলস্বর ধ্বনিত হইতেছে। সেই শব্দই সে শুনিতে লাগিল। অপরিচয়ের পীড়ায় পীড়িত অস্বচ্ছন্দ তাহার মন অদ্ভুত কল্পনাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল—গঙ্গার স্রোতের শব্দ শুনিতে শুনিতেও নিতাইয়ের মনে হইল—গঙ্গাও যেন দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা বলিতেছে। কাটোয়ায়, নবদ্বীপেও তো সে গঙ্গার শব্দ শুনিয়াছে; কাটোয়ায়, যে-দিন বসন্তর দেহ পোড়াইয়াছিল, সে দিন তো গঙ্গা স্পষ্ট ভাষায় কথা বলিয়াছিল। এখানকার সবই কি দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা কয়? আবার তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল। সমস্ত দিনের মধ্যে পাখার ডাক সে অনেক শুনিয়াছে, কিন্তু 'বউ কথাকও' বলিয়া তো তাহাদের কেউ ডাকে নাই, 'চোখ গেল' বলিয়া তো কোন পাখী ডাকে না। 'কোথা রে' বলিয়াও তো কোন পাখী কাঁদিয়া ফেরে নাই এখানে। কাকের স্বর পর্য্যন্ত কেমন ভিন্ন রকম। মা তাহাকে বলিয়াছিলেন—ঠিকই বলিয়াছিলেন!

অকস্মাৎ তাহার মনে হইল—বিশ্বনাথ? বিশ্বনাথই যে এই রাজ্যের রাজা; তবে তিনিও কি—এই দেশেরই ভাষা বলেন? তাঁহার এই ভক্তদের মতই তবে কি তিনি তাহার কথা—তাহার বন্দনা বুঝিতে পারেন না? হিন্দী ভজন? হিন্দী ভজনেই কি তিনি বেশী খুশী হন? 'মা অন্নপূর্ণা'—তিনিও কি হিন্দী বলেন? ক্ষুধার সময় তিনি যদি নিতাইকে প্রশ্ন করেন—ত কি ওই হিন্দীতে কথা বলিবেন? তবে? তবে? তবে সে কাহাকে গান শুনাইবে? আবার তাহার মনে পড়িল—তাহাদের গ্রামের 'মা চণ্ডী'কে, সঙ্গে সঙ্গে 'বুড়াশিব'কে। পাগলিনী ক্ষ্যাপা মা। ভাঙড় ভোলা।

"ওমা দিগম্বরী নাচ গো।"

সঙ্গে সঙ্গে বেহারার কাঁধে চড়িয়া ক্ষ্যাপা মা নাচে।

"ভাঙড় ভোলা—হাড়ের মালা গলায় নাচে থিয়া থিয়া।"

ভোলানাথ নাচে, তাহার গাজনের ভক্তেরা নাচে। হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে লোক আশেপাশে যাহারা দাঁড়াইয়া থাকে—তাহারাও মনে

মনে নাচে। আবার সর্বনাশী এলোকেশীর মত মা চণ্ডী আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্গে সবাই। সবাইকে মনে পড়িল।

প্রথমেই মনে পড়িল ঝুমুর দলটিকে—নির্ম্মলা বোনকে মনে পড়িল—লতিকাকে মনে হইল, মাসী আসিয়া 'বাবা' বলিয়া তাহার চোখের সামনে দাঁড়াইল। বেহালাদার, দোহার, বাজনদার, বাজন, বণিক মাতুল, বিপ্রপদ ঠাকুর, সকলে দূরে যেন ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুরঝিকে মনে পড়িল, কৃষ্ণচূড়ার গাছতলায় পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ওই যে!—গ্রামের ধারের নদী ও নদীর ধারে চরভূমিতে তরির চাষ, বিস্তীর্ণ মাঠ, বৈশাখে মাঠের ধূলা, কালবৈশাখীর ঝড়, কালো মেঘ, ঘনঘোর অন্ধকার, সেই চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ—সেই কড় কড় শব্দে মেঘের ডাক—ঝর্ ঝর্ বৃষ্টি—সব মনে হইল। পূর্ণিমায় ধর্ম্মরাজ-পূজার উৎসব। ঢাক শিঙা কাঁসির বাজনার সঙ্গে ফুলের মালা গলায় ভক্তদলের নাচ। গভীর রাত্রে বাগান হইতে ভক্তদলের ফল সংগ্রহ; কত কথা মনে পড়িল;—বাবুদের পুরানো বাগানে গাছের কোটরে অজগরের মত গোখুরার বাস: গোখুরাগুলা ডালেডালে বেড়ায়, দোল খায়. কিন্তু ভক্তেরা যখন 'জয় ধর্ম্মরাজ্ঞে' বলিয়া রোল দিয়া গাছে গাছে চড়ে, তখন সেগুলা সন্তর্পণে লুকাইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠে অবশিষ্ট আম যখন পাকে তখন বাগানটায় সে কি মিষ্ট গন্ধ! বাগানের সেই পুরানো বটগাছতলায় অরণ্যষষ্ঠীর দিন মেয়েদের সমারোহ মনে পড়িল। আল-পথ ধরিয়া বিচিত্র বর্ণের কাপড়চোপড় পরিয়া মেয়েদের যাওয়ার ছবি নিতাইয়ের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আল-পথের দু'ধারে লক্‌লকে ঘন সবুজ বীজ-ধানের ক্ষেত; মাঝখান দিয়া পথ। এখন আষাঢ়। আকাশে হয়তো মেঘ দেখা দিয়াছে, শামলা রঙের জলভরা মেঘ। ভাবিতে ভাবিতে নিতাইয়ের 'বার-মেসে' গানের কথা মনে হইল। তাহারও মনে গানের সুর গুঞ্জন করিয়া উঠিল—

বৈশাখে সূর্য্যের ছটা—

যত সূর্য্য-ছটা, কাঠফাটা, তত ঘটা কালবৈশাখী মেঘে—

লক্ষ্মী মাপেন বীজ-ধান্য চাষ-ক্ষেতের লেগে।

পুণ্য ধরম মাসে—

পুণ্য—ধরম মাসে—ধরম আসে—পূর্ণিমাতে (সবে) পূজে ধর্ম্মরাজায়—

আমার পরাণ কাঁদে, হায় রে বিধি, কাঠের মতন বক্ষ ফেটে যায়।

তারপরে জ্যৈষ্ঠ আসে—

জ্যৈষ্ঠ এলে, বৃক্ষতলে, মেয়ের দলে অরণ্যষষ্ঠী পূজে।

জামাই আসে, কন্যা হাসে—সাজেন নানা সাজে।

দশহরায় চতুর্ভুজা—

দশহরায় চতুর্ভুজা গঙ্গা পূজা, এবার সোজা ভাসিবে মাঠ বন্যা —

আমার পরাণ কাঁদে হায় রে বিধি—চোখের জলে বক্ষ ভেসে যায়।

এমনি করিয়া আমাদের রথযাত্রা—বর্ষার বাদল- অম্বুবাচীর লড়াই, শ্রাবণের রিমিঝিমি বর্ষণ মাথায় করিয়া ধানভরা ক্ষেত পার হইয়া সেই বাবাজীর আখড়ায় ঝুলন উৎসব দেখবার স্মৃতি হইতে চৈত্রের গাজন পর্যান্ত মনে করিয়া করিয়া সে এক নূতন বারমেসে গান মনের আবেগে রচনা করিয়া ফেলিল—

বছর শেষে—চৈত্র মাসে—

বছর শেষে চৈত্র মাসে, দিব্য হেসে বসেন এসে অন্নপূর্ণা পূজোর পাটে।

ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, মাঠ শূন্য, তিল পুষ্প ফুটেছে শুধু মাঠে—

তেল নাই হায় শিবের মাথায়, ভরল জটায়—অঙ্গেতে ছাই

গাজনে ভূত নাচায়

আমার পরাণ কাঁদে—হায় রে বিধি—পক্ষ মেলে উড়ে যেতে চায়।

অধীর হইয়া সে প্রভাতের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। বারবার এখানকার নূতন-মাকে মনে মনে উদ্দেশ করিয়া বলিল—তুমি আমাকে ছলনা করেছ মা! সেখানকার মা তুমি, আমাকে ফেরাবার জন্য আগে থেকে এখানে এসে বসে আছ! তোমার আজ্ঞা আমি মাথায় নিলাম। শিরোধার্য্য করলাম।

*   *   *

সকালেই নিতাই ট্রেনে চড়িয়া বসিল।

সমস্ত রাত্রির জাগরণের অবসাদের পর ট্রেনে উঠিয়া একটা কোণে ঠেস দিয়া বসিবামাত্রই সে প্রায় ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। মোগলসরাই জংশনে কোন-রূপে উঠিয়া ট্রেন পালটাইয়া নূতন গাড়ীতে উঠিয়া সে বাঁচিয়া গেল। ছাদের সঙ্গে ঝুলানো বেঞ্চগুলার একটা খালি ছিল, সেই বেঞ্চে উঠিয়াই সে শুইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল—আঃ—নিশ্চিন্ত! সোনার দেশে মায়ের কোলে চলিয়াছে সে। পরদিন সকালে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল—পরিচিত কাহারও ডাকে যেন ঘুম ভাঙ্গিল, নতুবা ঘুম ভাঙ্গিত কি না সন্দেহ—পরিচিত কে ভাবি মিষ্টস্বরে যেন তাহাকে ডাকিল—

—ওঠ, ওঠ, ওঠ!

নিতাই ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল।

তাহাকে নয়, নীচের বেঞ্চে একটা লোক একটা গোটা বেঞ্চ জুড়িয়া শুইয়া আছে, তাহাকেই কতকগুলি নবাগত যাত্রী ডাকিতেছে—ওঠ—ওঠ।

নিতাই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। আঃ, গাড়ীটা চেনামুখে যেন ভরিয়া গিয়াছে। সব চেনা, সব চেনা! নিতাই তাড়াতাড়ি উপর হইতে নীচে নামিয়া—সবিনয়ে আগন্তুক যাত্রীদলের একজনকে বলিল—মালগুলো ওপরে তুলে দি?

—দাও তো দাদা, দাও তো।

—বেঁচে থাক বাবা; বড় ভাল ছেলে তুমি। এক বৃদ্ধ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

মালগুলা তুলিয়া দিয়া নিতাই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল। ইস্টিশানের বাহিরের দিকে চাহিয়া তাহার চোখ জুড়াইয়া গেল। সব চেনা——সব চেনা! আঃ—তবে তো দেশে আসিয়া পড়িয়াছে! জানালার বাহিরে বাংলা দেশ। সব চেনা। রাণীগঞ্জ পার হইল। এইবার বর্দ্ধমান!

বর্দ্ধমানে গাড়ী বদল করিয়া—ঘণ্টা দুয়েক মাত্র, তাহার পরই সে গ্রামে গিয়া পড়িবে। মা চণ্ডী, বুড়ো শিব!

মা চণ্ডী বুড়োশিবের দরবারে বসিয়াই সে ভগবানকে গান শুনাইবে। তীর্থে তীর্থে মেলায় মেলায়—তারকেশ্বরে—কালীঘাটে গিয়া গান শুনাইয়া আসিবে। দেশের জেলায় জেলায় ঘুরিয়া দেশের লোককে গান শুনাইয়া ফিরিবে। তাহারা বলিবে না—হিন্দী ভজন গাও। নিজেই সে এবার কবির দল করিবে, এখন তাহার নাম হইয়াছে, বায়নার অভাব হইবে না। কবিয়াল নিতাইচরণের নামে দেশের লোক ভাঙিয়া পড়িবে। সে কিন্তু খেউড় আর গাহিবে না। শুধু ভালবাসার গান। খেদের গান। এই খেদ মোর মনে।—সেই খেদের গান! —বসন্তর নাম করিয়া গান। বসন্তকে সে কি ভুলিতে পারে? সে বসন্তর কোকিল—বসন্তর গান না গাহিয়া সে থাকিতে পারে?

কোকিল কি বসন্তকে ভুলিতে পারে!

এক্সপ্রেস ট্রেনটা থামিয়া গেল।

বর্দ্ধমান: বর্দ্ধমান!

আসরের প্রথমেই গাহিবে মা-চণ্ডীর বন্দনা; সঙ্গে সঙ্গেই সে মা চণ্ডীর দরবারে গাহিবার জন্য গান রচনা আরম্ভ করিয়া দিল। দেশে নামিয়াই প্রথমে সে আজ মা-চণ্ডীকে গান শুনাইয়া আসিবে,—

'সাড়া দে মা—দে মা সাড়া,
ঘরপালানো ছেলে এলো—বেড়িয়ে বিদেশ-বিভুঁই পাড়া।
তোমার সাড়া না পেলে মা, কিছুতেই যে মন ভরে না—'

আকাশ জুড়িয়া ঘন কালো মেঘ। হু-হু করিয়া ভিজা জলো বাতাস বহিতেছে। আঃ, দেহ জুড়াইয়া যাইতেছে। মাটির বুক আর দেখা যায় না; লকলকে কাঁচা ঘাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। ওঃ—বর্ষা নামিয়া গিয়াছে; চষা ক্ষেত-গুলির কালো মাটি জলে ভিজিয়া আদরিণী মেয়ের মত তুলিয়া ধরিতে গলিয়া পড়িয়াছে। টেলিগ্রাফের খুঁটির উপর একটা ভিজা কাক পাখা দুটা অল্প বিছাইয়া দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিয়া আছে কচি নতুন অশথ-বট-শিরীষের পাতাগুলি ভিজা বাতাসে কাঁপিতেছে। লাইনের দুধারের ঝোপগুলিতে থোপা

থোপা ডাণ্ডীর ফুল ফুটিয়াছে। আহা-হা! কেয়া-ঝোপটার সব চেয়ে বাহার খুলিয়াছে বেণী! হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল বসন্তকে—

"কবিল কে ভুল—হায় রে,
বুকের মাঝে ভরা মন-মাতানো বাসে
করাত কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়া-ফুল!"

ঝম্-ঝম্ শব্দে ট্রেন চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নামিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মেঘের উপর ঘনাইয়া আসিতেছে সন্ধ্যাবেলার কাজলদীঘির জলের রঙের মত রঙ। বৃষ্টি জোর হইতেছে, অমনি চারিদিক ঝাপসা। ওঃ, এদিকটায় প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মাঠ জলে থৈ থৈ করিতেছে। ব্যাঙের গ্যাঙোর গ্যাঙোর ডাক ট্রেনের শব্দকে ছাপাইয়াও কানে আসিতেছে। এইদিক কাহার লাগিয়া গেল।

ঘং-ঘং গম-গম্ শব্দে ট্রেনখানা ক্রুপদ রাগিণীতে গান ধরিয়া দিল। নদীর পুল। গেরুয়া রঙের জলে সাদা সাদা ফেনা ভাসিয়া চলিয়াছে। এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত লাল জল থৈ থৈ করিতেছে। জল ঘুরপাক খাইতেছে, আবার তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। দুপাশে কাশের ঝাড়, ঘন সবুজ। অজয়। অজয় নদী। দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। দেশ, তাহার গাঁ। তাহার মা।

'তোমার সাড়া না পেলে মা, কিছুতেই যে মন ভরে না
চোখের পাতায় ঘুম ধরে না, বয়ে যায় মা জলের ধারা।'

এইবার বোলপুর—তারপর কোপাই, তারপর, তারপর জংশন ছোট লাইন। ঘটো-ঘটো ঘটো-ঘটো ঘং-ঘং ঘং-ঘং। সর্ব্বাঙ্গে দুরন্ত দোলা দিয়া নাচাইয়া ছোট লাইনের গাড়ীর চলন। হায়-হায়-হায়-হায়! সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের বুকের ভিতর নাচিতেছে নিতাইয়ের মন। ছেলেমানুষের মত নাচিতেছে। চোখ ভাসাইয়া জল আসিতেছে অজয়ের বানের মত। মা গো —মা, আমার মা। আমার গাঁ। ওই যে—সেই 'নিমচের জোল' 'উদাসীর মাঠ',—ওই যে কাশীর পুকুর,—ওই যে সেই কালী-বাগান—যে বাগানের গাছগুলি ছিল তাহার কবি-জীবনের গানগুলির প্রথম শ্রোতার দল!

গাড়ীটা ঈষৎ বাঁকিল—ইস্টিশানে ঢুকিতেছে। ওই যে, ওই যে।—গাড়ী থামিল।

ট্রেন চলিয়া গিয়াছে।

নিতাই দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চারিদিকে বিস্মিত একটি জনতা। নিতাই এমনটি প্রত্যাশা করে নাই। এত স্নেহ, এত সমাদর তাহার জন্থ সঞ্চিত হইয়া আছে এখানে? রাজার মুখে পর্য্যন্ত কথা নাই। বেনে মামা, দেবেন, কেষ্ট দাস, রামলাল, কয়েকজন ভদ্রলোক পর্য্যন্ত তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছটি। ফুলের সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঘন সবুজ চিরোল চিরোল পাতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, শুধু দুই চারিটি ফুল যেন নিতাইয়ের জন্থই ধরিয়া আছে। নিতাইয়ের চোখে জলের ধারা। নিতাই কাঁদিতেছে, কাঁদিতেছে বিপ্রপদ ঠাকুরের মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়া। বিপ্রপদ ঠাকুর মরিয়া গিয়াছে।

বিপ্রপদর জন্থ নিতাইয়ের কান্নায় সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। কথাটা কৌতুকের কথা। কিন্তু নিতাইয়ের ওই নীরব বিগলিত অশ্রুধারা এমন একটি অনুচ্ছ্বসিত প্রশান্ত মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহার কান্নাকে উপহাস করিবার উপায় ছিল না। নিতাইয়ের কবিয়ালির খ্যাতি দেশে সকলেই শুনিয়াছে, তাহার জন্থ সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা না হোক প্রশংসাও করে মনে মনে; কিন্তু এ তাহা নয়, তাহারও অতিরিক্ত কিছু। তাহার চোখের ওই দর-বিগলিত ধারার সেই মহিমাতেই নিতাই মহিমান্বিত হইয়া সকলের চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে! বিপ্রপদকে হারাইয়াই সে শুধু কাঁদে নাই, তাহাদের সকলকে ফিরিয়া পাইয়াও কাঁদিতেছে।

কতক্ষণ পর

নিতাই আসিয়া বসিল সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। রাজাকে ডাকিয়া পাশে বসাইল। লাইন যেখানে বাঁকিয়াছে, দুটি লাইন যেখানে একটি বিন্দুতে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয়, সেইখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিতাই বলিল —রাজন। ভাই।

—ওস্তাদ। ভেইয়া।

—ঠাকুরঝি?

—ওস্তাদ।

—রাজন।

—ঠাকুরঝি নাই ভাইয়া। মর গেয়া। রাজার ঠোঁট দুইটি কাঁপিতে লাগিল।—ক্ষেপে গিয়া ঠাকুরঝি, উসকেবাদ। রাজার চোখ হইতে জল পড়িতে আরম্ভ করিল। পাগল হইয়া ঠাকুরঝি মরিয়াছে। ওইটুকুর মধ্যেই কত কথা নিতাই খুঁজিয়া পাইল। অনেক কথা। রাজা বলিল—ওস্তাদ ভাইয়া, কাঁদতা কাহে ভাইয়া? উসকো লিয়ে?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—গান শোন রাজন। তাহার মনে গান আসিয়াছে। গুন গুন করিয়া ভাঁজিয়া—সে গলা ছাড়িয়া গান ধরিল—

'এই খেদ আমার মনে মনে—
ভালবেসে মিটল না সাধ, কুলাল না এ জীবনে।
হায়—জীবন এত ছোট কেনে?'

রাজা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—হায় হায় হায় রে! বল ওস্তাদ, জীবন এত ছোট কেনে? হায় হায় হায়।

নিতাই বলিল—তাই যদি জানব রাজন।—আবার তাহার চোখ হইতে জল ঝরিতে সুরু হইল। আবার কাঁদিল। নিতাইয়ের চোখ হইতে আবার অনর্গল ধারায় জল পড়িতে আরম্ভ হইল।

কান্নার মধ্যেই আবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। না—ঠাকুরঝি মরে নাই, সে যে স্পষ্ট দেখিতেছে, ওই যেখানে রেলের লাইন দুটি একটি

িতে মিলিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে দক্ষিণ মুখে নদী পার হইয়া, সেইখানে ময় সোনার টোপর দেওয়া একটি কাশ ফুল ছিল-ছিল করিয়া দুলিতেছে, থাইয়া আসিতেছে যেন! সে আছে, আছে। এখানকার সমস্ত কিছুর সঙ্গে সে িয়া আছে। এই কৃষ্ণচূড়ার গাছ। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—এইখানে বসন- য়া প্রথম দিন শুইয়া বলিয়াছিল—কই হে! ওস্তাদ না—ফোস্তাদ! চকিতের নেও হইল—বসনও যেন শুইয়া আছে। আঃ! ঠাকুরঝি, বসন—দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। মিশিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে।

নিতাই উঠিল, বলিল—চল।

—কাঁহা ভাইয়া?

—চণ্ডী[illegible] চল, মাকে প্রণাম করে আসি।

াজার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল—গড়াগড়ি দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক মাকে।

তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন এখানকার ধূলামাটির স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিছে। মায়ের দরবারে মাকে গিয়া শুধাইবে—মাগো—জীবন এত ছোট ক্যনে?

শেষ

লেখকের অন্য বই

অভিযান
তামস তপস্যা
কামধেনু
আগুন
নীলকণ্ঠ
রাইকমল
চৈতালী ঘূর্ণী
ইমারৎ
১৩৫০
প্রসাদমালা
পাষাণপুরী
ধাত্রীদেবতা
গণদেবতা
না
পঞ্চগ্রাম
সন্দীপন পাঠশালা
কালিন্দী
মন্বন্তর
প্রিয়গল্প
বিচারক
রসকলি
স্থলপদ্ম
জলসা-ঘর
হারানো সুর
গল্প-সঞ্চয়ন
দিল্লীকা লাড্ডু
যাদুকরী
প্রতিধ্বনি
তিন শূন্য
নাগিনী কন্যার কা
শিলাসন
স্বর্গ-মর্ত্ত্য
মাটি
আমার কালের
কৈশোর-স্মৃতি
আরোগ্য নিকেতন

: নাটক :

কবি
কালিন্দী
দুই পুরুষ
দ্বীপান্তর
আরোগ্য-নিকেতন
পথের ডাক
বিংশ শতাব্দী